নতুন যুগের ভোরে

শ্রীপ্রশান্ত ঘোষ

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ:
সেপ্টেম্বর ১৯৬২

প্রকাশক:
শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ:
প্রশান্ত হাজরা

মুদ্রক:
শ্রীসুকুমার ঘোষ
নিউ বৈশাখী প্রেস
৩৮-শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শহীদ নির্ম্মর ব্যানার্জী

খোন্দেকার আবদুল মান্নান

স্মরণে—

সারা দেশে যেন হাহাকার দেখা দিয়েছে পেটের খাদ্য জোটাতে না পেরে আর রোগ হলে ওষুধ না পড়ায় এ গাঁয়ের মানুষগুলো কুকুর বেড়ালের মতো পথের ধারে মরে পড়ে থাকতে লাগল। মাঠে পঙ্গোপাল নেমে পাট ক্ষেত রবিশস্য সব শেষ করে দিয়েছে। খোল সার সবেরই দাম আগুন। জলকর বাড়তে বাড়তে তিনগুণ দাঁড়িয়েছে। তেল, সাবান, কাপড় সব আক্‌কাড়া ছোট নদীটায় জল নেই। মজে-হেজে প্রায় বুজে গেছে। চাষীরা চাষে মন দিচ্ছে না। মাঠ ফেটে চৌচির। ডি. ভি. সি-র 'জল ছাড়া হবে' একবার ঘোষণা করেই চুপচাপ। প্রচণ্ড দাব দাহে সব কিছু যেন পুড়ে যাচ্ছে। বড় বড় গাছগুলো সব ন্যাড়া, একটাতেও পাতা নেই। রাস্তায় ভিখারী রোজই সংখ্যায় বাড়ছে। পাখির ডাকে যেন কোন মিষ্টতা নেই। গরীব-গুরবো মানুষেরা ইদানীং পয়সাও ধার চায় না, চায় দু-মুঠো ভাত, কঙ্কালসার বৃদ্ধ এক টুকরো রুটি কিংবা নিদেনপক্ষে এক বাটি ফ্যানের জন্য 'ভদ্দরলোকের দোরে শানকী হাতে দাঁড়িয়ে। বছর কয়েক আগেও সে বিঘে পাঁচেক জমির মালিক ছিল। জমিদার কৃষ্ণদাসবাবু এ-গাঁয়ে বেশ প্রভাব-শালী ব্যক্তি। প্রাসাদ-তুল্য দালান বাড়ী, মাটি থেকে ওপরে তাকালে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। রোজই আজকাল ঐ বড় দালান বাড়ীটার চারপাশে একদঙ্গল ভিক্ষারী ঘুর ঘুর করে। যদিও কিছু মিলে যায় এই আশায়। বাড়ীর সদরের দিকের দোতলার পশ্চিমের জানালাটা খুলে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী তারাসুন্দরী দেবী বাড়ীর বাইরে তাকান। সল্পবাস পাঁচটি মেয়ে পশ্চিমের দরজার সামনে উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে মাটির মালসা, পিছনটা পোড়া তুবড়ানো এক-একটা ঘটি, কারো হাতে বা ভাঙা থালা। এদের মধ্যে মনে হচ্ছে তিনজনে অবিবাহিতা। যাদের কোলে দুইটি বাচ্ছা শিশু আছে, তাদেরও মাথার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হয়তো বা সিঁদুর কিনতেও পয়সা জোটে-নি। প্রত্যেকেরই পরণে ময়লা সাদা কাপড়। সায়া, ব্লাউজ এসবের বালাই নেই। মাথায় তেল যে কতদিন পড়েনি তারও ঠিক নেই। এরা বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের সদর দরজার বাইরে পা-ছড়িয়ে নিরবে বসে আছে। মাঝে মাঝে ওপরের খোলা জানালার দিকে তাকায় আর খালি মালসাটা তুলে ধরে। একটি মেয়ে তার কোলের শিশু নিয়ে বেশ বিব্রত। মায়ের শুক্‌নো স্তন দুটো টানা-টানি করছে আর দুধ না পেয়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। আর এক শিশু মায়ের জোড়াকরা পায়ের উপর শীর্ণ পা-দুটির উপর খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে গেছে। যে তিনটি তরুণীর কোলে শিশু নেই, তারা পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাচছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল এরা এক বাটি ফ্যানের জন্য অপেক্ষা করছে।

জর্দা ও চুন হাতে নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে ওপরে বারান্দা থেকে নিচে উঁকি দিয়ে তারাসুন্দরী এদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। কৃষ্ণদাস বাবুকে চীৎকার করে ডেকে শুনাতে থাকলেন, "শুনছ, এরা সব বাগ্‌দীপাড়ার মেয়েরা এসেছে, ভর-দুপুরে একটু ঘুমতেও দেবে না"—বলেই ওপর থেকে পানের পিক্ ফেলে দিলেন। পানের পিক্ বাগ্‌দীপাড়ার মেয়েদের মাথায় গিয়ে পড়ল। তারপর তরতর করে নিচে নেমে এসে দরজা খুলে হুংকার ছাড়লেন, "কি চাস্‌রে তোরা? বেরো বল্‌ছি সামনে থেকে, যতো সব হাড-হা-ভাতেব দল!" গাল তোবড়ানো ছিন্ন পোষাক পরা জীর্ণ-শীর্ণ শিশু-কোলে ২৫ বৎসরের একটি মেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে হাতের শান্‌কীটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কি যেন বলল। বোঝা গেল কিছু চাইছে। তারাসুন্দরী সভয়ে দু-পা পেছিয়ে এসে গলা চড়িয়ে বললেন, "ভাত কি সব সময় ফুটছে হাঁড়ীতে, এই জমিদারীটি কি মাগ্‌নার, তোমাদের মতো ভিখ মেগে সম্পত্তি হয়নি।" ওরা শুনুক বা না শুনুক, বুঝুক বা না বুঝুক তারা-সুন্দরী গালি-গালাজ সহজে বন্ধ করছেন না। শেষে, "যত সব মড়ার দল, মুখে আগুন"—বলে সশব্দে খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিলেন। সামনে বিশাল মড়াইটার দিকে একবার তাকিয়ে—সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। মেয়েটি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। দোতলার বারান্দার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ক্ষীণ স্বর বেরিয়ে এল—"মা, একটু ফ্যান"। তারাসুন্দরী খানিক বাদে আবার নিচে নেমে এলেন। হাতে যেন বড় মাল্‌সা। তাতে ভরতি ফ্যান। দরজা খুলে উঠোনে আসতেই মেয়ে পাঁচটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। সবাইয়ের দৃষ্টি মাল্‌সার দিকে। তারাসুন্দরী মাটিতে মাল্‌সাটা রাখতে যাবেন এমন সময়ে পাঁচজনেই হুমড়ি খেয়ে তার ওপর পড়ল। বাচ্ছা দুইটি কোল থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে হাত পা নাড়ছে। গলা দিয়ে কান্না মোটেই বেরোচ্ছে না। গোটা মাল্‌সাটা ধরে একজন চুমুক দিতে যাবে, ঠিক এমন সময় আরেক জন মাল্‌সার মধ্যে তার মাটির শান্‌কীটা চাপিয়ে দিল। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে মাঝখান থেকে আর একজন জোর করে মাল্‌সাটা তার দিকে ছিনিয়ে নিতে যাবে এমনই সময় সেটা মাটিতে আছড়ে পড়ে একেবারে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। চতুর্দিকে ফ্যান ছিটিয়ে পড়ল। তারও মুখ চোখ ফ্যান ভর্তি হয়ে গেল। মাথার চুলে ফ্যান পড়ল। কারও গা কারও বা কাপড়ে মাটি বা ফ্যান লেগে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল। এরই মধ্যে একজন আরেক জনের পিঠে মারল একটা কিল। কিল খেয়েই সে কুঁকড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

সমস্ত ব্যাপারটা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারাসুন্দরী মনে হয় উপভোগ করছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে সদর দরজা দুটো সশব্দে বন্ধ করে খিল দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

বিছানায় শায়িত কৃষ্ণদাস জিজ্ঞেস করলেন "তলায় এতক্ষণ কী করছিলে?" তারাসুন্দরী উত্তর করলেন, "কতকগুলি হাড়-হাভাতে বাগদীপাড়ার মেয়ে এই ভরদুপুরে একবাটি ফ্যান নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল, তাই দেখছিলাম। চারদিকে এত কাজ পড়ে রয়েছে, এরা কাজ করবে না, শুধু ভিক্ষে চাইবে।" কৃষ্ণদাস চমকে উঠলেন তারাসুন্দরীর কথায়। "বল কি ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্বিকারে দেখছিলে, বেশ সাহসী হয়েছো আজকাল। আর রাগে কামড়ে আঁচড়ে দেবে নি তো।" হো হো করে হেসে উঠলেন তারাসুন্দরী মুখচোখ পাকিয়ে বললেন,—"এত সাহস এদের হয়নি। দেখ যত আকাল যেন আমাদের এই গাঁয়ে। এত ভিখিরি বোধহয় অন্য কোন গাঁয়ে নেই।" স্বামী-স্ত্রীর এই আলাপের মাঝে বাইরে সদর দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ। এবার কৃষ্ণদাস নিজেই উঠে দরজা খুলতে গেলেন। সামনে দাঁড়িয়ে কৈবর্তপাড়ার রামুর মা। বিধবা রমণী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের উর্ধে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী আগে মুড়ি ভেজে সংসার চালাত এক পালি মুড়ি ভাজলে আনা চারেক মিলত। দু-দশোর দশটা বাড়ী ছিল বাঁধা। এখন মাত্র দুটো বাড়ী এসে ঠেকেছে। হয়তো তারাও একদিন বন্ধ করে দেবে। যারা বন্ধ করেছে তাদের কেউ বলে—"ঘরে চাল কোথায় গো যে মুড়ি ভাজাব, মাঠ-ঘাট তো জ্বলে পুড়ে গেল। মুড়ি খাওয়া তো এখন শখের ব্যাপার।" মধ্যবিত্ত গৃহস্থদেরও সকালে বিকালে দুবেলা দুপেট ভাত খাওয়া বন্ধ হল। রামু এ গাঁয়েরই একজন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। রামুর মা ছেলের বিয়ে দিয়েছিল গতসনে। এক বছরও পার হলো না, মা-হবার সম্ভাবনার মুখে বউ না পেল পথ্য, না জুটলো পেটে দু-মুঠো ভাত। দেশে সত্যি সত্যি আকাল এল। একুশ বছরের বউ হয়ে গেল হাড়িসার। যেন একটা মূর্তিমতী প্রেত। প্রসবের মাসখানেক আগেই বিছানা নিল। ক্রমে চোখ ঢুকল গর্তের মধ্যে। দূর থেকে সে শরীরটা দেখলে লোকে আঁতকে উঠত। ধীরে ধীরে অঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে শরীর বস্ত্র শূন্য হল। পরনের কাপড়টা জড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে। গায়ে নেই জামা। যেদিন সকালে কঠিন প্রসব বেদনা উঠল, ছট্‌ফট্ করতে করতে সেইদিনই বিকালে একেবারে থেমে গেল নতুন বউ। কাজের সন্ধানে রামু

গেছল গঞ্জে, কাজ শেষপর্যন্ত জোগাড় করতে পারেনি। ফিরে এসে দেখল সংসারের সব কিছু শেষ। নিজের হাতে আর স্ত্রীকে চিতায় তুলে দিতে আর হল না। কিছুদিন চুপচাপ বাড়ীতে বসে থেকে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল রামু। বহু সন্ধান করেও কেউ তার আর কোন সন্ধান পেল না।

রামুর মায়ের কাছেই গচ্ছিত ছিল তার বৌমার কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। রামু নিরুদ্দেশ হবার পর অভাবের তাড়নায় সংসার চালাতে গয়নাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধকী দেওয়া সুরু হল। বন্ধকী কারবারে কৃষ্ণদাসবাবুই গ্রামে নামকরা মহাজন। বন্ধকী দিতে এসে কেউ ফেরৎ যায় না। রামুর মা গয়না গাটি যা ছিল সেগুলো কৃষ্ণদাসের হাতে দিনে দিনে তুলে দেয়। বহুকাল পরে ঝিগিরি করে আবার টাকা সংগ্রহ করে রামুর মা দুগাছা বালা ফেরতের জন্য কৃষ্ণদাসের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলে "বৌমাকে আমি বড় ভালবাসতাম বাবু, ঐ দুগাছি বালা বৌমার স্মৃতি, গয়নাগুলো ফেরৎ দাও। সুদ সমেত আসল শোধ নাও, ওগুলো ফেরৎ দাও। রামুর মায়ের চোখে জল। কিন্তু কথাশুনে কৃষ্ণদাস যেন অবাক হয়ে গেল। কি করে টাকা যোগাড় করল!

কৃষ্ণদাস বলল, "এই আকালের দিনে বুড়ী তুমি সোনা নিয়ে করবে কি? বরং কিছু চাল-গম নিয়ে যাও। তা-ছাড়া রাখবেই বা কোথায়? যে চোর ডাকাতের উপদ্রব, লোকে তো সোনাদানা আমার কাছে জমা দিয়ে রোজ কিছু কিছু চাল নিয়ে যাচ্ছে। সোনা দিয়ে ত আর পেট ভরবে না এই আকালের দিনে।"

রামুর মা এইসব কথা কিছুতেই শুনতে রাজি নয়। কৃষ্ণদাসের চাপে পড়ে, শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, "বেশ আমার এখন একগাছি অন্তত ফেরত দাও। বাকী এক বস্তা চাল আমায় দাও।" কৃষ্ণদাস মুখভার করে উঠে ঘরে ঢুকলেন। খানিক পরে ড্যাব-ড্যাবে চোখে বেরিয়ে এসে বললেন, "গতমাসে মেয়ে ঝরণার বিয়ের দিন, বাড়ীতে আমার ডাকাতি হয়ে গেছল শুনেছ নিশ্চয়ই। বৌকে তোমার বালার কথা বলতে বৌ বলল সে সময় আমাদের সর্বস্ব তো যায়ই, অনেকের অনেক কিছু খোয়া গেছে। দুঃখে কথা বলব কি রামুর মা, তোমারটাও ঐ সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে না।"

রামুর মা একথা শুনে চমকে উঠল। জোর গলায় জিজ্ঞেস করল, "তা হলে তুমি এতক্ষণ যা বললে"—বাধা দিয়ে কৃষ্ণদাস বলল, "আর কোন উপায় নেই বুঝলে রামুর মা।" রামুর মা বুঝল সত্যই আর কোন উপায় নেই। এরকম

হুজুমের কারবারে সুদখোর মহাজন কৃষ্ণদাসের বেশ নাম আছে। এখন সে হল ওর নতুন শিকার। তবুও রামুর মা জেদ ছাড়ে না। নাছোড়বান্দা হয়ে সে কাকুতি-মিনতি শুরু করে। চোখ পাকিয়ে দু-পা এদিক-ওদিক করে কৃষ্ণদাস ভারী-গলায় উত্তর দেয় "ডাকাতি হলে জিনিস খোয়া গেলে আমি কি করব। আমি তো আর তোমার জিনিস নিজে কিনে দেব না। তাছাড়া ধরো, তুমি যে আমার কাছে জিনিসটা বাঁধা দিয়েছিলেই তারতো আর কোন প্রমাণ নেই।"

কথাবার্তার মাঝে বাড়ীর ভেতর থেকে তারাসুন্দরীর কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে—"কই গো, কি হল? এতক্ষণ ধরে ভ্যাজ ভ্যাজ করে কার সঙ্গে কথা বলছ। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি এস।" কৃষ্ণদাস ওপর দিকে চাইতেই চোখে চোখ পড়ল তারাসুন্দরীর। রামুর মাকে বলল, "তাহলে রামুর মা, বাড়ী যাও এখন।" আমি চল্লাম। রামুর মায়ের চোখ ছল ছল করে উঠে, তবু আর একবার কাকুতি করে জিজ্ঞেস করে, "বাবু, আমার বৌমার স্মৃতিটুকুও আমার কাছে রাখতে দেবেন না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে কৃষ্ণদাস বলে উঠে, "যা বলার তা তো বললাম। বার বার একই কথা বলে কোন লাভ নেই। তোমার সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই যে তোমার সোনা চুরি করে বড়লোক হব। সোনা চুরি করা আমার পেশা না।" মুখটা উল্টোদিকে করে চাপা স্বরে স্বগতোক্তি করলেন—আবাগীর বেটির আবার শখ কতো! স্মৃতি রাখার ইচ্ছে!

কৃষ্ণদাসের কথার উত্তরে রামুর মা আরও কিছু বলতে গেলে তার মুখের ওপর জোর শব্দ করে দরজা দুটো বন্ধ করে হন হন করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। চোখের জলে দুচোখ ভাসিয়ে রামুর মা বলে ওঠে—"এই অপরাধের শাস্তি তোমায় একদিন পেতেই হবে কৃষ্ণদাস। দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে প্রতারণা করছ। ভগবান তোমায় ক্ষমা করবে না। আমার মতো আরও অনেকের চোখের জল ফেলিয়েছো।" ধীর পায়ে রামুর মা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

আচ্ছা, আকাল কি শুধু জমিয়ে এসেছে গাঁয়ের গরীব পাড়াগুলোতে। যত আকাল ডোম, দুলে, মুচি, কৈবর্ত, বাউড়ী, মুণ্ডো, সাঁওতালপাড়ায়? গত সাত দিনে ডোমপাড়ার পাঁচজন শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছে। গতরাত্রে দুলে পাড়াতে চার, বাউড়িপাড়ায় তিন, দিঘির পাড়ে সাঁওতালপাড়ার চারজনের মারা যাওয়ার কথা সকাল থেকেই শোনা গেছে। মরার জন্য সবাই যেন লাইন দিয়েছে।

সবাই বলছে "মায়ের দয়া হচ্ছে।" আর 'মায়ের দয়ায়' চারদিকে উঠেছে কান্না। ভয়ে সবাই পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে। মুচি আর ডোমপাড়াটা তো ফাঁকা হয়ে গেছে। এখানে কাঁদবারও বোধহয় লোক নেই। মুমূর্ষু লোক একটু জল চাইলেও পাবে না।

কৈবর্তপাড়ায় কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে কিশোরীটি পিতলের বাটি নিয়ে বন্ধক দিয়ে কিছু চাল চাইতে গেছল কৃষ্ণদাসের কাছে। কৃষ্ণদাস ধর্মভীরু মানুষ, বললেন, "সন্ধেবেলায় বন্ধকী নিলে পাপ হবে। এই ভর সন্ধেবেলায় আমাকে কি তোরা একটু পুণ্যিও করতে দিবি না। এখন বাড়ী যা, কাল সকালে আসবি।" এখন বন্ধকী কারবার করলে আমায় নরকে যেতে হবে। কাতর স্বরে কিশোরী মিনতি করে, "এই বাটি দুটি নেন বাবু। এই দুটি আমাদের শেষ সম্বল। তিন দিন বাড়ীতে কেউ একটা দানা মুখে তোলেনি। ছোট ভাইটাকে আজ রাত্রে অন্ততঃ দু-মুঠো খেতে দি, ও ছেলে মানুষ খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছে। আমরা মরি ও বরং বাঁচুক।" হা হা করে উঠলেন কৃষ্ণদাসবাবু। —"ছিঃ ছিঃ বামুনের বাড়ি। এই ভর সন্ধেবেলায় মরার কথা বলতে নেই। দুর্গা দুর্গা।"

নাছোড়বান্দা কিশোরী তবুও বাটি দুটি এগিয়ে দিয়ে বলে—"এ দুটি নেন বাবু, সামান্য দুমুঠো চাল দিন আপনার তো অনেক আছে। মা অন্নপূণ্যে প্রতি বছরই আপনার বাড়ীতে আসেন। মা আপনার বাড়ীতে বাঁধা আছেন, থাকবেনও।" রেগে মেগে চিৎকার করে উঠল কৃষ্ণদাস,—"হিংসে হচ্ছে? মা অন্নপূণ্যে আমার ঘরে বাঁধা থাকবে না তো তোদের মত আবাগীর বেটির ঘরে বাঁধা থাকবে। হা-ঘরে কোথাকার! সন্ধেবেলায় গালাগাল!"—বলেই তেড়ে গেলেন কিশোরীর দিকে। ভয় পেয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল কিশোরী। কৃষ্ণদাসের মুখ চোখের ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে—"মাপ করুন বাবু আমাকে। আমি আপনাকে গালাগালও দিচ্ছি না, হিংসেও করছি না।" হাত দুটো ওপরে তুলে কৃষ্ণদাস কিছুটা পিছিয়ে আসে। ভারীগলায় ধমক দিয়ে উঠেন,—"থাক, থাক, এখনও আহ্নিক সারিনি। এই ভর সন্ধেবেলায় আর ছুঁস না। বাইরের উঠোনে গিয়ে বস্। আগে আমি মাকে খানিক ডেকেনি।" কাল থেকে গিন্নি আবার বাড়ীতে নেই। আমাকে তো চাল বের করে দিতে হবে। বস্ বস্ ঐ খানে,—বলে আঙ্গুল তুলে বাইরের উঠোনটা দেখিয়ে দিলেন।

ঘন্টা-খানেক বাদে কৃষ্ণদাস আবার নিচে নেমে এলেন। কিন্তু এবার একটু অস্বাভাবিক ভাব। কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, পরনে উপাসনার পোষাক

শরীরটা টলছে। চোখ-জোড়া বেশ লাল। কৃষ্ণদাস বরাবরই মত্তপ। আজ পরিমাণটা একটু বেশী হয়ে গেছে। টলতে টলতে কিশোরীর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়েন—"কই আয়, চাল নিবি আয়।" উঠোন থেকে ধীর পদক্ষেপে কিশোরী এগিয়ে আসে। কৃষ্ণদাসের কাছে এসেই আবার পেছিয়ে যায়। কৃষ্ণদাসও চোখ দু'টো বড় বড় করে কিশোরীর দিকে এগিয়ে যায়। ভয় পেয়ে কিশোরী চিৎকার করে উঠে। "বাবু, বাবু, আমি বাড়ী যাব। আমি এখনই না ফিরলে মা-ভাই ছট্‌ফট্ করবে। চাল আমার চাই না।" কিশোরীর চিৎকারে বিরক্ত হয়ে হাত দু'টো ধরে হেচ্‌কা টান মেরে মুখটা চেপে ধরলেন। জমিদারের বাড়ীর উঠোনে সারারাত দেহটা পড়েছিল।

কিশোরী রাত্রে ঘরে এলো না। দুশ্চিন্তায় মা বিন্দু সারারাত অনাহার, অনিদ্রায় পড়ে রইল। বাড়ীর বাইরে বার কতক বেরিয়ে কিশোরীর নাম ধরে চেঁচিয়েও সাড়া পেল না। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার; ভয়, পেঁচার চিৎকার, শিয়ালের অট্টরব।

সকাল হতেই বিন্দু সারা গাঁ চষে বেড়াল। কৃষ্ণদাসের বাড়ীর কাছে যেতেই দেখল ধীরে ধীরে উদ্‌ভ্রান্ত বিধ্বস্ত কিশোরী জমিদার বাড়ীর দিক থেকে আসছে। মাকে দেখতে পেয়েই হাউমাউ করে কেঁদে উঠে, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মাকে। চাল-ভর্তি ছোট্ট একটা ব্যাগ মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে; "বাটি দুটো বাঁধা দিয়ে এসছি। মাগো, আমি মরে গেছি।" গত রাত্রে তার সর্বনাশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে শেষ হবার আগেই বিন্দু চালের পুঁটলিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চতুর্দিকে চাল ছড়িয়ে পড়ল। গাছের শালিক, কাক এরা উড়ে এসে চালগুলো খেতে লাগল। বিন্দু মেয়ের গালে প্রথমে মারল একটা চড়। কিশোরী কেঁদে উঠলে তাকেই আবার জড়িয়ে ধরে মা নিজেই এবার কেঁদে উঠে। মেয়ের গাল দুটো টিপে ধরে কিছু বলে, "কেন গেছলি ঐ সর্বনাশের বাড়ী? ঐ শয়তান আরও অনেকের মেয়ের সর্বনাশ করেছে। দেশে আকাল আর কেষ্টদাসের পড়ে যায় মজা। চ, বাড়ী চল। যা হবার তাতো হয়েছেই।" মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চালগুলির দিকে তাকিয়ে কিশোরী বলে, "মা চালগুলি কুড়িয়ে নি।" ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায় বিন্দু। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলে, "ঐ গুলো আর কেউ কুড়িয়ে নিক্। আমি মা হয়ে ঐ চাল ঘরে তুলতে পারব না।"—"কিন্তু মা, বাটি দুটো তো গেল?"—"তার আর কি হবে? সবই তো গেছে, এবার মানুষ যাবার পালা। ও পাড়ায় কাল রাত্রে আরও তিনজন শেষ হয়ে গেছে। তাতো তুই জানিস্ না।"

প্রত্যেক পাড়াতেই দিন নেই, রাত নেই মড়াকান্না চলছে। গ্রামের শেষে পান-শেওলার ধারে যেখানে কেবল মৃত শিশুদেহ পোড়ানো হয় সেই জায়গায় এখন ছেলে বুড়ো সবাইকে পোড়ানো হচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়াল মৃতদেহ পোড়ানোর একটু জায়গা নিয়ে গ্রাম্য শ্মশানে প্রতিবেশীদের মধ্যে তর্কাতর্কি, তাই থেকে হাতাহাতি, পর্যন্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত লাশগুলো পান-শেওলার ডোবায় ফেলে দিয়ে আসা শুরু হল, শেষে কুকুর শিয়ালের খাদ্য হয়ে যায়।

আকালের আগে প্রত্যেক রবি আর বুধবারে কৃষ্ণদাসের বাড়ী থেকে গরুর গাড়ী লাইন দিয়ে বেরুত গঞ্জের দিকে। ইদানিং গঞ্জে ক্রেতারও অভাব দেখা দিয়েছে। বাড়ীতে বাড়ীতে চালের পাহাড় হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে কৃষ্ণদাস ঘুমোয় না, যদি হা-ঘরেরা রাত্রে লুঠপাঠ করে নেয় এই ভয়ে। কিছু কিছু করে রাতের অন্ধকারে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলা শুরু হল।

বাড়ীর নাগাড়ে কিষেণ, শিলু আর মধুকে গাড়োয়ান করে—রাতের অন্ধকারে কৃষ্ণদাস গাড়ী বোঝাই করে। ভোরের আবছা অন্ধকারে দীঘির পাড় দিয়ে যেতে যেতে গাড়ীর চাকার তলায় একটা কিছু ফাটার শব্দ শুনে গাড়ীটা থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল শিলু। দেখল, একটা মাথার খুলির উপর দিয়ে তার গরুর গাড়ী চলে গেছে। চমকে উঠল শিলু। শেষে মড়া-মানুষের মাথা গাঁয়ের রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। 'উঃ, কি অবস্থা!' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শিলুর গলা দিয়ে। আবার গাড়ী চলতে শুরু করে। গরু দুটো তেমন হাঁটতে পারছে না। লেজ পাক দিয়ে মোচড় দিলেও কিছুই হচ্ছে না। শেষে গরু দুটোকে লাঠি-পেটা করতে করতে আপন মনে বলতে থাকে—"শালা, কৃষ্ণদাস গাড়ী গাড়ী চাল পাচার করছে, বাড়ীতে চাল মজুত রাখার জায়গা নেই, আর দুমুঠো ভাতের জন্যে মানুষ মরে ভূত হচ্ছে। শালা, আমিই আবার সেই গাড়ীর গাড়োয়ান। ক্ষমতা আছে আমার এই গাড়ী লুট করবার বা সব চাল তাদের হাতে তুলে দেবার?" কথাগুলো আপন মনে বললেও মধুর কানে কিছু কিছু গেছল। মধু, শিলুকে সাবধান করে দিয়ে বলে,—"এই শিলু, চুপ কর। শালা, যা পারবিনে তা নিয়ে গজরাস্‌নে।" শিলু গরু দুটোর ল্যাজ দুটো একবার মুড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে "হেই হ্যাট হ্যাট, কেনে পারবি কেনে? তবে কি এই আকালে আমরা না খেয়ে মরবো। আর ব্যাটা কেষ্টদাসরা মওকা পেয়ে বড়লোক হবে?" শিলু আরও জোরে গাড়ী চালাতে থাকে, তার পিছু পিছু মধুও জোরে গাড়ী ছোটায়। মধু বলে—গরু দুটো আমার না খেয়ে খেয়ে মরতে বসেছে গাড়ী টানতেই পারছে না।

শিলুর গরু দুটোরও যে সেই অবস্থা। কোনোরকমে সকালের মধ্যেই সীমান্ত পার করে দিয়ে এল তারা। এত পরিশ্রমের বিনিময়ে দুজনে পেল মাত্র দু'কুনকে চাল। কয়েক দিনের মধ্যেই শিলু আর মধু দু'জনেই হলো ছাঁটাই। কৃষ্ণদাস ওদের রাখতে চায় না। 'নাগাড়ে' রাখবেই না। 'নাগাড়ে' মানেই সারা বছর সে বাঁধা। কাজ হউক আর না হউক মজুরী সে পাবেই। মাথায় ঢুকলো চিন্তা শুধু এই কারণেই নয়, বিশ্বাস করতেও তো পারা যায় না। মজুতের খবর তো সব জানা ওদের। কোথায় মজুত আছে সবই তো ওরা বলতে পারে।

ছাঁটাই হওয়ায় শিলু-মধু দুজনেরই সংসার অচল হয়ে উঠল। শেষে এক বুধবারের হাটে শিলু চাষের এক জোড়া গরু ছিল তাও গোহাটায় নিয়ে আসে। দুজন কসাই সামান্য কটা টাকা দু'জনের হাতে গুঁজে দিয়ে গরু দুটোকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে চলে গেল। বাড়া এসে শিলু টাকা কটা বো কমলার হাতে দিয়ে বলল,—"এই নে বউ, গরু দুটো বেচে দিয়ে এলাম। টাকা কটা হাতে নিয়ে বৌ বলে—টাকা কি হবে, চাল চাই। ঘরে একদানা চাল নেই, কোনো দোকানে চাল মিলছে না।" চৌকাঠে বসে শিলু খানিক মাথায় হাত দিয়ে বসে কি যেন চিন্তা করে? বৌয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—"বৌ যাতো টাকা কটা নিয়ে শালা কেষ্টদাসের বাড়ী, ঠিক চাল মিলবে।" কমলা চলে গেল জমিদার কৃষ্ণদাসের বাড়ী। খানিকবাদে দু'পালি চাল নিয়ে এসে বলল,—'দুপালি দিল। বাকীটা কাল দেবে বললো'। কৃষ্ণদাসের বৌ-বলে, "কমলা, একসঙ্গে সব চাল নিয়ে যেয়ে কি করবি, এই টাকায় যা পাবি রোজ দুপালি করে তাই থেকে নিয়ে যাস্। জমা রইলো।" কথাগুলো শুনে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল শিলু—"বলিস কিরে, তা কতচাল বাকী পাওনা রইলো?" ফ্যাল ফ্যাল করে শিলুর দিকে ভয়ে কমলা চেয়ে থাকে। শিলুই বলে—"দেখা যাক, কতদিন দু-পালি করে দিয়ে যায়।" দিন চারেক পরের কথা। শিলু সকালেই খবর পেলো, গতরাতের শেষে মধুর বউটা মারা গেছে। সমস্ত রাত বমি করেছিল। মধু মরা বউকে ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছে, সৎকারও করে যায়নি। যারা সৎকার করবে তাদের হাতে অন্ততঃ কিছু চাল আর মদ দিতে হবে। সে পয়সাও তার কাছে ছিল না। তাই কেউ তার ডাকে আসেনি। মধুর বউ ছ'মাসের গর্ভবতী ছিল।

শিলুই বা কি করে? আকালে তার দুবিঘে জমি বন্ধক গেছে, গরু দুটো বিক্রী হয়ে গেল। এবার কি হবে? চিন্তা করে কোন কূল-কিনারা করতে পারলো না। গাঁ তো প্রায় 'ছোট-লোক' শূন্য হতে চলেছে। তার মতো

নাগাড়ে ছিল, এমন কয়েক ঘর এখনও আছে। তাছাড়া আছে এখনও তুচার ঘর কিষেণ, সাঁওতালপাড়ায়। সংসার অচল হয়ে গেছে, তুজনেই কদিন শুকিয়ে আছে। রোজ তু'পালি করে চাল গত হপ্তা থেকে বন্ধ। কমলা দরদাম করতে গেছলো কেষ্টদাসের বৌয়ের কাছে। কৃষ্ণদাস গৃহিণী সোজা উত্তর দিয়েছে —"দরদাম আবার কিরে? টাকার কি এখন কোনো দাম আছে নাকি! যে কদিন তুপালি করে দিয়েছি যথেষ্ট দিয়েছি, বরং বেশী দেওয়া হয়ে গ্যাছে। নিশ্চয়ই তোকে শিলু পাঠিয়েছে।" বিশেষ বাদপ্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে কমলা চলে এসেছে। তাছাড়া 'টাকার দাম নেই'—এর মানে তো সে জানে না। শিলু স্থির করে ফেলেছে সে এবার দেশ ছেড়ে পালাবে। যেন এ গাঁয়ে থাকলেই না খেয়ে মরবে অন্য গাঁয়ে হয়তো খাদ্য আছে। সারাদেশের ছবিটা তার যে জানা নেই। রাত্রে বিছানায় বউকে একদিন বলেই ফেললো—"ত্বাখ, বোসেদের কর্তার কাছে কাল গেছলাম। আমাদের তো কিছু জুটছে না, আমি বরং কোথাও কাজের চেষ্টা করে দেখি। গাঁয়ে কাজ না জোটে শহরে যাবো। কারখানায় কাজ জোটাতে চেষ্টা করি তুই বরং কারুর বাড়ি কাজ জুটিয়ে নে। অন্ততঃ বেঁচে থাকবি, তুবেলা তুমুঠো খেতে পাবি।" কমলার মুখ কালো হয়ে যায়। স্বামীর মুখের ওপর তীব্র আপত্তি, জানিয়ে বলে—"না না আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাবো। তুজনেই কাজের চেষ্টা করবো।" শিলু নিষেধ করে—"না, না, তুই আমার সঙ্গে ঘুরতে পারিস্ না কি? আর তাছাড়া কাজ যে মিলবে তার কি কিছু ঠিক আছে নাকি? আমার মতো অনেকেই তো এখন কাজের সন্ধানে শহরের পথে। সেখানেই বা এত কাজ দেবে কে?" কমলা শিলুর পা জড়িয়ে ধরে বলে, "আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।" সারারাত চিন্তা করেও শিলু ওর প্রস্তাবের কোন উত্তর ঠিক করতে পারলো না। পরদিন সকালে বলে,—"তুমি কয়েকদিন অন্ততঃ এখানে থাকো। তারপর আমি আবার ফিরে আসবো" শিলু তাকে সঙ্গে কিছুতেই যে নিলে না। শিলু একদিন গ্রাম ত্যাগ করলো চুপিসারে। কমলা বাধ্য হয়ে যোগ দিল কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে ঝিয়ের কাজে। বাঁধা ঝিয়ের কাজ। তার থাকার জন্য গাঁয়ের শেষে একটা চালাঘরও তৈরি হল। আর শিলু যে সেই ঘর থেকে গেল আর ফিরে এলো না। দেশের যখন এই চেহারা তখন নরেন্দ্রদের অবস্থা কেমন জানুন।

নরেন্দ্র মিত্র এ গাঁয়েরই মোটামুটি মধ্যবিত্ত ছাপোষা মানুষ। গাঁয়ের এক জমিদারের বালির খাদের ম্যানেজার। জমিদারও খুব কেউ কেটা নয়। খাদও কয়েকটা নয়। তবু বালিখাদের ব্যবসা তো কাঁচা পয়সার আমদানী আছে। বালিখাদের মালিককে লোকে একটু সমীহ করেই চলে। কিন্তু জমিদারদের শরিকানী গোলমালে খাদের গণেশ একদিন গেল উল্টে। নরেন্দ্র হলেন বেকার। স্ত্রী মৃণ্ময়ী একদিন স্বামীকে বললেন,—"খাদ তো বন্ধ হলো একটা কিছু করার চেষ্টা করো।, আমার দুগাছা সোনার বালা তো এখনো আছে। ঐ দুটো বাঁধা দিয়ে বাজারে তরী-তরকারীর দোকান করো। সংসারটা তো চালাতে হবে। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে না হলে শুকিয়ে মরতে হবে।"

চিন্তিত মুখে নরেন্দ্র বললেন,—"ঠিকই বলেছো মৃণ্ময়ী। একটা কিছু করতে হবে।" কিন্তু—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃণ্ময়ী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—'কিন্তু কি বলছো?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরেন্দ্র উত্তর করলেন—"মৃণ্ময়ী বালা দুটো কি সূত্রে তোমার কাছে এলো মনে আছে?"

মৃণ্ময়ী স্বামীর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে বললেন—মনে থাকবে না। মা মারা যাওয়ার আগে ঐ বালা দুটো আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন—হ্যাঁ ঐ দুটো আবার মাকে আমার ঠাকুমা পরিয়েছিলেন।

এতো পুরোনো আর মায়ের স্মৃতি জড়ানো থাকা জিনিস দুটো বেচে দিয়ে আমি ব্যবসা করবো? কিছু তো ভেবে উঠতে পারছি না।

—দরকারে কাজেই যদি না লাগলো তবে আর সোনা জমিয়ে আর করবো কি? আকালের দিনে লোকে সোনা দিয়ে চাল কিনছে।

নরেন্দ্র মৃণ্ময়ী যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন তখন বাড়ীর পোষা দুটো বেড়াল এসে ওদের পাশ ঘেঁসে এসে 'ম্যাও'-'ম্যাও' করতে থাকে। এঁদের দুঃখের দিনে এরাও বুঝি ব্যাথা পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অচল সংসারটাকে সচল করার আশায় নরেন্দ্র কিছু জমি বন্ধকী দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে মাইলতিনেক দূরে একটা গঞ্জে তরী-তরকারীর দোকান করেই শুধু ক্ষান্ত হলেন না। সকলকে নিয়ে একটা ছোটো বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিলেন। মৃণ্ময়ী ও ছেলেমেয়েরাও চলে এলো নতুন ভাড়া বাড়ীতে।

কয়েক বছর পার না হতেই আবার গাঁয়ে ফেরার পালা। তরী-তরকারীর বাজারে আড়তদারদের কাছে নরেন্দ্রকে হারমানতেই হলো। বেশী সাজিয়ে বড় করে দোকান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে সব গুটিয়ে দিয়ে আবার গাঁয়ে ফিরে এলেন। দারিদ্র্য আরও বাড়লো। এই সময়ের মুখে দেখা দিল মধ্যম পুত্রের কঠিন রোগ ডিপথেরিয়া। ঘরে এখন অর্থ কানাকড়িও নেই যা দিয়ে রোগের কোন চিকিৎসা হয়। প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই সে শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

নরেন্দ্রদের গাঁ-খানির আয়তন বেশ বড়। প্রায় সব জাতের লোকের বাস। আছে কৈবর্ত্য, বাউরি, ডোম, জেলে, দুলে, বাগদী, মুচি, নাপিত, সাঁওতাল, মুণ্ডা, বামুন, কায়েত, চাঁড়াল, হিন্দু, মুসলমান, সব জাতের লোকই। গাঁয়ের জমিদার আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলি সমাজের শীর্ষে বলে মাঝখানে বাস করে। বড় বড় পাকা দালানবাড়ী আর গরীব-গুরবোরা গাঁয়ের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এরা মাঝের পাড়ার বাবুদের জমিতে সস্তায় শ্রম দিয়ে আসে—যা প্রায় বেগার খাটার সমতুল্য। বাবুরা এদের ভাদ্রের অসময়ে দাদন দেন আর পৌষ মাঘের বেলায় শোধ নেন। ঝাঁটা আর কুলো নিয়ে বাড়ী ফেরে ওরা আগাম দাদন নেওয়ার জন্য। আর এই আকালের দিনে করিতকর্মা 'বাবু'। তাদের ঘরের শ্রী ফিরে গেল। লোকে জলের দামে জমি বেচতে শুরু করলো আর ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনির দেখা মেলে ঠিক তেমনিই কে জমি বেচবে তার সন্ধানে মহাজনেরা ওৎপেতে থাকে। হাজার টাকার কম দাম হতেই পারে না তার সেটা প্রায় অর্ধেক দামে গ্রাস করে। আকালে অনেকে জমি হারালো। বাগান-পুকুর, গরু-ছাগল, শেষে হাঁস-মুরগীও বাদ গেল না। জানালা-কপাট পর্যন্ত খোলা শুরু হলো। গয়না-গাটি শেষে ভিটেটুকুও বিক্রী করে দিয়ে অনেক পরিবার অজানা উদ্দেশ্যের পথে পা বাড়াল। পরগাছারা দেশের রক্ত খেলো, হাড় খেলো, মাস খেলো শেষে চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাল। দেশে দেখা দিল কারুর পৌষমাস, কারুর সর্বনাশ।

নরেন্দ্র একদিন দ্বিপ্রহরে বাইরে বাড়ীতে বিমর্ষ চিত্তে বসে আছেন। গাঁয়ের সমবায় ব্যাঙ্কের পিয়ন সিধু এসে বলে গেল—ডিরেকটার বোর্ডের মিটিন হচ্ছে, বাবুরা আপনাকে ডাকছে। নির্দেশ শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন নরেন্দ্র। পিয়নের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কেন? আমাকে ডাকছে কেনরে সিধু?

সিধু উত্তর করল—কেন ডাকছে তার আর আমি কি জানবো? আমায়

ডাকার হুকুম করেছে, হুকুম তামিল করছি। মনে হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে তোমায় লোন দিবে?

—লোন দেবে? আমি যা লোন করেছি তাই-ই শোধ হয়নি। তারপর আবার লোন দেবে? তাছাড়া আমি তো লোন চাইনি। যাকৃগে, চল্ ডাকছে যখন যেতেই হবে। কথা শেষ করে নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কের দিকে রওনা দিলেন।

ডিরেকটর বোর্ডের সভায় নরেন্দ্র উপস্থিত হতেই মেম্বর জমিদার বাঁড়ুজ্জ্যেমশাই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আসুন, আসুন নরেনবাবু। বসুন, বসুন। আমাদের পাশেই বা মাঝেই বসুন। গাঁয়ের ব্যাঙ্ক, আপনারাই মা-বাবা।

নরেন্দ্র অপমানিত বোধ করলেন। বসতে অস্বীকার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলেন আমাকে ডাকার কারণ কী বলুন? আমি ভনিতা ভাল বাসি না। বাঁড়ুজ্জ্যেমশাই দাঁতমুখ ভেঙচে জিজ্ঞেস করলেন—তিন বছর পার হয়ে গেল। দেড়শটি টাকা তুমি ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নিলে। তা তো শোধ দেবার নাম নেই। ঐ টাকা এখন সুদে মূলে কত হয়েছে জানো? পাঁচশো। পাঁচশো টাকা— বলেই নরেন্দ্রের মুখের কাছে চলে গেলেন। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—ঐ পাঁচশোটি টাকা যদি সাতদিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে না পারো—

জমিদার দাশ মশাই বাঁড়ুজ্জ্যের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললেন— সব নিলামে তুলে দেওয়া হবে বুঝলে বাবু নরেন্দ্র। তোমার জন্যেকি আমাদের এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা ব্যাঙ্কটা ফেল মারবে?

ধীরস্থিরভাবে নরেন্দ্র জবাব দিলেন—এর আগেও তো ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নিয়েছি। শোধও করেছি। আমি এটাও নিশ্চয়ই শোধ করবো।

চোখের পুরু গ্লাসের চশমাটা একবার সেট করে নিয়ে দাশমশাই ইজি চেয়ারটায় সটান শুয়ে নিয়ে বললেন—দিতে যখন পারবে, তখন মিটিয়েই দাও না বাপু।

—আজ্ঞে, আর কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে আমাকে।

নরেন্দ্র চমকে উঠলেন জমিদার কৃষ্ণদাস ব্যানার্জীর ভারী গলার হুংকারে। কৃষ্ণদাস পায়ের ওপর পা দিয়ে ফতুয়া আর ফাইন ধুতি পরে একটা গদী আঁটা চেয়ারে বসেছিলেন। দুধের মত গায়ের রঙ। গোলগাল চেহারা। বনেদী জমিদার বংশের নীলরক্ত ধমনীতে বহমান। গাঁয়ের সবাই ভয় খায়। কতটা শ্রদ্ধা করে বলা শক্ত। গাঁয়ের ব্যাঙ্কের তিনি মস্ত বড় একজন অংশীদার। ব্যাঙ্কের অংশীদাররা

কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে তাঁর মতামত না নিয়ে কিছু করেন না। কৃষ্ণদাস চেঁচিয়ে উঠে বললেন—সময় দিতে টিতে পারা যাবে না। সুদে আসলে তোমার কাছ থেকে পাওনা পাঁচশ' টাকা। আজকের এই আকালের দিনে তুমি ঐ টাকা শোধ দিতে পারবে? এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? ধাঁওতা দেবার জায়গা পাচ্ছো না। নরেন্দ্র জানতে চাইলেন—এতটাকা আমার কাছ হতে পাওনা হল কিকরে? হিসেব হলো কি ভাবে?

কৃষ্ণদাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন—হিসেব না করেই কি আমরা বলছি? তুমি কি আমাদের তোমার মতো ঠগ পেয়েছো। এরপর আর কথা হতে পারে না। কৃষ্ণদাসরা যে কুটিল প্রকৃতির লোক তাতে বেশী চ্যালেঞ্জ করলে নরেন্দ্রদের এ গাঁয়ে টেকাই দায় হয়ে পড়বে। গাঁয়ের অনেক কৈবর্ত্য, বাগদী, ঢুলে জমি জিরেত ছেড়ে অন্য গাঁয়ে পালিয়ে গেছে। একতো আকালের টান, দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণদাসের সীমাহীন লোভ, পরশ্রীকাতরতা, বলাহীন অত্যাচার, শোষণ।

দিন দুই পরে নরেন্দ্র বোর্ডে জানিয়ে এলেন যে অতো টাকা শীঘ্র নগদে পরিশোধ তিনি করতে পারছেন না। কাজেই 'কারবার নামা' দেখে পৈত্রিক ভিটাটুকু সমেত বাকী যা স্থাবর সম্পত্তি আছে তা তিনি ব্যাঙ্ককে ছেড়ে দিতে বাধ্য। আবার বোর্ডের সভা বসল শুধুমাত্র 'ডিফলটার' নরেন্দ্রের বিষয় আলোচনা করার জন্য। সুদ ও সুদে-আসলে যা দাঁড়িয়েছে তা পরিশোধ করতে নরেন্দ্রকে তো ফকির হতে হবে। বোর্ডের সদস্যরা অবশ্য 'সহৃদয়তা'র সঙ্গে গাঁয়ের প্রতিবেশী নরেন্দ্রর বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। আপাততঃ নাকি তাঁর ভিটায় হাত পড়বে না। একদিন জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে লুচি মণ্ডার সমাবেশ করে বোর্ডের মেম্বাররা নিজেরা উপস্থিত থেকে নরেন্দ্রের পনেরো বিঘা শালী জমি, পুকুর, বাগান মাত্র পাঁচশো টাকায় সাফকোবলা বিক্রি দলিল রেজিষ্ট্রি করে নিলেন।

গাঁয়ের কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্তাব্যক্তিরা এরপর থেকে নরেন্দ্রের ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব জমিজমা, বাগান, পুকুরের মালিক হয়ে বসলো। বেশীটাই গেল জমিদার কৃষ্ণদাস বাঁড়ুজ্জ্যে মশাইয়ের উদরে।ইতিমধ্যে নরেন্দ্রের মধ্যমপুত্র ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। কিছুতেই তাকে ফেরানো গেল না।

জীবিকা ও কাজের সন্ধানে নরেন্দ্র ও তার জ্যৈষ্ঠ্য পুত্র মদন গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। নরেন্দ্র একটি রেল স্টেশন সংলগ্ন বাজারে তরী-তরকারী নিয়ে বসে পড়ে। বাড়ীতে টাকা পাঠায়। খোঁজ-খবর বিশেষ নিতে পারে না। একটা চালাঘরে একার সংসার পেতে দুবেলা দুমুঠো নিজেই ফুটিয়ে নেয়। ঘরের মধ্যে

অনন্ত শয্যার মতো পাতা রয়েছে দড়ির খাটিয়া তাতে একটা মোটা কাঁথা, তার উপর একটা চাদর বিছানো। চাদরটা সব সময় কাচাও সম্ভব হয় না। ফলে সেটা ময়লা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে একটা জনতা স্টোভ, একটা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, তাতে দুজনের ভাত ভালোভাবে হয়। একটা ছোট কড়াই, খুন্তি, থালা, কলাইয়ের বাটি, ছোট বঁটি আর গোটা তিনেক কৌটো। তাতে হয়তো চাল, চিনি বা গুড় অথবা মশলাপাতি থাকে। বাক্স বা স্যুটকেশ ঘরের কোথাও নেই। একটা বালতি তাতেই সব কাজ চলে যায়। জুতো পরিষ্কার থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

মদন কিছুকাল এদিক সেদিক ঘুরে চাকরী জোগাড় করতে না পেরে মামা বাড়ী রওনা দিল। কিন্তু সেখানেও ভালো ব্যবহার না পেয়ে রেলে কুলির চাকরী জোগাড় করে নিল।

আকালের পর এক বছর কেটে যায়। মৃণ্ময়ী বাড়ীতে এক বছরের শিশুপুত্র আর চার কন্যা নিয়ে দিন কাটায়। সংসার চালানো এক দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামী যখন যা পারে পাঠায়। মদনের কোন খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না। এদিকে শিশুর নামকরণ করা হয়েছে। নাম তার 'শ্যামল'। দিদিদের মধ্যে কেউ এ নাম রেখেছে হয়তো গায়ের রঙ দেখে। আকালের ছোপ পড়েছে সারা দেহে। মরতে মরতেও মরেনি। প্রায় দিনই পাড়ার লোকে শুনতে পেতো মৃণ্ময়ীর গলা—"ওরে কে আছিস ঘরে? শ্যামলা কেমন করছে একবার আয়না তোরা কেউ।" বোনেরা ছুটে এসে কোলে তুলে নিত রুগ্ন ভাইটাকে। কোলে তো ধরে রাখাই যায় না। এমন অবস্থা। মা আর দিদিদের উদ্বেগ। ডাক্তার ডাকবে তার পয়সা কোথায়। বিনা পয়সায় তো আর রোগীর কাছে কোন ডাক্তার আসে না। এইভাবেই কেটে যায়। শিশুরোগ 'তরকা'র হাত থেকে বেঁচে থাকে কোনও ঔষধ পথ্য ছাড়াই। ক্রমে শিশু শরীরে মাংস হারাতে থাকে। হাড় জির-জিরে শরীরে দেখা দিল ভয়ঙ্কর কালা জ্বর।

মা মৃণ্ময়ীও এর মধ্যে হতাশ। মেয়েদের শরীরে আকালের স্পষ্ট ছাপ। নিজেও ক্রমশঃই উত্থানশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। শরীর দিন দিন পাংশুটে মেরে যাচ্ছে। শেষ সন্তানের জন্মের ধকল, তারপর পরিবারে কোনদিন খাওয়া জুটছে, কোনদিন একাহার, আবার কোনো কোনোদিন অনাহার। বিদেশে পড়ে থাকা স্বামী পুত্রের চিন্তা। রোগ হলে চিকিৎসা হয় না। ডাক্তারের ফি দেবার পয়সা, ওষুধ কেনার পয়সা, এসব জুটবে কি করে? অবশেষে মৃণ্ময়ী পৌষের প্রবল শীতের

শেষ রাতে চোখ বুজলেন। মৃত্যুর পূর্বে মেয়েদের বিছানার কাছে আদর করে ডেকে নিয়ে বলে যায়,—"দেখিস মা তোরা তোদের এই ছোট ভাইটাকে। আমি তো চললাম। এরপর তোদের হাতে ওর জীবন। ওকে মানুষ করার দায়িত্ব তোদের দিয়ে যাচ্ছি।" স্বামী বা পুত্র মদন কেউই এসময় উপস্থিত নেই। মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীরা সৎকারে এগিয়ে এলো। জমিদার কৃষ্ণদাস বাঁড়ুজ্জ্যেও স্থির থাকতে পারেনি। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে ভট্টাচার্য মশাই, চাটুজ্জে মশাই, রায়চৌধুরী পরিবারের বড় কর্তা। কৃষ্ণদাসের পায়ে খড়ম, খালি গা, পৈতেটা হয় কোমরে গোঁজা আর না হলে বাড়ীতে গৃহদেবতার কাছে তুলে রেখে এসেছেন। লক্ষ্য পড়ছে না অন্যদের গায়ে বা কোমরে একটা গামছা জড়ানো। এরা বোধহয় শশ্মান যাত্রী হতে ইচ্ছুক। হিন্দুর বাড়ীর সধবা। তাকে সৎকার করতে যাওয়া পুণ্যির কাজ। পুণ্যির এতো বড় একটা মওকা কেউ কি মাঠে মারতে দিতে পারে? কৃষ্ণদাস খট খট করে বাড়ীর উঠোনে এতো বেশী 'সহানুভূতির' সুরে জিজ্ঞেস করে হ্যাগো মেয়েরা, তা নরেনের বৌ মানে তোমাদের মা কখন মারা গেল গা। আহা অমন সতী সাধ্বী বৌ কজন পায়? নরেন আগের জন্মে অনেক পুণ্যি করেছিল তাই....।

কৃষ্ণদাসের সঙ্গের একজন ঘাড় নাড়তে নাড়তে কথার পিঠে কথা যোগ করে হ্যাঁ দাই, তাই তো? অমন সুন্দর বৌ, এপাড়ায় কটা ছিল?

ওদের ভিতর থেকে অপর একজন বাড়ীর মেয়েদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলো— হ্যাঁ গা মেয়েরা তা তোমাদের মাকে উঠোনে আনবে না।

বড় মেয়ে উত্তর দিল—আপনারা এসেছেন আমরা ধন্য হয়েছি। আমরা নিজেরা একটু গুছিয়ে নিই। আপনারা দয়া করে বসুন। বলে কাঠের পিঁড়ি পেতে দিতে গেলে কৃষ্ণদাস হা হা হা হা করে উঠলেন—এ্যাঁ, না, না। অশৌচ হয়েছে তোমাদের, আমরা কি বসতে পারি? আমরা হলুম বামুন। আর তোমরা হলে শূদ্র। মনে কিছু কোরো না মা। শূদ্র মারা গেলে বামুনেরা সে বাড়ীতে পা দেয় না। আমরা তো অনেক দূর এগিয়েছি। আমরা খুবই এ যুগে প্রগতিশীল হয়ে পড়েছি। কি বলুন না ভট্টাচার্য মশাই, আপনি শাস্ত্রও জানেন আবার।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশাই ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ, তাইতো তাইতো। 'আমরা প্রগতিশীল না হলে এ' হতভাগা নরেনের বাড়ীতে তার অনুপস্থিতিতে ঢুকতাম না কি? বিশেষতঃ এই সময়ে? মরা বাড়ীতে? মৃণ্ময়ীর শবদেহ ঘর থেকে বার করা হল। মেয়েরা সিঁদুর দিয়ে দিল সিঁথিতে,

কপালে, পায়ে দেল লাল আলতা। মেয়েদের আকুল কান্না। ওরা আছড়ে পড়ছে মায়ের ওপর। কেউ বা পা ধরে চোখের জল ফেলছে। দাদা, বাবা কেউ বাড়ী নেই, আর ছোট ভাইটার কথা ভেবে ওরা স্থির থাকতে পারছে না। শ্যামল কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু দিদিদের কান্না শুনে সেও চীৎকার করছে। পাড়ার মহিলারা এসে জড়ো হয়েছে। এয়োতী মারা গেছে। এ নাক সৌভাগ্যের। কিছুক্ষণের মধ্যে মাচা বাঁধা হল। মৃণ্ময়ী যে মাদুরে শুয়ে থাকতেন তা সেটা শুদ্ধ চারকোণে চারজন ধরাধরি করে 'হরিবোল' দিতে দিতে ঘরের বাইরে এনে ;একেবারে সটান বাঁশের মাচার উপর চাপিয়ে দিল। তারপর শুরু হল শব বাঁধার কাজ। শ্যামল কাঁদতে কাঁদতে কখন চুপ করে গেছে। সে চোখদুটো বড় বড় করে বড়দির কোল থেকে মায়ের শেষ যাত্রা লক্ষ্য করতে থাকল। সংবাদ পেয়ে নরেন্দ্র যখন বাড়ী ফিরলো পাড়া প্রতিবেশীরা ত্রিবেণীতে শবদাহ করে ফিরে এসে বারান্দায় চুপ করে বসে আছে। নরেন্দ্র বাড়ী এসেছে শুনে কৃষ্ণদাসবাবু আবার এসে উদয় হলেন। সান্ত্বনা দেবার সুরে নরেন্দ্রকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এ জগতে কিছুই চিরন্তন নয়। যেতে একদিন সকলকেই হবে। তবে তুমি বাড়ী ছিলে না এই যা দুখুঃ। তবে সৎকারে কোন ব্যাঘাত হয়নি। কোন তিলমাত্র অসুবিধে হতে দিতে দিইনি। গায়ের সুনাম, পাড়ার সুনাম, আমাদের সকলের সুনাম। তা ভাই নরেন, আর কি হবে, যা হবার তা তো হয়ে গেছেই। এবার গা হাত পা ধুয়ে ফেলো। চানটা করে এসো। সবাই চান করে এসেছে। নরেন্দ্র কৃষ্ণদাসের কথায় বিরক্তি বোধ করছিল। যে কৃষ্ণদাস তাকে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছে। সে এসেছে আজ কপট সহানুভূতি দেখাতে! এও সহ্য করতে হবে! নরেন্দ্র ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করলো, আপনি বাড়ী যান কেষ্টদা। আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। তা নিয়মানুযায়ী যা যা করার ঠিক করবো। আপনাকে কষ্ট করে পরামর্শ দিতে হবে না। আমার ব্যাপার আমাকেই ভাবতে দিন।

কৃষ্ণদাস একটু থতমত খেয়ে যায়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা ভালো বোঝো করো। আমরা গাঁয়ের প্রবীণ সজ্জন, ধর্ম, সমাজ এসব তো মানতে হবে। নরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলে—হ্যাঁ ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে। আপনারা আপাততঃ আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি। আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। অপ্রস্তুত কৃষ্ণদাস এরপর স্থানত্যাগ করাই

শ্রেয়ঃ মনে করে ঠক ঠক করে বেরিয়ে যায়। তার সঙ্গে আর যে কজন এসেছিল তাঁরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। স্ত্রী মৃণ্ময়ীর পর নরেন্দ্র আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি।

নরেন্দ্রের 'লাটবাংলো' বাড়ীটা এখন ভগ্নপ্রায়। ছাদের কার্ণিশে অশ্বত্থ গাছ দেখা দিয়েছে। পাকা দালান বাড়ীর লোহার কড়িগুলো ছাদ ধ্বসে পড়া ঠেকিয়ে রেখেছে। 'হাওয়াখানা'র অবস্থা না বলাই ভালো। দালানের উত্তরদিকের পূর্ব-পুরুষের চণ্ডীমণ্ডপ ও তার বেদীটার চিহ্ন রয়ে গেছে। পূজো-পার্বণ বহু কাল বন্ধ। এ প্রাসাদোপম বাড়ীর শরীক অনেক। কোন মামলা মোকর্দমা নেই বটে, কিন্তু ভাগের মা গঙ্গা না পাওয়ার মত অবস্থা। পূজামণ্ডপের ছাদ ফুটো। ফুটো ছাদ দিয়ে হু হু করে জল পড়ে। এ ছাদটায় পা টিপে টিপে চলাফেরা করতে হয়। সব সময় ভয় হয় এই বুঝি ভেঙ্গে পড়লো। শ্যাওলায় গোটা ছাদটা ভর্তি। দালানের কড়ির খোপে খোপে অসংখ্য পায়রার বাস। দিনে রাতে ওরাই এ বাড়ীর প্রধান বাসিন্দা। আর থাকে 'হাওয়াখানা'র শেষের একটি ঘরে শ্যামল। ওখানে ও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাঝে মাঝে পড়া থেমে গেলে খোলা জানালা দিয়ে দূরের চাঁপা গাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। চাঁপা গাছটাকে কত ছোট দেখেছে। আজ ওটা একটা বড় গাছ। ডালপালায় ভর্তি। একদিন গাছটাও শুকিয়ে মরে যাবে। যেমন তার পাশের বুড়ো চাঁপাগাছটার পরিণতি ঘটেছে। যেমন এ বাড়ীটা যারা তৈরী করতে হাত দিয়েছিলেন তাঁরা আজ আর নেই। লোহার পাত মোড়া কয়েকটা দরজা কে বা কারা খুলে নিয়ে চলে গেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী শাসনের পরিণতি যা হয় তাই ঘটে চলেছে।

নরেন্দ্রের বয়স এখন ষাটের উর্দ্ধে। রোগে ভুগে ভুগে শরীর কঙ্কাল। চোখগুলো কোটরে ঢুকে যাচ্ছে। নিয়মিত স্নান নেই, শরীরে যত্নের বালাই নেই। উপার্জনক্ষম বদরাগী জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভয়েই অস্থির। দুপুরে ভাতের গ্রাস মুখে তুলেও উঠে আসতে হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটে যায়। বেলা আড়াইটার পর লাঠি হাতে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে 'লাটবাংলো'য় চুপ করে বসে পড়েন। লোল চর্মসার অকর্মণ্য দেহটা দেওয়ালে ঠেসে ধরে বিশ্রাম নেবার উপায় খোঁজেন। সরু সরু পা দুটো দিনদিন সোজা হয়ে যাচ্ছে। এ সময়টা হয়তো গরমের ছুটি, কলেজ ছুটি। কাজেই শ্যামলকেও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু বিকেল তিনটে বাজলেই নরেন্দ্রের কাঁপা গলার আওয়াজ কানে যায়—"যা বাবা শ্যামল। যা 'মুই'

সেই এগারোটায় বাঁধা পড়েছে চোমরার পাড়ে, ঠায় গোঁজে বাঁধা। যা 'মুই'-কে অন্য কোথাও বেঁধে দিয়ে আয়। ঘাস ছাড়া ত ওর পেটে আর কিছু তো আগের মতো জোটানো যাচ্ছে না। খোল-ভূসি গেছে বন্ধ হয়ে। যা বেলা তিনটে বেজে গেল।" পড়াশুনায় ব্যাঘাত হবে তা সত্ত্বেও শ্যামল বইয়ের পাতা বন্ধ করে মুইকে 'জায়গা পাল্টে' দিয়ে আসতো। হয়তো বা নরেন্দ্র কোনদিন বলতো—ওরে শ্যামল, চ দেখি বাবা, 'মুই'য়ের জন্যে কিছু গোলঞ্চ পেড়ে নিয়ে আসি। পরে বাপ-বেটায় নৃপেন বাবুদের বাগানে ঢুকতো আর শ্যামল বিরাট বিরাট তেতুল গাছে উঠে 'গোলঞ্চ' লতা কেটে কেটে তলায় ফেলতো; নরেন্দ্র ধীরে ধীরে সেগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতো। তারপর শ্যামল গাছ থেকে নিচে নেমে এলে দুজনে মিলে সেগুলো টানতে টানতে বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যেতো। সন্ধ্যার সময় 'মুই' পুকুরপাড় থেকে গোয়ালে এসে মহা আনন্দে গোলঞ্চ ডাল কাটা চিবোতো, আর নরেন্দ্র তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিত।

বেশ কয়েকদিন হল নরেন্দ্রের উত্থান শক্তি কমে গেছে। বিছানায় শয্যাশায়ী। পা টেনে টেনে যখন বাড়ী থেকে 'লাটবাংলো' বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন এই রকম এক সময় উঠোনে আছড়ে পড়ে যায়, নিজে উঠতে পারেনি। শ্যামলের বৌদি দৌড়ে এসে শ্যামলকে ডাকাডাকি শুরু করে দেন, "ঠাকুরপো, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসো, বাবা পড়ে গেছে।" শ্যামল একটা বই ... ছিল। বইপত্র যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফেলে রেখে দৌড়ে এসে শ্যামল আর তার বৌদি বাবাকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে নিয়ে যান। নরেন্দ্র তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। শুধু একটা অব্যক্ত আওয়াজ গলা দিয়ে বের হয়ে আসে। বেশ কিছুকাল চললো বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার ছাল বেটে লাগানো, তেল মালিশ করা, কিন্তু নরেন্দ্র সেই যে বিছানা নিল আর উঠে খাড়া হতে পারল না। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই বিছানায় পড়ে থাকল দীর্ঘ কয়েক মাস। মাঝে মাঝেই অস্থির হয়ে বৌমাকে ডাকাডাকি করে। বৌমা কাছে এলে বিছানার পাশে বসতে ইঙ্গিত করে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলে মা, আমি তো আর বাঁচব না। কিছুই তোমাকে দিয়ে যেতে পারলাম না, শ্যামলকে তুমি খুব ছোট দেখেছো। ও থাকল, মদন তো আমায় ক্ষমা করলো না। তুমি আমায় ক্ষমা করো মা। বৌমার চোখেও জল। শ্বশুর মশাইয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রুদ্ধ গলায় উত্তর দেয় বাবা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শ্যামলের কোন কষ্ট হবে না। আপনারও তো আমরা কোন চিকিৎসা করতে পারলাম না।

ধীরে গলায় নরেন্দ্র বলে—আমার চিকিৎসায় তোমার হয়তো অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করবে মা। সবই আমার ভাগ্য। আমি তো সারা জীবনে কিছু সঞ্চয় করে যেতে পারিনি। যে তার বিনিময়ে আমার ওষুধপত্থি আসবে। যাক্, ছেড়ে দাও মা, ওসব কথা। যাও, এখন যাও। শ্যামল বাড়ী এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আজ তো শনিবার সে তো আজ বাড়ী আসবে।

শ্যামলের পরীক্ষার ফল বের হবার কয়েক মাসের মধ্যেই একটা ইস্কুলে মাষ্টারী জুটে যায়। শনিবার বাড়ী এসে সোমবার আবার রওনা হয়ে যায়। আর বাড়ী এসে এখন থেকে আর 'লাটবাংলো' বাড়ী শুতে না গিয়ে অসুস্থ বাবার বিছানার পাশেই একটা খাটিয়া পেতে রাত কাটায়। নরেন্দ্রের নাক ডাকার অভ্যাস ছিল, যার জন্য শ্যামল রাত্রে ভালো ঘুমুতে পারতো না। একদিন ভোরের দিকে বাবার নাক ডাকার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে খাটিয়া ত্যাগ করে মশারী তুলে বাবার গায়ে হাত দিয়ে শ্যামল চমকে ওঠে—তাহলে সব থেমে গেছে। রাত্রেই নরেন্দ্রের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শ্যামল চীৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, 'ও দাদা, বৌদি ঘরে আসুন।' 'বাবা নেই, বাবা নেই।' পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে ওরা। মদন একবার নাকের কাছে হাতটা দিয়ে গ্যাখে। বৌকে বলে—যাও। একটু গঙ্গাজল আর তুলসী পাতা নিয়ে এসো। বৌ দৌড়ে তুলসী পাতা গঙ্গাজল আনলে মদন তা বাবার গলায় ঢেলে দিলে তার এক ফোঁটাও ভিতরে প্রবেশ করল না। বাইরে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রের জীবনদীপ একেবারে নিভে গেল।

নরেন্দ্রের মৃত্যুর পর দীর্ঘ বিশ বছর পার হয়ে গেল নানা ঘটনার আবর্তে। ইতিমধ্যে শ্যামলকে তার পৈতৃক ভিটা ছাড়তে হয়েছে। ধীরে ধীরে সে নিজেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে থাকে। মদনের কাছে সেটা অসহ্য। কোন মতেই সে তা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। দুর্গাপূজার ছুটি পড়লে অষ্টমীর দিন বাড়ী রওনা দেয়। কয়েকটা দিন দেরী হয় স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে লক্ষ্য করে ঘরে পাল্টা তালা পড়েছে। ঘরের বাইরে যাবতীয় বই স্তূপীকৃত ফেলে রাখা হয়েছে। নীচে নেমে গিয়ে বৌদিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৌদি উত্তর দেয়—"আমি জানি না। তোমার দাদা বলে গেছে। তোমার আর এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না।"

শ্যামল ক্ষুব্ধস্বরে জানতে চায়—কিন্তু আমার অন্যায়টা তো বলবে। বৌদি সোজাসুজি উত্তর দেয় ন্যায়-অন্যায় আমার জানা নেই। আমাকে যা বলে গেছে তাই বললাম তোমাকে। এর আগেও তো তোমাকে বলেছিল ঐ ঘরে তোমার যা আছে গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী ছাড়তে। শ্যামল অত্যন্ত বিচলিত। আবার ওপরে উঠে গিয়ে নিজের দেওয়া তালাটা প্রথমে খুলে পরে আর একটা নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করতে লক্ষ্য পড়ে শেকলটায় বেশ বড় গোছের ফাঁক। একটু চেষ্টা করতেই ফাঁক দিয়ে তালাটা গলিয়ে দিল। রাত্রে আবার ঘরে বিছানা পাতল। ঘরেও সব বই খাতাপত্র ফটো ছড়ানো ছিল। সে-সব গুছিয়ে একজায়গায় করলো। ময়রার দোকান থেকে চার আনার মুড়ি এনেছিল। তাই খেয়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। রাত্রে বেশ জ্বর দেখা দিল। পাশে শুয়েছিল এক প্রতিবেশী আত্মীয়ের ছেলে। সে ছিল শ্যামলের খুবই প্রিয়। শ্যামলের প্রতি যত অবিচার হতে থাকে সে যেন ততো কাছে আসতে থাকে। ভোররাতে দরজায় ঘনঘন কড়া নাড়ার শব্দ। শ্যামল শুয়ে শুয়েই চিন্তা করে এই সময় কে হতে পারে। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করে—কে কে কড়া নাড়ছে ?

বাইরে গম্ভীর গলায় আওয়াজ—'আমি, দরজা খুলে দে' শ্যামল কিন্তু এসময় কিছুটা নার্ভাস হয়ে যায়। কারণ সে তো জানে না। তার দাদা গত রাত্রে বাড়ী এসে গেছে।

দরজা খুলতেই ঘরে ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল মদন। ঢুকেই কোন কথা বলতে না দিয়ে শ্যামলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্ষিপ্ত হয়ে তার গলা টিপে ধরে। শেষে বেধড়োয়া মারধোর শুরু করে দেয়। শ্যামল ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে। মশারী টেনে ছিঁড়ে ফেলে বালিশ বিছানা সব টানতে টানতে মদনই ঘরের বাইরে বের করে দেয়। তারপর শুরু হয় দেওয়াল থেকে ফটোগুলো টেনে নামানোর পালা। সেগুলো সশব্দে মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হতে থাকল। কোনটা এদেশের জাতীয়তাবাদী নেতার, কোনো ফটোটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী নেতাদের। বইপত্র ঘরে যা ছিল সব টেনে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিতে থাকে আর চীৎকার করতে থাকে—শালার ছেলে। দেশের কাজ হচ্ছে। উনি দেশ সেবা করছেন, রাজনীতি করছেন। শেষ করে দেবো একেবারে। আবার বাড়ী ঘরের ভাগ চাওয়া হচ্ছে। "এসো, তোমায় ভাগ দিচ্ছি।" বলে উন্মত্তের মতো শ্যামলের দিকে একটা মোটা লাঠি নিয়ে যেতে শ্যামল চেঁচিয়ে উঠে বলে—"না, না আমি কখনও তোমার কাছ থেকে কিছু ভাগ চাইনি ; আমায় মেরো না আমার জ্বর। আমি চলে যাচ্ছি বাড়ী

ছেড়ে।" বলে হাঁপাতে থাকে। তারপর একসময় নিচে নেমে চলে যায়। এর মধ্যে এতসব ঘটনায় ভয় পেয়ে রাত্রে যে আত্মীয় ছেলেটি পাশে শুয়েছিল সে কখন দৌড়ে পালিয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে সে মনে মনে শপথ নিল—নতুন করে সে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবেই।

রাস্তা দিয়ে গ্রীষ্মের ভর দুপুরে লোক চলাচল করছে কমই। শ্যামল ট্রেন থেকে নেমে পিচঢালা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল কলেজের মাষ্টারমশাই শ্রীশবাবুর কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে। বড় অসময়ে শ্রীশবাবু তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। রাস্তার ধারে একটা বড় দোতলা বাড়ীর দেওয়ালে একটা বড় ব্যানার পোষ্টার লক্ষ্য করে শ্যামল—জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম সমর্থন করুন।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল শ্যামল। পোষ্টারটা চোখে পড়তেই খানিক দাঁড়িয়ে ভালো করে পড়ে নিল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে দিল। পোষ্টার লেখাটা খুবই সুন্দর হয়েছে। চোখে না পড়ে উপায় নেই। চারদিকে পুলিশের হাঙ্গামা। এর মধ্যে এতবড় ব্যানারকে এই ষ্টেশন বাজারে সেঁটে দিয়ে গেছে। এটা হয়েছে এই দুপুরে। কারণ যাবার সময় তো তার চোখে পড়েনি।

শ্রীশবাবুর কন্যা মাধুরীর সঙ্গে শ্যামলের পরিচয় হয়েছে বেশ কিছুদিন। শ্যামলের সঙ্গে সেতে খুবই সহজভাবে মেশে। মাধুরী কলেজ থেকে ফেরে যখন তখন তার চোখে মুখে কি রকম যেন একটা ভাব। উত্তেজনার ছাপ। মাধুরীর পড়ার ঘর সম্পূর্ণ আলাদা হলেও তার ছোট ভাই দুটোও সম্প্রতি দিদির ঘরেই পড়াশুনা করছে। মাধুরী শ্যামলকে বলে—"শ্যামলদা আজ একটু আমার ঘরে সন্ধ্যার পর আসবেন। কিছু কথা আছে।" সন্ধ্যার পর মাধুরীর ঘরের দরজাটা একটু চাপ দিতেই খুলে গেল। ঘরের মধ্যে তখন জোর পোষ্টার লেখা চলছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটার কাজ শেষ। তিন ভাই বোনে তুলি ধরেছে। দুই ভাই পোষ্টার কিছু আর অ্যারারুট গোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় মাধুরী চুপি চুপি বলে দেয়—'একটা মই উঠোনে পড়ে আছে। সেটা নিয়ে যা যাবার সময়। পোষ্টারগুলো সাঁটবি এমন জায়গায় যাতে সবাইয়ের চট করে লক্ষ্য পড়ে।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মাধুরী শ্যামলকে উদ্দেশ্য করে বলে—"শ্যামলদা নেমে পড়ুন ফিল্ডে। আপনার কতো সুযোগ, যে কোনও পিছটান নেই। নেমে পড়ুন। দেখছেন চারদিকে কি অবস্থা। আজ কলেজে শুনলাম বসিরহাট দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর, নাকি জ্বলছে। চন্দননগর ষ্টেশন এলাকা দাউ দাউ করে

জ্বলছে। কেরোসিনের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। কেরোসিন তেলের জন্য বসিরহাটের কয়েকটি ইস্কুলের ছাত্ররা মিছিল করে এস. ডি. ও.-র কাছে যাচ্ছিল। পথে পুলিশের গুলিতে ইস্কুলের এগারো বছরের একটি ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া, কোন্নগরে শুনলাম গুলি চলেছে। যে ছাত্রটি মারা গেছে তার সঙ্গে ছোট বোনটাও ছিল। সে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে বাড়ী ফিরে গেছে। ঘরে ঘরে হাহাকার। ঘটনা ঘটার কয়েকঘণ্টা বাদে প্রাণহীন দেহটা নিয়ে আসা হয়েছে বাড়ীতে। চারদিকে এতো কাণ্ড আর আপনি বসে বসে বইয়ের পোকা বনে যাচ্ছেন।"

শ্যামলের মুখ চোখে উদ্বিগ্নের স্পষ্ট ছাপ। শ্যামলের পিঠে একটা কিল মেরে মাধুরী বলে—"জানেন শ্যামলদা, মাকে আজ আমি মিথ্যে কথা বলেছি।"

শ্যামল জিজ্ঞেস করে মাকে মিথ্যে কথা বলতে পারলে ? কি রকম মিথ্যে কথা শুনতে পারি কি ?

মাধুরী বলে যাব দরকার হলে মিথ্যে কথা বলতে হবে। মিথ্যে কথা বললেই তো আর পাপ হয় না। আমি মিথ্যে কথা বলছি আমার নিজের কোন ব্যাপারে নয়। দেশের জন্যে হাজার বার মিথ্যে কথা বলতে আমি প্রস্তুত।

—কিন্তু মিথ্যে কথাটা কি তাই আগে শেষ করো। তারপর বক্তৃতা করবে।

—আজ কোর্ট প্রাঙ্গণে ছাত্র ফেডারেশনের জেলা-কমিটির অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী ছিল। সেই প্রোগ্রামে যোগদান করে বাড়ী ফিরছি। এসব জানালে তো বাড়ী থেকে কিছুতেই বের হওয়া যেতো না। কাজেই বন্ধু রীতার বাড়ী পড়াশুনার ব্যাপারে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছিলাম। আজ যে ছুটির দিন। নাহলে তো কোন ঝামেলাই ছিল না।

আমারও এসব ব্যাপারে দরকার হলে মিথ্যা বলতে আপত্তি নেই। কারণ দেশের কাজে, পার্টির কাজে বা যে কোন ভালো কাজের বেলাতেও এই কৌশল নেওয়া অন্যায় নয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা এসব গ্রাহ্যই করতো না। সন্ত্রাসবাদীরা এসব টুকরো ছোট খাটো ব্যাপারেই শুধু নয়। এর থেকেও এমন সব কাজকর্ম চালাতেন যা সমাজের চোখে আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হবে।

—শ্যামলদা, কালকেও চলবে এ'রকম অবস্থান ধর্মঘট। এবার কলেজ গেটের সম্মুখে। যাবেন ? চলুন না। দেখবেন কি রকম ব্যাপার। ১৪৪ ধারা আছে। লাঠি পেটা হতে পারে। পিঠে পড়লে সহ্য করতে পারবেন তো ?

শ্যামলের কোন আপত্তি নেই। সে বললো, ঠিক আছে তাতে কি? আমার পিঠে লাঠি পড়লে সহ্য করতে পারি। সহ্য করবো আর না হয় কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে থাকবো। কিন্তু মেয়েরা তোমরা কি দৌড় দেবে তখন কমরেডদের ফেলে রেখে?

—না না অই হয় নাকি? জানেন মেয়েরাও সংখ্যায় অনেক যারা অবস্থানে যোগ দিয়েছে। আর আপনার পিঠে পড়লে আমি আপনাকে বাঁচাবো। আমরা যে ঘরে বাইরে কমরেড।

পরের দিন অবস্থান ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল শ্যামল। ছাত্র-ছাত্রীর জমায়েত সংখ্যায় প্রায় দু'শ। পুলিশ চারদিকে কর্ডন করে রাখে। উত্তেজনা চরমে ওঠে যখন এস. ডি. ও. সাহেব সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে অবস্থান তুলে নেবার ফতোয়া জারী করেন। এস. ডি. ও. এসেই গর্জন করে উঠলেন,—আপনারা এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যান। ১৪৪ ধারা জারী আছে। পাঁচজনের বেশী একসঙ্গে জটলা করতে পারবেন না। কোন শ্লোগান বা মিছিল বা অবস্থান চলবে না। আমি জেলা শাসকের আদেশ আপনাদের শুনিয়ে দিলাম এবং সতর্ক করে দিলাম। এস. ডি. ও. সাহেবের ঘোষণায় উপস্থিত কাউকেই বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না। বরং ভীড়ের মধ্যে দেখা গেল একজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে শ্লোগান দিতে শুরু করে আর মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠতে থাকে। "কেরোসিনের অভাব হল কেন জবাব চাই, জবাব দাও খাদ্যের বদলে গুলী চালানোর আদেশ দিল কে। প্রফুল্ল সেন আবার কে? দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সরকারের পদত্যাগ চাই।" "লাঠি, গুলী, ১৪৪ ধারা গণসংগ্রাম স্তব্ধ করতে পারবে না।" "শহীদ নুরুল-আনন্দ তোমাদের জানাই লাল সেলাম।" শ্লোগানের পর শ্লোগান চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুললো। এস. ডি. ও. পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্যে আবার এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন "এই সমাবেশ সম্পূর্ণ বেআইনী। আমার ঘোষণা এবং আদেশ দানের পরও যদি স্থানত্যাগ করতে কেউ না চান, তবে বলপ্রয়োগের রাস্তায় আমাকেও বাধ্য হয়ে নামতে হবে।" কিন্তু উত্তেজনা তখন চরমে। শ্লোগানের আওয়াজে এস. ডি. ও.-র কথা কেউ শুনতে পেল, কেউবা পেল না। সবাই কিন্তু শ্লোগান ঠিক দিয়ে যাচ্ছে। এস. ডি. ও.-কে যেন ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না। মাধুরী সেই একভাবে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে।

এস. ডি. ও.-র মর্যাদা বোধে সমগ্র ব্যাপারটি আঘাত করলো। শেষপর্যন্ত তিনি শেষবারের মতো আবার একবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। সশস্ত্র

পুলিশবাহিনী মাথায় হেলমেট আর ঢাল নিয়ে 'এ্যাটেনশান পজিশনে' দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল আবস্থানকারীরা কেউ আর বসে বা দাঁড়িয়ে নেই। সবাই শুয়ে পড়েছে। প্রথমে এস. ডি. ও. কিছুটা হতচকিত হলেও পুলিশকে সামলে নিয়ে নিজেই আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর গুরু-গম্ভীর স্বরে বলতে থাকলেন আপনারা এরকম কৌশল করলেও রেহাই পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, কোন হিংসাত্মক মারদাঙ্গার ঘটনা কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে হবে। আপনাদের আমি গ্রেপ্তার করবো। "বলেই উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের নির্দেশ দিলেন এদের এ্যারেষ্ট করে কোর্টে চালান দিন।" এরপর যা যা ঘটলো তা মোটামুটি নিয়মমাফিক। পুলিশ আচরণ অনুযায়ী, পুলিশের অশ্লীল গালিগালাজ, বাপ-বাপান্ত করা ছোটখাটো লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার, ভ্যানে পুরে চালান দেওয়া। কিছুক্ষণ বাদেই সমগ্র প্রাঙ্গণ ফাকা হয়ে গেল। কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে প্রিন্সিপ্যাল বাড়ী চলে গেছেন।

'আসামী'দের কোর্টে তুললে ম্যানিষ্ট্রেট কোর্ট ইনসপেকটারের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করে মন্তব্য করলেন···আরে, আপনারা কি আরম্ভ করলেন? আমাকে কি কোন কাজ করতে দেবেন না। এত ধরে এনেছেন? কোর্ট ইনস্পেকটার দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে বললেন—স্যার, এরা সব কলেজে পড়ে। ১৪৪ ধারা ছিল কলেজের সামনে। এরা সেসব না মেনে অবস্থান ধর্মঘট করছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছিল। এসবের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হক।

ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলেন—আর কত আসবে এরকম বলতে পারেন? রোজই তো দেখছি একশ, দেড়শ ধরে আনছেন, আর সবাই কলেজে স্কুলে পড়াশুনা করে। এরা কী চায়।

আসামীর জন্য নির্দিষ্ট তারের জালি দিয়ে ঘরে কাঠগড়া থেকে জনৈক ছাত্রের আবেদন শোনা যায়—"স্যার, আমরা সস্তা দরে কেরোসিন চাই। কেরোসিন তেল কিছুদিন হলো বাজার থেকে উধাও। আমাদের পড়াশুনা বন্ধ। আমরা সরকারের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছি, ইস্কুল-কলেজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সস্তায় কেরোসিন তেল সরবরাহ করা হক। কিন্তু সরকার সে ব্যবস্থা না করে গুলিভর্তি রাইফেল তুলেছে। আমরা এরও বিচার চাই।" ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী উকিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন—গভর্ণমেণ্টকে বলুন না। এরা তো অসম্ভব দাবী কিছু করেনি।

সরকারী উকিল দাড়িয়ে নিবেদন করলেন—দাবীটা অসম্ভব। কেরোসিন

তেল নিয়ে তো বড় বড় ব্যবসাদাররা ব্যবসা করছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণে কতটুকু।

—সরকার তো এরকম একটা ইস্যুতে তাই বলে হাত পা গুটিয়ে দর্শকের ভূমিকা নিলে চলবে না। আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বুঝি পড়শুনা করে না?

—হ্যাঁ, স্যার। ইস্কুলে কলেজে দুজায়গাতেই ভর্তি আছে। স্যার, দুঃখের কথা বলবো কি স্যার, এক ছেলে, এক মেয়ে তারাও আজ ঐ ঘটনায় জড়িত। আসামীর কাঠগড়ায়।

ম্যাজিস্ট্রেট হাতের কলমটা রেখে একটু অবাক হয়ে বললেন। বলেন কি, আপনার ছেলেমেয়েরাও—

—হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু করবো কি বলুন। আইনের শাসন। অপরাধ করলে উঠতেই হবে কাঠগড়ায়। সমস্ত আদালত কক্ষ নিশ্চুপ। একটা পিন পড়লেও শব্দ হবে খানিকক্ষণ এমন অবস্থা।

এরপর ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই টেবিলের ওপর পেশকারের এগিয়ে দেওয়া ফাইলে কিসব নোট দিলেন। তারপর শান্তভাবে ঘোষণা করলেন, "আপনারা আজ ১৪৪ ধারা না মেনে যে অপরাধ করেছেন সেজন্যে আপনাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। তবে যেহেতু আপনাদের দাবী ছিল পড়াশুনার জন্য কেরোসিন সরবরাহ তাই আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কেশ রুজু করছি না। তবে আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদালতে আপনাদের আটক থাকতে হবে।" এই ঘোষণাটুকু করেই ম্যাজিস্ট্রেট উঠে নিজের চেম্বারে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় কোর্টের কাজ শেষ হলে সবাই মুক্তি পেল। মাধুরী, শ্যামল ছাড়া পেয়ে আবার সকলের সঙ্গে সরকার বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে কোর্ট বারান্দা ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়লো।

রাত্রে খাবারের টেবিলের চারপাশে সপরিবারে সবাই হাজির। শ্রীশবাবুও খাচ্ছেন। কিন্তু সবাই চুপচাপ। শ্রীশবাবুও খাওয়া-দাওয়া সেরে হাত মুখ ধুয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর গম্ভীর-ভাবে ডাকলেন মাধুরী।

মাধুরী কিছুটা ভয় পেয়েছে। আজকে নাহক বাবার কাছ হতে কত কথা শুনতে হবে। মাধুরী কাছে এলে দাঁড়াতে বললেন—"তুমি আজ কাল কি পড়াশুনা ত্যাগ করেছো? তোমার সামনে না পরীক্ষা?"

মাধুরী বাবার আরও একটু কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। মাথার পাকা চুলে হাতের

মাঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে নানা উপায়ে মোচড় দিতে থাকে। ধীরে ধীরে উত্তর দেয় না বাবা, আমি তো পড়াশুনায় ফাঁকি দিচ্ছি না।

শ্রীশবাবু সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'হ্যাঁ মা কখনও পড়শুনায় ফাঁকি দিস না। আমি জানি তুই কোথায় যাস। আর কি করিস। আজ তো কোর্টে চালান দিয়েছিল তোদের দলবলকে।" মাধুরী একটু ঘাবড়ে যায়। বাবা তাহলে জেনে গেছে! একটু আশ্চর্য হয় বৈকি? মাধুরীর নীরবতা দেখে শ্রীশবাবুই বলেন—"তুই ভাবছিস কি, যাই করিস এটা জেনে রাখবি, কোন দেশে বিপ্লবীরা পড়াশুনার সুযোগ পেয়েও ফাঁকি দেয় না। মূর্খেরা বিপ্লব করবে নাকি রে।" মাধুরী একটা টুলের ওপর বসে পড়ে। শ্রীশবাবু জিজ্ঞেস করে কিরে বসে পড়লি যে, উত্তর দে?

মাধুরী ঘাড় নেড়ে নীচু স্বরে বলে—"বাবা আপনার কথা আমি কখনও অমান্য করিনি। আপনি তো আমাকে কখনও আন্দোলনে নামতে নিষেধ করেননি। দেখবেন আমি ঠিক পরীক্ষায় পাশ করবো।"

শ্রীশবাবু ঘাড়টা নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে বললেন—"এইতো আমি চাই। আমি জানি তো তোমার আত্মবিশ্বাস আছে। যাও, এবার পড়ার ঘরে চলে যাও।"

মাধুরী পড়ার ঘরে এসে দেখে শ্যামল হাতে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে খুব মন দিয়ে ঘরের একখানা চেয়ার দখল করে পড়ছে। মাধুরী এসে একটান মেরে কাগজটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে শ্যামলের মুখোমুখি আর একখানা চেয়ারে বসে পড়ে। মাধুরী বলে—"শ্যামলদা, আপনি তো খবরের কাগজের পোকা একমনে কাগজ পড়তে কতক্ষণ যায়। আর ঐ কাগজটায় আছেই বা কি?"

শ্যামল বললো—"কাগজের সম্পাদকীয়টা পড়ছিলাম। তুমি তাও পড়তে দিলে না।"

মাধুরী উত্তর করে—"ধ্যেত, ঐ সম্পাদকমশাই তো ভাঁড়াটে। ওঁর সম্পাদকীয় মতামত কখনও ছাঁচে ঢালা নয়।"

—কিন্তু গোটা রাজ্য জুড়ে এই যে চরম অরাজকতা তার খবরের সংখ্যা এই কাগজটাতেই বেশী। সম্পাদকীয়ও বেশ আগুন।

—ধুর, ভীষণ সুবিধাবাদী উনি। কাগজটা ভালো করে স্টাডি করে দেখবেন কি রকম গোঁজামিলে ভর্তি।

—কিন্তু সাধারণ পাঠকদের হাতে হাতে তো এই কাগজটাই বেশী দেখি।

—তা হবে না কেন। লোকে এখন দেশের রাজার ওপর বীতশ্রদ্ধ। উনি সেই বীতশ্রদ্ধাকে পুঁজি করে কলম ধরেছেন। এরপর এসব ঘটনা মিটে গেলে একদিন দেখবেন ওর মতটা কি দাঁড়ায়। আমাদের ক'জন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক অত্যাচারিতের পক্ষে কলম ধরে বলতে পারেন? প্রথম প্রথম অনেকে সাধারণ মানুষের কথা ও কাহিনী নিয়ে চর্চা শুরু করে। তারপর নাম হলেই আদর্শের সঙ্গে টানা পোড়েনে আপনার, সিদ্ধ-কানুর কথা ভুলে যায়। এইতো সাহিত্যের, সাংবাদিক জগতের চেহারা। আগামী পরশু কলেজ ক্যান্টিন হলে ত্রিদিবেশ বসুর সাম্প্রতিক প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসের ওপর আলোচনা হবে।

—কারা সেই আলোচনার উদ্যোক্তা?

—আমরাই। মানে ইউনিয়ন।

—শোনো সেই আলোচনায় যে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসুক না কেন দুটো একটা সভা করে এর সুরাহা হবে না। গভীরে ঢুকতে হবে। আমি ঐ ভদ্রলোককে ভালো করেই জানি। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। সেই সুযোগে কিছু আলোচনাও চালাতাম। উনি 'অস্তিত্ববাদ' ইংরাজীতে যাকে বলে 'এগ্রিসটেনশিয়ালিশম্'-এর প্রচারক। উনি 'অস্তিত্ববাদে'র নামে সুড়সুড়ি দিয়ে যৌনতা প্রচার করেন।

—আপনার সঙ্গে আলাপ এখন নেই?

—পরিচয় তো আছে। যাই না ঘন ঘন এই যা।

—তাহলে একদিন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসুন না। সত্যি খুব ভালো হয় শ্যামলদা, একদিন সঙ্গে করে আনুন।

—দেখবো বলে। যদি আসতে চান। তবে—

—তবে কি?

—তবে বেশী মাতামাতি করা ঠিক নয় ঐসব সাহিত্যিককে নিয়ে।

—কিন্তু একসময় তো উনি 'সাধারণ মানুষে'র চটকলের শ্রমিকদের জীবন নিয়ে উপন্যাসের ওপর উপন্যাস লিখে গেছেন।

—আজকাল পর্ণোগ্রাফী বিশারদ হয়ে উঠেছেন। আর তা হতেই বাজার মাত করছেন।

—আনবো তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের বাড়ী। এটা কিন্তু নেহাত সৌজন্যের ব্যাপার।

ত্রিদিবেশবাবু শ্যামলের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। এসেছিলেন মাধুরীদের

বাড়ী। আলাপ হয়েছিল আট বছর জেল খাটা বরিশালের পুরানো বিপ্লবী শ্রীশবাবুর সঙ্গে। ত্রিদিবেশবাবু খুব হালকা মেজাজের মানুষ। চুটিয়ে হাসি গল্প করেছেন। চা পান করেছেন সবার সঙ্গে। মুখে এখনও শাসনক্ষমতায় আসীন প্রভুদের বিরুদ্ধে কথাবার্তাও বললেন। তারপর শ্যামলের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তার ভগ্নজীর্ণ বসতবাটী, পাঠগৃহ। ত্রিদিবেশবাবু শ্যামলের গ্রামে যাবার পথে নেমে পড়লেন। মুরগীর মাংসসহ পানাহার করতে। শ্যামলের ভয় হচ্ছিল রিক্সায় চেপে। উল্টে পড়ে যাবে নাতো। চোখ দুটো লাল হয়েছে। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির ছিলেন। গ্রামের গ্রন্থাগার দেখলেন, সম্বর্ধনা পেলেন, মহিলার হাতের মালা গলায় পরলেন।

এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে মাধবী কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের কাজে ফাঁক নেই। হাতে একদিন একটা সাময়িকী নিয়ে বাড়ী ঢুকল। শ্যামল তার হাত থেকে নিয়ে বলে—"দাওনা দেখি, সারা রাস্তাটা তো পড়তে পড়তে এলে।"

মাধবী বলল—"শ্যামলদা, এই পত্রিকাটা ত্রিদিবেশবাবুর 'উর্বর' উপন্যাসের সমালোচনা করেছে। পড়ে দেখুন। সত্যি 'উর্বর' বইটা যাচ্ছেতাই।" শ্যামল এ সম্পর্কে একদিন চিঠি লিখল ত্রিদিবেশবাবুকে আর সেই খামের মধ্যে কয়েকটি পত্রিকায় 'উর্বর' উপন্যাস সম্পর্কে প্রকাশিত সমালোচনার 'কাটিং' পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিনের মধ্যে উত্তর পাওয়া গেল। তাতে তিনি লিখেছেন—"শ্যামল, তোমার 'উর্বর' নিয়ে বিব্রত হওয়া দেখলুম। তুমি যাদের কথা বলেছো (আর যাদের সঙ্গে আমি মনে মনে ঘর করি) সেই মার্কসবাদীদের কথা আর বলো না। এরা না হবে সতী আর না হবে অসতী, তবু স্বামীর ঘর তো করবে না। যদি—"

এই চিঠি পড়ে কারুর বুঝতে বাকী থাকে না এককালের চটকলের শ্রমিকদের মতো দিন-যাপন করে গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন যে মরমী সাহিত্যিক আজ তিনি আর বেঁচে নেই। সে ত্রিদিবেশ বসু মৃত। এ চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি তাঁর প্রেতাত্মা। মাধবী চিঠিটা পড়ে মন্তব্য করে সত্যি, এরাই আবার 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র জন্য বড় বড় কথা উচ্চারণ করে। আপনিও তো ত্রিদিবেশবাবুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

—একজনের সম্বন্ধে ধারনা স্পষ্ট হতে সময় লাগে।

—শ্যামলদা, আমরা কলেজে ক্যান্টিন হলে শীগগীরই একটা বিতর্ক সভার আয়োজন করছি। এতে সবায়েরই যোগদানের সুযোগ আছে।

—বিষয়টা কি?

—বিষয়টা হচ্ছে—"শিল্পীর স্বাধীনতা—সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে।"

—বাঃ চয়েস বা নাম সিলেকশন ভালোই। পক্ষে এবং বিপক্ষে নাম বেশ আসবে তো?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তাছাড়া বিতর্কে যে প্রথম তিনজন সুন্দর পুরস্কার পাবে।

—কি পুরস্কার। বই?

—হ্যাঁ প্রথম পুরস্কার 'ধীরে বহে ডন' আর 'সাগরে মিলায় ডন' একসঙ্গে।

—দ্বিতীয় আর তৃতীয়।

—দ্বিতীয় পুরকার 'প্যারীর পতন', তৃতীয় পুরস্কার 'সোমেনচন্দের গল্প সংগ্রহ।'

—বাবাঃ—এত আকর্ষণীয় বইপত্তর। দেখবো নাম দেবো। যদি একটা মিলে যায়।

মাধুরীকে কদিন খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কলেজ যাচ্ছে, বাড়ী আসতে রাত হয়ে যাচ্ছে, রোজই বাড়ীতে চাপা গুঞ্জন। ও এতে, রাত করবে কেন? যা করবে দিনের আলোয় করবে না কেন?

মুস্কিল হচ্ছে মিটিং কখনও বাঁধা ধরা সময় ধরে হয় না। আন্দোলনও ছকে বাঁধা রাস্তায় চলে না। এসব মাধুরী কি করে বোঝায় বাবা মাকে। শ্যামলকে একদিন অনুরোধ করে—শ্যামলদা, আপনি আমাদের বাড়ী থেকেই যান একেবারে। আপনার সামনেই বাবা আমায় তো আর বিশেষ কিছু বলতে পারবে না।

—বাঃ আমাকে শিখণ্ডী খাড়া করবে নাকি, না আমি পুতুল।

হাসতে হাসতে মাধুরী বললে—পুতুল খেলা দেখেছেন কোনদিন। নিশ্চয়ই আমি দেখেছি। বাবা বকবে আর আমি সামনে দাড়াবো। ওসব চলবে না। বকুনি খেলে আমরা দুজনেই খাবো ভাগাভাগি করে।

—সেই ভালো। সামনে আমাদের আন্দোলনের প্রোগ্রাম আছে।

—কর্মসূচী বা দাবী দাওয়ার লক আউট করা হয়েছে।

নিশ্চয়ই, আমরা কলেজে ইউনিয়ন গড়ার অধিকার চাই। কলেজে একটা নামকাওয়াস্তে ইউনিয়ন আছে, যার কর্মকর্তারা সবাই প্রিন্সিপ্যালের মনোনীত। আমরা এই মনোনীত ব্যবস্থার অবসান চাই। আমরা নির্বাচন চাই।

কিন্তু দাবীগুলোকে জনপ্রিয় করার কি ব্যবস্থা করেছো? দাবী না মানলে আন্দোলনের রূপ কি হবে?

—দাবী নিয়ে আমরা প্রচারের সমস্ত রকম পদ্ধতিই নিয়েছি। না মানলে লাগাতর ছাত্রধর্মঘট। শুনুন না শ্যামলদা, আমরা কলেজে একটা সভা করছি।

চলুন না আপনিও। এই কলেজের একসময়ের প্রাক্তন ছাত্র আপনি। কিছু বলবেন সবাইয়ের কাছে।

পরের দিন কলেজের মাঠে ছাত্রদের সভা হচ্ছিল। ষ্টিক ব্যানার হাতে কয়েকজন ছাত্র সভার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে নানাধরনের স্পষ্ট আর মোটা হাতের লেখায় দাবীর উল্লেখ আছে। যত ছাত্র প্রায় সমসংখ্যায় ছাত্রীও জমায়েত। একটি কুড়ি বছরের ছিপছিপে রোগা যুবক বক্তৃতা করছে—সবার আগে চাই আমাদের একতা। একতা হবে চোখের মনি। প্রিন্সিপ্যাল আর সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করবো বারবার। আলোচনার মাধ্যমেই আমাদের এগোতে হবে। যদি আলোচনাব মধ্যে দিয়ে দাবী আদায় না হয় তবে ধর্মঘটের পথে পা বাড়ানো ছাড়া আমাদের আর উপায় কী?

এরপরই আর একজন ছাত্র নাম তার বুঝি অমিত উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতির অনুমতি নিয়ে বলতে শুরু করল সভাপতি মশাই। আপনার অনুমতি নিয়ে দুএকটা কথা মাত্র বলতে চাই। আমাদের কলেজের সেক্রেটারী মশাই ফণীন্দ্রবাবু এই এলাকার মস্তবড় জমিদার তাঁর দাদাকে গাঁয়ের সবাই 'রাজাবাবু' বলে ডাকে। ধর্মঘট শুরু হলে জমিদারের পক্ষে গ্রামের লোক এগিয়ে আসবে না তো? কারণ জমিদারের লেঠেলরা গাঁয়েরই চাষী ঘরের মানুষ। লেঠেলরা বড় ভয়ঙ্কর। জমিদারের ভাড়া খাটে।

অমিত বলে চলে—জমিদারেরা এইভাবেই চিরকাল নিজেদের পক্ষে গরীব চাষী-ভূষি মানুষগুলোকে লাগিয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে প্রফুল্লবাবুর পুলিশ। সবদিক চিন্তা করে আন্দোলন শুরু করা উচিত।

অমিতের কথা শেষ হলে আর একজন উঠে দাঁড়ায়। সে বলতে থাকে আমার নাম বিমান। আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। আমার কথা হচ্ছে লড়ায়ের ময়দানে নামার আগে রণকৌশল যেন আমাদের রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে। আমরা কলেজে নতুন করে নির্বাচন চাইছি। লড়াইটা হবে গ্রামের জমিদারদের সঙ্গে। কারণ তারাই কলেজ চালাচ্ছে। আমাদের আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য ওরা কি কৌশল নেয় সেটাও দেখতে হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো গাঁয়েও চলে যেতে পারে। গাঁয়ের গরীবদের সঙ্গে মিশতে পারে। আমরা তাদের আমাদের দাবীর কথা, আমাদের আন্দোলন শুরুর কথা জানিয়ে আসি। তাহলে আমার মনে হয় ওদের আর আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। ওরাও বুঝবে ওদের শত্রু ঐ জমিদার ফণীন্দ্র চৌধুরীরা।

এতকাল 'রাজাবাবু' বলে সেলাম ঠুকে এসেছে। এরপর আর ওরা সে পথে নাও হাঁটতে পারে।

সভার সিদ্ধান্ত এই হল যে, সংবিধান স্বীকৃতির দাবীতে মিছিল বের করা হবে। অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারীর কাছে ডেপুটেশন করা যাবে। তারপর ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হবে।

কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই চিন্তায় হোস্টেল থেকে আবাসিকরা অনেকে চলে যেতে চায়। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ওদের হোস্টেল ত্যাগ না করতে অনুরোধ করে।

এরপর দোতলা ওঠার মুখে কোলাপসিবল গেটে কর্তৃপক্ষের দেওয়া তালার সঙ্গে ছাত্ররা একটা মস্তবড় তালা জোগাড় করে এনে ঝুলিয়ে দিল।

কলেজের একজন কেরাণী ঘটনাটা একটু দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিল। সন্ধ্যার মুখে ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান তুলে নিয়ে চলে গেলে সে একবার তালাদুটো হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভালো করে মনে হল যেন পরীক্ষা করে গেল।

পরের দিন বেলা দশটা বাজতে না বাজতে আপ ও ডাউন দুটি ট্রেন থেকেই প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীরা নেমে ষ্টেশনের কাছেই ফাঁকা জায়গায় জমায়েত হয়ে একটা সভার আয়োজন করে। জেলা ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা হাজির। তাঁরা বক্তৃতা করবেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শ'পাঁচেক ছাত্র-ছাত্রী—সাধারণ মানুষের ভীড়ে সভাস্থল যেন উপচে পড়ছে। গরম গরম বক্তৃতাও হল। তারপর শুরু হল মিছিল। উচ্চকণ্ঠ নিনাদিত আওয়াজে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তালে তালে পা ফেলে ওরা এগিয়ে চলল কলেজের দিকে। ওরা বুঝি আজ অন্যায় অবিচারের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে চায়।

কলেজের অধ্যক্ষ মশাই আসছিলেন একটা রিক্সা চেপে। তিনি মিছিলের সামনে পড়েননি। মিছিল তৎক্ষণ গ্রামের জমিদার বাড়ীর দিকে চলে গেছে। কিন্তু তাঁকে সময় মতো পেল কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী তাঁর রিক্সা ঘিরে ধরে বলল—স্যার, আমাদের একটা স্মারকলিপি আছে আপনাকে দিতে চাই। অধ্যক্ষ মশাই একটু ভয় পেলেন—রিক্সা দাঁড় করাতে চান না। একটা গরম হাওয়া যেন তাঁর সারা শরীর পুড়িয়ে দিয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"এতো দাবীপত্র আমি এসব দাবী মানতে পারবো না সে কথা তো আগেই বলে দিয়েছিলাম।"

—তা হতে পারে না স্যার। এ দাবীপত্র আপনাকে বিবেচনা করতেই হবে। এটা ছাত্রদের সাধারণ দাবী। আপনি এটা উপেক্ষা করতে পারেন না।

ইতিমধ্যে বেশকিছু ছাত্রীও রিক্সার চারপাশে জড়ো হয়েছে। যে অধ্যক্ষ মশাই মেয়েদের দেখলেই শতযোজন দূর দিয়ে হাঁটেন তাঁরই চারপাশেই তাজা তরুণীরা। অবস্থা তাঁর বড়ই সঙ্গীণ। অধ্যক্ষমশাই দেখলেন কোন উপায় নেই। স্মারকলিপি তিনি গ্রহণ করে নোট দিলেন। আমি দাবীপত্র মেনে নিলাম কিন্তু অধ্যক্ষের পদও ত্যাগ করলাম। নিচে সই করে কাগজটা ছাত্রদের দিকে এগিয়ে দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে হাঁক দিলেন চ, তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে চ। মুখ চোখের অবস্থা তখন টকটকে লাল। গায়ের রঙ এমনিতেই দুধে আলতার রঙ। তারপর আবার এই ঘটনা।

ছাত্র-ছাত্রীরা যেন একটা ভয়ানক অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছে। বিজয়ীর মনোভাবে ওরা উদ্বেল। কলেজের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদক ছাত্রদের সঙ্গে আচরণে সমমনো ভাবাপন্ন—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। নীল রক্ত গায়ে যে শ্রেণীর মানুষ-গুলোর তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এক পাও এগোতে ভয় পায়। ওরা জনগণ থেকেই বিচ্ছিন্ন। সম্পাদক মশাই তাঁর বাড়ীতে পুলিশ পাহারা বসিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন জমিদারের বাড়ীর ত্রিসীমানায় যেন কোন মিছিল ঢুকতে না পারে। সেদিন মিছিল ঘুরে এল ফের কলেজের দিকে।

আবার কয়েকদিন পরেই মিছিল। এবারও শুরু হল ষ্টেশন থেকে। এদিনের সংখ্যাটা বোধহয় আরও বেড়ে গেছে। শ্যামল মিছিলের সামনে চলে গেছে। বদ্ধ হাত ওপরে তুলে বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান উঠেছে "জমিদার তন্ত্র নিপাত যাক।" ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল চললো আবার জমিদার বাড়ীর দিকে। জেলা নেতারাও মিছিলে সামিল। তাদের কণ্ঠে আরও উগ্র ধ্বনি, শিহরণ জাগানো। আকাশ-বাতাস কাঁপানো চমৎকার রোমাঞ্চকর ধ্বনি। রাস্তার পাশে পাশে কিছু দূরে দূরে পটকা ফাটার কর্ণ বিদারী আওয়াজ। মিছিল চলেছে জঙ্গী পদক্ষেপে। ওদের চিন্তায় পেটি বুর্জোয়া উগ্রতা। বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী জমিদারের বিশাল লাল প্রাসাদ পাহারারত। শ্লোগান আর গোলমালের আওয়াজ শুনে রাইফেলে গুলী ভরে পজিশন নিয়ে নিল। এদিকে ছাত্রমিছিল এগিয়ে এসে প্রথমেই জোর করে গ্যারেজ থেকে বারকরল জমিদারের জীপটা। জড়পদার্থ জীপটাকে একেবারে রাস্তায় টেনে এনে কাত করে ফেলল। শ্যামল চেষ্টা করেছিল যাতে জীপটায় কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওরা জীপে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরাল। তারপর দুহাত তুলে উল্লাস। আকাশ বিদীর্ণ করা

উল্লাস ধ্বনি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সভ্যতা ও বিজ্ঞানের দাম। ওটাই-বুঝি আসল শত্রু। জমিদারের স্পর্শ যাতেই আছে তাই বুঝি শত্রু। শ্যামলের ভাবনা এল—জীপটাতো কারুর শত্রু হতে পারে না। এতো সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক। শোষণের প্রতীক নয়।

কেন এমন ঘটলো? সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত কিছু নেতার হাতে আন্দোলনের রশ্মি কি সত্যি তাহলে চলে গেছলো। সেইসব একগুঁয়ে, হঠকারী নেতা, যারা নিজেদের সংগঠনের সম্মেলনকে পর্যন্ত বানচাল করে দিতে গেছলো. যারা কথায় বার্তায় শুধু বিপ্লবের কথা বলে। শ্রেণী সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে যারা শোষণবাদী কায়দায় ব্যাখ্যা করে?.-এদের হাতে চলে গেছলো এতবড় আন্দোলনের নেতৃত্ব। শ্যামল চীৎকার করে কয়েকজনের নাম ধরে ডাক দিল। ওরা কেউ শুনল, কেউ শুনল না। "একি করছ তোমরা গোপী, বিমল, অমিত? জীপটাকে পোড়াচ্ছ কেন? ওটা কি অপরাধ করল। জমিদার আমাদের শত্রু, জীপটায় জমিদার চড়ে"—শ্যামলের কথাগুলো চীৎকারের মধ্যে কেউ গ্রাহ্য করল না। ইতিমধ্যে শসস্ত্র পুলিশদল 'পজিশন' নিয়ে নিয়েছে। রাইফেল তাক করে কয়েকপা এগিয়েও এসে গেছে। এসব দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল নিজেদের মধ্যেই। অনেকেই এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হবার মানসিকতা ছিল না। তারাই বেশীর ভাগ অসংগঠিতভাবে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

আরও বহিষ্কারের পালা চললো? হঠকারীতার দায়ে গোপী, রমা, বীরেন সংগঠন থেকে পরের পরে বহিষ্কৃত হলো।

রেল ষ্টেশনের দেওয়ালে, হোষ্টেল ও কলেজের দেওয়ালে চমক লাগানো দেওয়াল লিখন দেখা গেল। ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে কে বা কারা আলকাতরা বুলিয়ে গেছে—বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট শুয়োরের খোয়াড়। "বিপ্লব ভোজসভা নয়, এরই মধ্যে আবার ঘটলো বিস্ফোরণ। জোর সংঘর্ষ হয়ে গেল ছাত্র জমিদারের লেঠেল ও কিছু দালালের সঙ্গে। জোর গুজব রটে গেল। গোপীর নাকি ইটের ঘায়ে মাথা ফেটে গেছে। কে আবার বলে গেল তাকে নাকি পাওয়াই যাচ্ছে না। ব্যস্ রেল লাইনে বসে গেল একদল ছাত্র-ছাত্রী। ট্রেন যেতে দেওয়া হবে না। রাজ্যের কোন মন্ত্রীকে চাই। তাদের দাবী কলেজ গর্ভনিংবডির সম্পাদককে গ্রেপ্তার করতে হবে। লাইনের উপর ছাউনী পড়ল। প্রখ্যাত গণসঙ্গীতশিল্পী ছুটে এসেছেন ছাত্রসংগ্রামের খবর শুনে। লাইনের ধারে বসেই শুরু করে দিলেন বিপ্লবের গান। তরাইয়ের কৃষকের গান। কোন নেতার

কথা শুনতে ওরা রাজী নয়। নেতাদের নামে চললো সমানে গালি-গালাজ।

ওদিকে একই সঙ্গে দেশের প্রধান রাজপথে যানবাহন আটক করা শুরু হয়ে গেছে। খবর এসেছে লরী, বাস, মোটরে ইতিমধ্যেই চার পাঁচ মাইল প্রায় জ্যাম। শ্যামল ছুটেছিল অগ্রগামী অংশের নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে— "এ কি হঠকারীতা হচ্ছে। জাতীয় সড়ক বন্ধ হলে সাজ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে যাবে।" অবরোধকারীরা বললো—আমরা জমিদার কাম কলেজ সেক্রেটারীর গ্রেপ্তার চাই আপনারা আমাদের সমর্থন করুন। শ্যামলেরা এ দাবী সমর্থন করলো। কিন্তু রেলপথ ও জাতীয় সড়ক উন্মুক্ত করতে হবে।

তখন রাত তিনটে। ইতিমধ্যে খবর এসেছে কলেজ সেক্রেটারীকে পুলিশ নাকি গ্রেপ্তার করেছে। সবার সামনে দিয়ে ভ্যানে ভর্তি পুলিশ পাহারা দিয়ে একটা জীপ লেভেল ক্রশিং পার হলো। উৎসুক ছাত্রজনতার কেউ কেউ আঙ্গুল তুলে কাছের সাথীকে দেখিয়ে দেয়, ঐ ঐ সেক্রেটারী। হ্যাঁ, ঠিকই জীপের মধ্যে একজন মনে হল মাথা নীচু করে বসে আছে। তা হতে পারে। পরে জানা গেল—লোক দেখানো গ্রেপ্তার। তাঁকে জামাই আদরে কলকাতার বাসায় পুলিশ পৌছে দিয়ে এসেছে।

দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র দ্রুত পাল্টাচ্ছে। নতুন জমানার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। এ রাজ্যে নতুন এক জনপ্রিয় সরকার কায়েম হয়েছে। বরকত গেণী, শ্যাম, অটল, বাবুলাল এদের চোখে মুখের চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে নতুন প্রাণে সঞ্চার। ভাবালুতা নয়। কঠিন ও তিক্ত বাস্তবের ওরা আজ মুখোমুখি। জমিদার আর ভাগচাষীদের মধ্যে লড়াই। নিজ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই জান-মানের লড়াই। এরা জমিদার শৈলেন চৌধুরীর বিশাল জোতের সব ভাগ-চাষী। সকালবেলায় বাইশজন বর্গাদার জমিদার শৈলেন চৌধুরীর বিশাল জোতে লাইন দিয়ে নেমে পড়েছে। হাতে ওদের লাল নিশান। মুখে পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের জয়ধ্বনি। গত তিন বছরে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ভাগচাষী এরা। নামেই ওরা চাষী। জমিদারের খামারে ধানের গাড়ী ঢোকে, পালুই ওঠে ঝাড়াই মাড়াইয়ের শেষে ভাগচাষীরা শেষ পর্যন্ত কুলো আর মুড়ো ঝাঁটা, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দাদন দিয়ে কঙ্কালসার দেহগুলো উপকরণ করে জমিদারেরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। শৈলেন চৌধুরী প্রতি বছরই ঘর করার নাম করে জমি ছাড়িয়ে নিতে থাকে। ভোর হতেই ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর ঘরে চলে যাবে তারপর সেখানে ঘটাখানেক শঙ্খ বাজিয়ে গান করবে। গানের আওয়াজ বহুদূর থেকেও

শোনা যায়, এর মধ্যে ভাগচাষী বরকত ঘাড়ে আধ ময়লা গামছা ফেলে মালকোঁচা মেরে সদরে এসে বসে আছে। বরকত কানা ঘুষো শুনেছে যে, শৈলেনবাবু নাকি ওর সাতবিঘা আমন জমি 'ঘরে করবে' বলে ছা ড়ুয়ে নেবে। শুনেই সে ছুটে এসেছে ঘটনাটা সত্যি কি না। অনেক বসে থাকার পর শৈলেনবাবু বেরিয়ে এলেন পূজার ঘর থেকে। সামনে বরকতকে দেখে চোখে মুখে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট ভাব ফুটে উঠল। বরকত হাঁ করে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—বাবু, কথাটা কি তাহলে ?

শৈলেনবাবু উত্তর দিল—তা সত্যি হলেও তো বাবা তোমার করার কিছু নেই ? বরকত অবাক বিস্ময়ে খানিক তাকিয়ে থাকে। শৈলেনবাবুর একটু তাড়াতাড়ি। সে বলল—কি বলতে চাস্ বল না। ভাগের ব্যাপার তো ? —হ্যাঁ তাই। কিন্তু বাবু, আমি ছাপোষা মানুষ। জানেন তো আপনি সব। এক টুকরো জমি নেই। আমার সংসারটা চলবে কি করে ?—তার আর আমি কি করবো ? আমি তো তোকে জমিটা একেবারে মালিক করে দিইনি। দরকার হলে ছাড়াতে পারবো না। তা তো নয় জমিটা তো আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। আমার খুশী আমি 'জোতদারে' রাখবো না। 'জমি আমি ঘর করবো'। কথাগুলো সাফ সাফ শুনিয়ে দিয়ে শৈলেনবাবু সদর দরজায় খিল দিয়ে আবার ঢুকে পড়লেন। এইভাবে গরীব ভাগচাষীদের নানান কৌশলে শৈলেন চৌধুরী উচ্ছেদ করে দিয়েছে। কোন আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করেনি। আজ জমিদারদের অন্যতম শিরোমণি। 'ভাগচাষী'দের কখনও 'ভাগচাসী' বলত না। সম্বোধন করতো জোতদার বলে। নিজে যে জোতদার সেটার অর্থ আড়াল করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস। দশবারো বছর আগে বরকত, গেণী, অটলদের নিজস্ব জমিজমা ছিল। কিন্তু তা আর নিজ হাতে রাখতে পারেনি। বরকত একজোড়া গরু গতবছর গোহাটা থেকে কিনেছিল। আর এবছর শীতে দুটোই কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। নতুন এক জোড়া আবার কিনবে তেমন ক্ষমতাও নেই। ঘোষের খোরাক জুগিয়ে নতুন দায় ঘাড়ে চেপেছে। চাষ তুলতে গিয়ে যখন ঋণ করার প্রয়োজন হয় তখন তো সরকারের কাছে ধর্ণা দিয়ে কানাকড়িও চাষীর মেলে না। বাধ্য হয়েই গরীব চাষীদের ঘরে ফিরে ঐ সুদখোর মহাজন জমিদার শৈলেন চৌধুরীর কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। আবার সরকারের কাছ হতে ঋণের সিংহভাগ লাভ করে ঐ শৈলেন চৌধুরীরা। শৈলেন চৌধুরীর কাছে যে চাষী ভাদ্র-আশ্বিন মাসে একবস্তা ধান ধার করেছে। অগ্রান মাসের মধ্যে সেটা শোধ করতে হবে বস্তায় দেড়বস্তা

হিসেবে। ভাদ্রে একশ টাকা ধার করার জন্য গতবছরই অগ্রানে বরকত একশ' সাতষট্টি টাকা গুণে দিয়ে এসেছে। গেণীই তো সময়ে তার ধার শোধ করতে পারেনি বলে এ বছরেই তার শেষ তিন বিঘা সুন্দর শালী জমি শৈলেন চৌধুরীকে ছেড়ে দিল। প্রথমে বন্ধকী দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বন্ধকী রেজিষ্ট্রি দলিল হয় না, তাই সাফকোবলা বিক্রী দলিল করতে হয়েছিল। এইভাবেই বহু গরীব গুরবোর ভালো ভালো জমি শৈলেনের পেটে চলে গেছে।

জনপ্রিয় সরকারের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী বিবাট বিরাট জনসভায় মাঝে মাঝে ঘোষণা করতে থাকলেন—অধিকার কেউ এমনি এমনি দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। তোমার বাপ পিতামহের জমিই ঐ জমিদার মহাজনেরা ভোগ দখল করছে। ও-জমি তোমাদের নিজের! উচ্ছেদ হয়ে থাকলে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই কর। এই সরকার তোমার সে লড়াইয়ের হাতিয়ার। একে তুমি চোখের মণির মতো রক্ষা করো। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করো না। গোটা কৃষক সমাজকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হলে শুধু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করা যাবে না! গোলামী মনোবৃত্তি নয়। মাথা উঁচু করে নিজের অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার লড়াই করে যাও। এই সভায় মিছিল করে বরকত, গেণী, বাবুলাল সবাই এসেছিল। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও সেদিন সভা ছেড়ে লোকজন চলে যায়নি। সবাই ভিজেছে। নেতারাও ভিজেছে। সভার শেষ ঘোষণা শুনে সবাই উঠেছে। দর্শকদের এমন মানসিকতাই গড়ে উঠেছিল।

গ্রামে ওরা আবার নিজেদের মধ্যে মিটিং ডাকল। শ্যামলের উপস্থিতিতে মিটিং বসেছে স্থানীয় কৃষক সমিতির নেতা আলিম মণ্ডলের বাড়ী। সেদিনও প্রচণ্ড জল-বৃষ্টি। তবু কিন্তু সবাই হাজির। মাথায় প্রায় সবাইয়েরই টোকা। ভিজে ঢোল হয়ে আলিম মণ্ডলের মাটির বাড়ীর বারান্দায় একে একে সবাই এসে জড়ো হচ্ছে। কেবল শুকলাল আসেনি। তার খবর নিতে ভিতর থেকে বরকত বলে উঠল—শুকলাল আসবে না এ-সভায় সে তো আমি জানতাম। শৈলেন চৌধুরী ওকে দুটি বিঘা জমি 'ভাগে' দিয়ে রেখেছে। শুকলালকে নাকি জমিদারবাবু বলেছে—মিছিল মিটিং করলে ঐ জমি সব কেড়ে নেবে। শুকলাল প্রতিজ্ঞা করেছে, সে সমিতির ডাকে আর যাবে না। জমিদারও নাকি কথা দিয়েছে, তার কাছ থেকে জমি নিয়ে নেবে না।

বরকত সকালেই গেছলো শুকলালের কাছে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে আন্দোলনে নামানোয় রাজী করাতে। শুকলাল সেইসময় কোলের বাচ্চাটা নিয়ে মাটির রোয়াকে

বসেছিল। বরকতের হাঁকাহাঁকি শুনে বাইরে বেরিয়ে এল। বরকত জিজ্ঞেস করলো কি ভাই শুকলাল, তুমি আজকের কর্মসূচী জানো না। আজ ভাগচাষী—ক্ষেত-মজুরদের মিছিল। চলো। তাড়াতাড়ি নাও মিছিলে আমাদের সঙ্গে তো তোমাকে যেতে হবে। চোখেমুখে শুকলালের বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল—সে খানিক চিন্তা করে কিছুর কিনারা না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো—"কিসের মিছিল আজকে কৈ আমি তো কিছুই জানি না।"

বরকত সঙ্গে সঙ্গে দেরী না করে উত্তর দেয়—সেকি গত বিষুতবারে আলিমের বাড়ী এতোবড মিটিং হলো। সেখানেই তো স্থির হয়েছিল আজ মিছিল করা হবে, সম্ভব হলে জমি পূণর্দখল করা হবে।

শুকলাল উত্তর করে—সেদিনের মিটিনে আমি ছিলাম না।—ঠিকই আমার মনে পড়েছে তুমি সেদিন মিটিনে যাওনি। কিন্তু কি আলোচনা হয়েছে তাতো তুমি জানো। তাছাড়া এই গাঁয়ে একসময় তুমি কৃষক সমিতির নেতা ছিলে। সবাই বসে যেটা স্থির করেছে সেটা অদলবদল করা সম্ভব নয়। অন্ততঃ মিছিলে তো তোমার অমত করা উচিত হবে না।

শুকলাল জবাব দেয়—আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবো না।

এত স্পষ্ট জবাব শুনে বরকত কিছুটা থমকে যায়। শুকলালের কাছ থেকে এ ধরনের জবাব সে কেন কেউই চিন্তা করতে পারে না।

—কেন? কেন তুমি যেতে পারবে না, শুকলাল! বরকত লক্ষ্য করে শুকলালের ঘরের মধ্যে চৌকি পাতা। জামাকাপড়ের পরিচ্ছন্নতা। গোয়ালে একজোড়া তাজা বলদ। মনে হচ্ছে শুকলালের অবস্থা কিছুটা ফিরেছে। বরকতের কথার উত্তর দেবে একটু তারজন্য চিন্তা করে নেয়। শুকলালের নীরবতা বরকতকে চঞ্চল করে তোলে। তার সবল বাহু দুটো নিজের দুই হাতে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বরকত জিজ্ঞেস করে—বল, বল শুকলাল, কেন তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না? শুকলালকে উত্তর একটা দিতেই হবে। সে বলে—বাবুর বিপক্ষে আমি যেতে পারবো না। বাবু আমাকে বাড়ীর 'নাগাডে' রেখেছে। আট বিঘে জমি ভাগে দিয়েছে।

দুপা সরে এসে বরকত বলে—শুকলাল। শেষপর্যন্ত তুমি বড লোকের পা ফাঁদে পা দিলে? আমরা তোমাকে আমাদের নেতা মনে করতাম। তাহলে সব মিথ্যে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করতাম। তুমি আমাদের সঙ্গে শেষপ বিশ্বাসঘাতকতা করছো। তুমি ভুল করছো শুকলাল। বড ভয়ঙ্কর ফাঁদে

দিয়েছো। সময় আছে, এখনও সরে এসো ও পথ থেকে।

শুকলাল জবাব দিল—তা কি হয়? তোমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলে তো আর আমার পেট ভরবে না।

বরকত একটু উত্তেজিত, তবু তার প্রকাশ চেপে শরীরটাকে সোজা করে বলল—ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বুঝেছো, যা করবে ঠিক করে ফেলেছো, তা জানতে পারলে পাড়ার গরীবরা তোমাকে 'দালাল' আখ্যা দেবে। ভবিষ্যতে এ পাপের জন্য তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এ আমি এখন থেকেই বলে দিলাম। তুমি ভেবো না, তুমি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে—কথাগুলো বলে বরকত আর সেখানে দাঁড়ালো না। সোজা দ্রুতপায়ে শুকলালের বাড়ী ত্যাগ করল। শুকলালও বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

বেলা আটটার সময় ভাগচাষীরা হাতে লাল পতাকা নিয়ে নেমে পড়ল তাদের ভাগচাষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জমিদারের বিভিন্ন জমিতে। যেগুলো তারা শুধু ভাগে চাষাবাদ করতো, সেগুলো ছাড়া অন্য কোন জমিতে ওরা নামল না। যে যে জমিটা ভাগে করতো সেই সেই জমিতে নেমে বীজ রোয়ার কাজ শুরু করল। ওরা রোয়াব মাঝে মাঝে কেউ একজন আওয়াজ দিচ্ছে—ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ কর।

শুকলাল এরমধ্যে জমিদারের কানে তুলে দিয়েছে তার আগেকার বন্ধুদের এদিনের প্রোগ্রামের কথা। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সেই সময় শৈলেন একটা সিনেমার বই নিয়ে মগ্ন হয়ে গল্প পড়ছিলেন। শুকলালের কাছ থেকে সব শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর বইটা সজোরে টেবিলের ওপর ফেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—শালার ছোটলোকগুলোর আস্পর্ধা দেখছো তো শুকলাল। বার কর আমার দোনালাটা। বলতে বলতে কখন উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা মেঝেয় পায়চারী শুরু করে দিয়েছে। সারা শরীর যেন কাঁপছে। জমির ধারে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল। শুকলাল সঙ্গে যেতে সাহস করেনি।

জমিদার যখন পৌছালো জমির ধারে তখন রোয়ার কাজ অনেক খানি এগিয়ে গেছে। কয়েকজন ক্ষেতমজুর ভাগচাষী একসঙ্গে গান গাইছে আর রোয়ার কাজও চলছে। গান গাইছে—"কাস্তে মোদের বুকের বল। লাল সরু যে ঝলমল, দিন-তুনিয়ার মালিক মোরা কাস্তের দৌলতেরে।" আলের ধারে পোঁতা লাল ঝাণ্ডা দুটো সামনে মাঠের হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে। শৈলেন চৌধুরী দূরে একটা আলের ধারে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল। ওদের মধ্যে অপরিচিত যুবকটি

কে ? সে আরও কাছে এগিয়ে গেল। তারপর যুবককে ডেকে প্রশ্ন করল—এদের আপনি মাঠে নামিয়েছেন বুঝি। শৈলেন চৌধুরীর কর্কশগলার আওয়াজ শুনে এবং লম্বা চওড়া মোটা সোটা চেহারা দেখে শ্যামল ধরে নিল ইনিই হচ্ছেন কুখ্যাত জমিদার শৈলেন চৌধুরী। জমিদারকে আলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে ভাগচাষীরা কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল। ততক্ষণে রোয়ার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বীজের গুছি অবশ্য তখনও আঁটি বাঁধা খালের ধারে কয়েকটা পড়ে আছে। কয়েকটা জমির মাটি তৈরি ছিল না। সেগুলো লাঙ্গল দিয়ে কাদা করে তার ওপর মই চলছে। বলদের ল্যাজ মুড়ে মুড়ে মই-এর ওপর চেপে গড়গড় করে কাদার উপর যেন রথ চলছে। বরকত আর অটল কাজ খানিক থামিয়ে শুনতে লাগলো জমিদারের সঙ্গে শ্যামলের কথোপকথন।

শৈলেন চৌধুরী জিজ্ঞেস করছে—আপনি যে এদের আমার জমিতে নামিয়েছেন আপনি এদের সবাইকে চেনেন।

হ্যাঁ, আমি এদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আপনার জমি-বাড়ী এই গাঁয়ে। আপনারও তো এদের চেনাজানা উচিত।

—আপনারা এদের জোগাড় করে এনেছেন। সব সাজানো। আপনারা সুযোগ পেয়ে যেখানে খুশী লালঝাণ্ডা গাড়ছেন। আপনারা জুলুম শুরু করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে আমার পবিত্র অধিকার রয়েছে—আপনারা সেখানে এসে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছেন।

—ভুল করছেন আপনি। আপনার ব্যক্তিগত সম্পতিতে আমরা কেউ হামলা করতে আসিনি। যারা আজ আপনার জমিতে হাল-বলদ নামিয়েছে, রোয়া-পোঁতার কাজ করছে তারা সকলেই ছিল আপনার জমির ভাগচাষী। গত তিন বছরের মধ্যে একে একে বাইশজন ভাগচাষী আপনি উচ্ছেদ করেছেন। আপনি এখানে বাস করেন না? জমিজমাও নেহাৎ কম নেই। কাজেই ভাগচাষীরা এসব ক্ষেত্রে তাদের অধিকার বজায় রাখবেই।

—না এসবই মিথ্যা। আপনি মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়েছেন। আমি এ-সব বরদাস্ত করবো না।

অটল, বরকত্ আর চুপ করে থাকতে না পেরে লাঙ্গল আর মই ছেড়ে আলের ধারে চলে আসে। অটল, ক্ষেত্রপাল ওদের কাছে এসে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে থাকে ঐ ঐ যে তিনকুড়োর পাশে যে জমিটা উত্তরে লম্বা চলে গেছে ঐ এক বিঘেটা

আমি আমার জ্ঞানে ভাগে চাষ করে আসতাম না বাবু। আমার আগে তো আমার বাবাকেও ভাগে দিয়েছিলেন। ঐ যে ছ'পন জমিটা। এটা তো এককালে বরকতের বাবারই ছিল। আপনাকে বন্ধকী দিয়েছিল।

বরকত এর সঙ্গে যোগ করে—পাঁচ বছরের জন্য বন্ধকী দেওয়া হয়েছিল। ঐ সময় ভাগে চাষ করতাম। নিজেদের জমিতে নিজেরা হলাম ভাগচাষী। সে যাক, আমরা টাকা নিয়ে আপনাকে জমিটা বন্ধক রাখতে দিলাম। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় সবটাই শোধ হয়ে গেছল। তবু আপনি ছাড়লেন না। বললেন—সুদ অনেক হয়েছে। সুদের টাকা কিন্তু আসল থেকে বেশী হয়ে গেল।

আলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাকাটাকাটি চলছিল তার নিচেই একটা গর্ত থেকে একটা সাপের মুখ দেখা যাচ্ছিল। সেটা চোখে পড়েছিল জমিদারবাবুরই। তিনি সভয়ে 'সাপ' 'সাপ' বলে দুপা পিছিয়ে যেতেই পড়লেন মাঠের কাদার মধ্যে। জুটো পা চটি শুদ্ধ গেল তৈরী কাদার মধ্যে ঢুকে। অন্যরাও খানিক হকচকিয়ে গেলেও সবাই মিলে টেনে তুলল জমিদার মশাইকে কাদা থেকে।

জমিদার চৌধুরী কিছুটা উত্তেজিত। আল থেকে পড়ে গিয়ে কাদা মেখে হাসির খোরাক হয়ে পড়লেন। তবু হাসি চেপে শ্যামল বলল—আপনি এই গরীব ভাগচাষীদের স্বীকার করে নিন। এরা আপনার জমিতে উৎপাদন আরও বাড়াবে। নিয়মিত ভাগ দেবে। মাটির সঙ্গে এদের রক্তমাংসের সম্পর্ক। মাটিকে এরা আঁকড়ে পড়ে থাকবে। স্থির হয়ে ওদেব কথাগুলো হজম করে চৌধুরী মশাই প্রস্তাবটা মেনে নিতে অস্বীকার করে ঘাড় নাড়লেন। ইতিমধ্যে গেণী প্রমুখ আরো কয়েকজন আলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। শ্যামলও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলল—"আপনি মস্ত ভুল করছেন শৈলেনবাবু। ওদের সঙ্গে চাষ তোলার খরচ আধাআধি ভাগ হবে। যা দেবেন ওদের সব খাতায় লেখা থাকবে। ওরা আপনাকে ফসলেব ভাগ দিলে রসিদ আদান-প্রদান করবেন নিজেদের মধ্যে।"

গেণী কথাটা শুনেই চমকে উঠল। তার কাছ থেকে জমি কেড়ে নেবার মূলে যে সেই একই ইতিহাস। গেণী ফুঁসে ওঠে—শ্যামলদা, রসিদ দেওয়া-নেওয়ার কথা বলছেন তো। হায়! আমি তো ভাগ মিটিয়ে দেওয়ার পর একবার বাবুর খামারেই রসিদ চেয়েছিলাম। কারণ তখন ভাগচাষী ভাগ দিচ্ছে না বলে সে সময় জে. এল. আর. ও. অফিসে কয়েকটা মামলা চলছিল। সেইজন্য আমি রসিদ চেয়েছিলাম।

তার কাছে এসে আগ্রহ নিয়ে শ্যামল জিজ্ঞেস করে—তারপর?

—তারপর আর কী? রসিদ তো পেলাম না। চাড্ডি গালিগালাজ খেয়ে বাড়ী ঢুকলাম। সেই আমার বাবুর খামারে শেষ ধান ভাগ করা। জমিতে আমাকে নামতেই দেয়নি। দারোগা-পুলিশের ভয় দেখালেন উনি। শুনলাম থানার দারোগাবাবুকে উনি এজন্যে হাজার খানেক টাকা সেলামী দিয়ে এসেছেন। আমি একদিন দুপুরে থানায় নালিশ জানাতে গেছলুম। দারোগাবাবুতো রেগে আগুন। আমার কথা শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। চীৎকার করে সেপাই দিয়ে আমাকে হাজতে পুরে দিয়েছিলেন। তারপর রাত্রি বারোটা নাগাদ আমাকে হাজত থেকে বার করা হল। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি লালঝাণ্ডা বই কিনা? চুরি ডাকাতি করি কিনা? আমরা নাকি গুণ্ডা, বদমাস। অবশ্যি মেজবাবু লোকটি খুব ভালো লোক ছিলেন। তাঁর কিরপায় তো আমি ছাড়া পেলাম।

এসব শুনে জমিদার শৈলেন চৌধুরী বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তিনি বল্লেন—এসব সাজানো কথা। জমি মেরে নেবার জন্য এসব বানানো হচ্ছে। তিনি একছটাক জমি কাউকে দেবেন না। এসব সাফ শুনিয়ে দিয়ে আষাঢ়ে মেঘের মতো মুখখানা ভারী করে দ্রুত পায়ে মাঠ থেকে চলে গিয়ে রাস্তায় উঠে মোটর বাইকে চেপে বসলেন। ভাগচাষীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে যে যে জমিতে যে কাজ করছিল সেই কাজে লেগে গেল।

সারাদিন কেটে গেল জমিগুলোতে লাঙ্গল ও মই দেওয়া, রোয়া-পোঁতার কাজে। জমি দখলের কাজ শেষ করে পরিশ্রান্ত বরকত, গেণী, অটল ওরা বাইশ জন তার সঙ্গে আরও জনা পঞ্চাশেক গরীব চাষী-মজুর মিছিল করে উচ্চকিত কণ্ঠে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শ্লোগান দিতে দিতে বাজার তলায় এসে উপস্থিত হল। যে পঞ্চাশজন বাইশজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তারা বিকালের দিকে এসেছিল জমি দখলের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাতে। ওরা প্রথমে মাঠের ধারে রাস্তায় এসে জমায়েত হয়। ওদের হাতে ছিল লাল পতাকা আর কৃষক সমিতির ফেস্টুন। আর ষ্টিক ব্যানার। ষ্টিক বেনারগুলোতে উজ্জ্বল লাল রঙে লেখা "ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ কর।" "জমিদারের অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ এক হও।" রাস্তা দিয়ে দু'লাইনে ওরা হাঁটছিল। হাততালি দিয়ে গান গাইছিল কাকদ্বীপের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের গান, অহল্যা কিষাণী মায়ের গান-"গর্ভবতী মায়ের বুকে লাগল সীসের গুলি, অভাগিনী স্বাধীন দেশে দিল জীবন বলি, মাগো অহল্যা কিষাণী, মাগো অহল্যা কিষাণী।" গান গাইতে গাইতে

ওরা এল বাজারতলায়। সেখানেই একটা ছোট পথসভা হয়। জমিদার শৈলেন চৌধুরীর অন্যায় কার্যকলাপ আর তার বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের একটানা লড়াই এবং সবশেষে আজকের জমিদখলের ঘটনা এসব ব্যাখ্যা করে শোনাল শ্যামল।

আল থেকে উঠে গিয়ে জমিদার শৈলেন চৌধুরী সেদিন সোজা চলে গেছলো থানায়। তাকে প্রচণ্ড হাঁপাতে দেখে দারোগাবাবু সসম্ভ্রমে বিনীতভাবে বসার অনুরোধ করে। শৈলেন চৌধুরী হাত তুলে কিছু একটা বলতে গিয়ে হাঁপানির জন্যে বলতে না পেরে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে খানিক বিশ্রাম নেয়! তারপর বলতে থাকে "দারোগাবাবু, আমার জমি সব ঐ লালঝাণ্ডারা কেড়ে নিচ্ছে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো দারোগা, জিজ্ঞেস করলো—কি বললেন লালঝাণ্ডার লোকেরা আপনার জমি কেড়ে নিচ্ছে? আরে মশাই, আপনার ঐ এলাকার তো লালঝাণ্ডার লোকেরা শুয়ে পড়েছিল বলে জানতাম। আবার বুঝি চাগার মেরেছে। হুঁ, দাঁড়াও, শায়েস্তা করে ছাড়ছি।

শৈলেন দারোগার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বড় খুশী দারোগার কথাবার্তায়, উৎসাহিত হয়ে সে বলে—সরকারের মন্ত্রী বদল হয়েছে। তোমরা যে বদলে যাওনি, এটাই রক্ষা। শোনো আমার কথা তোমাদের খাতায় বাপু লিখে রাখো। বলা তো যায় না। তুমি এই থানায় তো আর বরাবর থাকবে না। তোমার পর যে আসবে সেই যে আবার গোপনে গোপনে কম্যুনিষ্টদের দালালি করবে না। কে বলতে পারে?

মাস কয়েক আগে একটা ইস্কুল মাষ্টারী পেয়েছে শ্যামল। ইস্কুলের সেক্রেটারী খুবই বুদ্ধিমান। ভালো ভালো কথা বলে মাষ্টারীতে ঢুকিয়ে পরে একমাস বাদে দিল নিয়োগপত্র। তাতে উল্লেখ করে দিল তার চাকরী একেবারেই অস্থায়ী। সেক্রেটারী খোঁজ খবর করে শ্যামলের রাজনৈতিক জীবনের আঁচ পেয়ে যায়। প্রতিবাদের মধ্যেই সে শিক্ষকতার কাজ চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন অঘটন ঘটে গেল। যে অঘটনের পশ্চাতে ইস্কুল সেক্রেটারীর হাত থাকা অসম্ভব নয়। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে কালীতলার মোড়ে যেই বাস থেকে নামতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনষ্টেবলকে নিয়ে বাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। মাটিতে পা দিতেই একজন অফিসার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো—আপনার নাম শ্যামল বসু না?

শ্যামল দেখলো অদূরে দাঁড়িয়ে আছে তারই এলাকার জনৈক কুখ্যাত কম্যুনিষ্ট

বিরোধী গোয়েন্দা। আর কোন উপায় নেই দেখে সরাসরি জবাব দিল—হ্যাঁ, তা কি হয়েছে কি ?

—আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। বলে ওরা কর্ডন করে তাকে জীপে তুলে নিয়ে জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই রাজ্যের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে।

শ্যামলকে জীপে তুলে একেবারে জেল। কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার হাতে আটকাদেশের কারণ জানিয়ে কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাতে উল্লেখ ছিল "আপনি গত…তারিখে…টার সময় আপনার দলের লোকজন নিয়ে লাল পতাকা হাতে জমিদার শৈলেন চৌধুরীর জমি বেআইনীভাবে দখলে নামেন। তিনি বাধা দিতে গেলে আপনি আপনার দলবল সমেত শৈলেনবাবুকে আক্রমণ করেন। তিনি প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান।" ব্যাস্, আটকাদেশের কারণ শেষ।

জেলের হেড ওয়ার্ডার শ্যামলের সঙ্গে দিল একটা পুরোনো তোবড়ানো থালা, বাটি আর একজোড়া দুর্গন্ধযুক্ত কম্বল। তাই নিয়ে তাকে সাত নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে সমস্ত ধরনের বিনা বিচারে আটকের মানুষগুলো আছে সেই রাত্রেই সেখানেই তাকে ঠেলে দেওয়া হল। রাত্রি আটটা নাগাদ সাতনম্বরের বিশাল দরজার তালা সেপাই খুলতেই ভিতরের সবাই উন্মুখ নতুন 'আমদানি' দেখার জন্য। এরা অধিকাংশই চালের চোরা কারবারী। সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত। শ্যামলকে ভিতরে একরকম ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে সেপাই আবার লৌহ দরজায় বিরাট দুটো তালা বাইরে থেকে চাবি দিল। তারপর একবার প্রবল ঝাঁকুনির শব্দ আসে। এটা হচ্ছে তালা দুটোয় ঠিকমত চাবি পড়েছে কিনা তার শেষ পরীক্ষা।

এদিকে শামলের অবস্থা সেই রাত্রেই কাহিল। সমাজবিরোধীরা তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্নবাণে অস্থির করে তুলল। একজন মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি দাদা। চাল পাচার করতে গেছলেন বুঝি ? খুব কাঁচা লোক মনে হচ্ছে। পুলিশকে কিছু দিতে চাননি বোধহয়। তার মুখে যে দুর্গন্ধ শ্যামলের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। আর একজন তো ল্যাঙ্গট পরে নাচতে নাচতে এসে শ্যামলের পাতার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া কম্বলদুটো হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা মাথায় পাগড়ীর মতো করে জড়িয়ে আর একটা কোমরে জড়িয়ে হি হি করে হাসতে থাকে। হঠাৎ শ্যামলের হাত থেকে থালা আর বাটীও চলে গেল। শ্যামল ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে প্রথমটা ভেবেছিল বোধহয় সবাই রাজনীতি করার

জন্য আটকে আছে। তাই একজনকে বলে ফেলেছিল—সে আগে শিক্ষক আন্দোলন করত। এখন যুক্তফ্রণ্টের কর্মী। এইটুকু বলার জন্যই তাকে কয়েক-জন মিলে ঘিরে ধরে নাজেহাল করে তোলে। এরই মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হলো জনৈক বাবলী শেঠ। তিনি যে তার বিশাল চেহারা নিয়ে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরা যুবকদের মধ্যে দুজনের গালে কষে দুটি চড় বসিয়ে দিতেই তারা সরে গেল। চীৎকার করে জানতে চাইল—তোরা কি এঁকে খেতে বসতে দিবি না? তারপর শ্যামলের একখানা হাত ধরে টানতে টানতে সোজা নিজের জায়গায় নিয়ে চললো। বিছানাটা পেতে তার ওপর শ্যামলকে বসতে বলে।

—আপনার খুব খিদে পেয়েছে, না? কখন ধরা পড়েছেন?

—বেলা বারোটা।

—কোত্থেকে আসছিলেন?

—ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিলাম।

—ও, আপনি মাষ্টারী করেন বুঝি? যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক।

—হ্যাঁ।

—তা বেশ বেশ। মশাই আমিও যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক। কিন্তু আমি কম্যুনিষ্ট-দের ঘৃণা করি। যাক্ সেসব কথা পরে হবে। আপাততঃ কিছু খেয়ে নিন। আজ তো আপনার 'মিল' নেই। আমি দিচ্ছি আপনি খান। আমার বিছানার পাশে কম্বল পাতুন।

—কিন্তু আমার কম্বল তো কেড়ে নিয়েছে।

—ও তাই বুঝি। আচ্ছা দাঁড়ান। বলেই বাবলী পলকের মধ্যে উঠে গেল।

শ্যামলের কম্বল উদ্ধার করে এনে বাবলী তার সামনে ধপ করে ছুঁড়ে রেখে দিল। তারপর নিজের পাতা বিছানার ওপর বসে খাবার টেনে টেনে বার করতে থাকে। কলা, পাঁউরুটি, দুধ এগিয়ে দিল শ্যামলের দিকে। সে তো এতো খাবার দেখে কিছুটা অবাক। ভালোভাবে লক্ষ্য করতেই চোখে পড়ল বড় বড় কয়েকটা বোতল। কয়েকটা খালি, কয়েকটা মদে ভর্তি। এ-সব জেলখানায় যে কিভাবে আসতে পারে তা সবাইয়ের জানার ব্যাপার নয়। যাইহোক সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকা খালি পেটে দুধকলা পাঁউরুটি খুব উপাদেয়। পরপর তিনদিন কেটে গেল ক্লান্তি দূর করতে। কিন্তু এরপর তো রাত্রে আর ঘুম হয় না। চোখের পাতা পড়তে চায় না। সমস্তদিন-রাত্রি বন্দীরা যেভাবে কাল কাটাচ্ছে তা কল্পনা করা যায় না। অসভ্যতা নাচ-গান, নিজেদের অশ্লীল গালিগালাজ, মারপিট

এসব প্রাত্যহিক ব্যাপার অনেকটা সকলের গা সওয়া। দু-একজন যারা যুক্তফ্রণ্টের প্রকৃত সমর্থক আছে তারা একদিন শ্যামলকে চুপিচুপি বলে যায়—"দেখুন, শ্যামলবাবু, আপনি নতুন। অন্যায় দেখলেই যেন ফোঁস করে উঠবেন না। তাহলেই গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। দেখুন আমরাও যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক। তবু আমরা চুপ করে আছি। কারণ যারা এই ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে আছে তাদের যুক্তফ্রণ্টের আমলেই বন্দী করা হয়েছে। ওরা ক্রিমিন্যাল। চালের চোরাকারবারী। দেশের চলতি আইনে ওদের ধরতে চায় না। বিনাবিচারে আটক করাটাকেই 'ওষুধ' বলে ধরে নিয়েছে। আমরাও চাল ব্যবসা করি, বৈধ লাইসেন্সও আছে। তবু আমরা ফ্রণ্টের আমল থেকে জেলে আটকে আছি। কিন্তু তাই বলে ফ্রণ্ট সরকারের সমালোচনা করি না। এইভাবে বারদিন চললো। শ্যামল অশ্লীল কাজকর্মে অংশ নিত না বলে ওকে ক্রিমিন্যালদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

ইতিমধ্যে শুরু হল আইন অমান্য করা। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে নেতার গ্রেপ্তারবরণ করতে থাকলেন। জেলখানাটা ভরে উঠল। সমাজবিরোধীরাও কিছুটা কোণঠাসা হয়। চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত শ্যামলকে 'নির্জন সেলে' পাঠিয়ে দিল। সাত নম্বর ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে সেলে যাবার অনুমতি পেয়ে শ্যামল হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

কারাকক্ষে নির্জন সেলে শ্যামল একা বসে দিন গোণে। সেলের জানলা দরজা কবাট কিছুই নেই। তবে আছে মোটা লোহার গরাদ। বর্ষাকালে প্রচণ্ড জলঝড় হলে সব গুটিয়ে নিয়ে এক কোণে বসলেও কিছু হয় না। ছোট সেলের মধ্যেই পায়খানা। শোয়া সবকিছু। সেলে থাকলে অন্য কোন ওয়ার্ডের কোন বন্দীর সঙ্গে আলাপ করা, দেখাসাক্ষাৎ করা আইনত নিষিদ্ধ। বাইরের লোকে সপ্তাহে একদিন দেখা করতে পারবে। তা নিয়েও গোলমাল। ইতিমধ্যে মাধুরী একদিন কায়দা করে দেখা করে দুখানা বই দিয়ে গেছে। ক'দিন হল সেটারও পাঠ শেষ। চুপচাপ বসে থাকা আর যতো বিচ্ছিন্ন টুকরো চিন্তায় মাথায় জট পাকিয়ে যাওয়া। দুপুরবেলা বিদ্রোহী কবি নজরুলের "কারার ঐ লৌহ কবাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট" গানটার যতটুকু জানা আছে তাই গুণগুণ করে আপনমনে গাইতে থাকে। এইসময় একজন ওয়ার্ডার কিছু কলা, স্লাইসড্ রুটি দিয়ে গেল। কে একজন মহিলা দেখা করতে এসেছিলেন ডেপুটিবাবু দেখা করতে দিতে শেষপর্যন্ত গররাজী হওয়ায় তিনি ঐ খাবারগুলো আর এক টুকরো চিঠি গেটের সেন্ট্রির হাতে

শ্যামলকে দেবার জন্য দিয়ে যায়। চিঠিটা খুলে দেখে মাধুরী এসেছিল। সুযোগ পেলে বন্দীরা সেটার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। শ্যামলও সুযোগ পেলে সেণ্ট্রি আপত্তি না করলে সেলের সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। জেলখানাটা সে দেখতে চায়। বাইরে থেকে একে কত রহস্যময় মনে হয়। মানুষ অনেক কিছু কল্পনা করে ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে। জেলে যে সব ধরনের মানুষই আছে। চোর ডাকাত খুনীরাও যেমন আসে তেমনি তাদের বাদ দিয়ে রাজনৈতিক কার্য-কলাপের জন্যও ধরে আনে।

প্রতিদিন সকাল ন'টায় জেলের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাক্তন কারামন্ত্রীর নামে নির্মিত ভগ্নপ্রায় মণ্ডপে জেলর বড় জমাদার সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে সুপার সাহেব এসে কেশ টেবিলে এসে বসেন। এখানে সব বিচারই 'কাজীর বিচার'। কেশ টেবিলে সুপার সাহেব অভিযোগ শোনার পর যে রায় দেবেন তাকে পাল্টে দেবার ক্ষমতা কারুর নেই। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব কোন কোন দিন কেশ টেবিলে আসতে বেলা দশটা বাজিয়ে দেন। এদিকে গত রাত্রে যে-সব 'আমদানী' এসেছে তাদের জোড়া জোড়া করে সকাল সাতটা থেকে কেশ টেবিলের সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছে?

সেলের সামনে যে বারান্দা আছে, সেখানে দাঁড়ালে কেশ টেবিলে কি ঘটছে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্যামল লক্ষ্য করে কেশ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছাত্র-নেতা গোপেন, অমিত, সিরাজ, বিমল। একজন 'পাহারা'কে ডেকে সে অনুরোধ করে—ভাই, একটা কাজ করতে পারবে আমার জন্যে?

'পাহারা'টি ঘাড় নেড়ে বলল—বলুন, কি করতে হবে।

—ঐ যে চারটি ছেলে কেশ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের কাউকে একবার কেশ টেবিলের কাজ শেষ হলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

—ঠিক আছে, আপনি সেলে চলে যান। কেশ টেবিল হয়ে যাচ্ছে। এবার সাহেব জেলরবাবুকে নিয়ে রাউণ্ডে বের হবে। রাউণ্ড শেষ হলে আমি একজনকে ডেকে আনবো।

শ্যামল লক্ষ্য করলো—সাহেবের অপেক্ষা 'আমদানি' বন্দীরা হাঁটুগেড়ে লাইন দিয়ে বসে আছে। কিন্তু তার পূর্বপরিচিত চারজন একপাশে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। 'শোভা যাত্রা' সহকারে সাহেব এসে পৌঁছুতেই বড়জমাদারের ভীমকণ্ঠের আওয়াজ শুনেই সমস্ত বন্দী একবার উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবকে কুর্নিশ করল তারপর জমাদার ফবার হুকুম করলে যেমন ছিল ঠিক তেমন অবস্থায় লাইনে বসে পড়ল। তারপর কেরানীবাবু নাম ধরে এক একজনকে ডাক দেয়। আর 'আমদানী'

ফাইলে'র বন্দীরা একে একে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে পাশে গিয়ে লাইন দেয়। তারপর সবশেষে গোপেনদের নাম একে একে ডাকা হল। ওরা এগিয়ে গিয়ে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াল কিন্তু একবারও কপালে হাত ঠেকাল না। একে একে যেখানে পূর্বে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়েই দাঁড়াল। কেরানীবাবু প্রত্যেকের নাম, বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে সবাই উত্তর দিল। কিন্তু এই উত্তরদানের মধ্যেও ছিল প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব।

ঘণ্টাখানেক বাদে সেই 'পাহারা' যুবকটি সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামলের সেলে এসে ঢুকল। সিরাজ এসেই আনন্দে শ্যামলের হাত দুটো চেপে ধরে বললো—দাদা, আমি শুনেছি মাধবীদির কাছ হতে, আপনি সেলে আছেন। কেমন কাটছে বলুন।

শ্যামলও যেন একটু বেশী খুশী। সিরাজকে বসতে বলল—বস ভাই, সিরাজ, ভালোই তো আছি। তা তোমরা জেলখানায় এলে কেন?

সিরাজ উত্তরে বলে—আর কেন? আপনার তো ভালোই সব মনে থাকার কথা। যেদিন জমিদারের মানে আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের ভাড়াটে বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছিল। হোস্টেলের কাছেই কুঁড়ে ঘরে বাস করত এক বুড়ী। যখন ওরা বোমা ছুঁড়ছিল এবং যে বিকট শব্দ করে সেগুলি রাস্তায় ফাটছিল তার আওয়াজেই বলছে নাকি সেই রাত্রেই ঐ বুড়ি মারা যায়। ব্যাস্, সমস্ত ব্যাপারটায় আমরা দায়ী হয়ে গেলাম। তারপর গ্রেপ্তার, হাজতবাস আমাদের বিরুদ্ধে সেই মামলা এখন দায়রায় উঠেছে। পরপর কদিন এখন চলবে মামলা। জামীনের জন্য চেষ্টা চলছে। —তোমরা জামীন চেয়েছিলে? 'বুর্জোয়া আদালতে'র তো তোমাদের বিচার করার অধিকার নেই।

—সিরাজের এ ব্যাপারে যে অন্যমত তা খোলাখুলিই বলল।

শ্যামল বলে—কাঠগোড়া যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর দখলে, 'বুর্জোয়া আদালতে'র বিচার শালায় যাবো না একথা বলা হঠকারিতা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রে এমন কিছু আইন-কানুন আছে যা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কাজে লাগে যদি তা ব্যবহার করা যায়। বুর্জোয়ারা যখন দেখবে তাদেরই তৈরী আইন-কানুন তাদের শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন ঐ কাঠামোটা নিজেরাই ভাঙ্গতে চাইবে। যারজন্য বলা হয়—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা যখন বুর্জোয়ারা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য সেই পাতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয় তখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রচলিত আইনের সাহায্য নিয়ে যদি

ম কিছুটা দম নেবার সুযোগ পাও তা নেবে না কেন ?'

—আমাদের মধ্যে অনেকেই নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

—এটা ভালো লক্ষণ। গোপেন যেবার জমিদারদিগের লেঠেলদের লাঠির ঘাতে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে হাসপাতালে ছিল। তখন কিন্তু সে মীন নিতে বলা সত্ত্বেও নেয়নি। সকলকে তখন সে অবিশ্বাস করছে। বিশ্বাসের রাজনীতি সুদৃঢ় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়।

—কিন্তু সবাইকে বিশ্বাস করারও তো বিপদ আছে ?

—তা ঠিকই। কিন্তু তোমার শ্রেণী বা তার পক্ষের দালালদের বিশ্বাস না াতে পারো, কিন্তু নিজশ্রেণী বা মিত্রশক্তিকে বিশ্বাস না করার কোন কারণ লে তা ঠিক হচ্ছে কিনা বারবার তাকিয়ে দেখতে হবে। তোমাদের মধ্যে নকে 'হিরোইজম্' পছন্দ করে। কারণ রোমান্টিক যুবকরা 'শিভ্যালরী' বেশী ন্দ করে। কিন্তু রোমান্টিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রচণ্ড ক্ষতি করে।

জেলের মধ্যে ওদের কেউ কেউ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়ে। ফাঁসীর আসামীর ডেমেন্ড সেল। ফাঁসী মঞ্চ দল বেঁধে একদিন ওরা দেখতে এল। পাশেই মলের সেল। ওর সঙ্গেও তারা সাক্ষাৎ করে যায়। গল্পগুজব করে কদিন জেলখানায় ১ কাটিয়ে গেল। পরে জামীনের সংবাদ শুনে কেউই অখুশী নয়। জামীন উই অস্বীকার করল না। যাবার সময় সিরাজ শ্যামলের সঙ্গে দেখা করে বলে —দাদা, কিছুটা জেলের ভয়তো কেটে গেল। আবার তো আসতে হতে রে। ভেতরটা দেখে এলাম। এর পরের বারে আর কেউ ভয় পাবে না।

শ্যামলের জেলখানায় বন্দীজীবন একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে চিন্তার ল মনকে ভীষণ ভারাক্রান্ত করে তোলে। আজ তাকে কিছুটা উতলা মনে হয়। ধুরীর চিঠিটা বারবার পড়তে ইচ্ছা করছে। তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষ দেখা করতে য়নি। ইণ্টারভিউর ওপর হঠাৎ কেন এই নিষেধাজ্ঞা। মাধুরীর সঙ্গে কয়েক নিটের জন্য দেখা হলে বাইরের অনেক খবর তো পাওয়া যেতো। আবার কবে গা হবে তার নেই ঠিক।

একা একা চুপ করে বসে মানসপটে সেও ভেসে ওঠে ক্ষেতমজুর পাড়াগুলো, ঘাট, নিজেদের অফিস, সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবদের মুখগুলো যেন সামনে ভেসে ঠে। ওরা ঠিক এই সময়টায় কি করছে, হয়তো পাড়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, ীমুক্তির দাবীতে মিছিল বের করেছে। পথে পথে লেনিনের গান গাইছে। মনের উঁচু বিরাট পাঁচিলের ওপর একটা নাম না জানা পাখী বসে চারদিক

চাইছে। এ সময় ঐ একমাত্র বন্দীর সঙ্গী। ও যদি কাছে আসতো, ওকে একটু আদর করা যেতো। তবু এই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জীবনের কিছুক্ষণ তো ভালই কাটতো। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত সেও শ্যামলকে একা ফেলে রেখে কোথায় ডানা মেলে উড়ে চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

হঠাৎ একজন সেপাই এসে সামনে দাঁড়াতে তার চিন্তায় ছেদ পড়ে। সেপাইয়ের হাতে একগোছা চাবি। সেলে তালা দেবার সময় হয়ে গেছে বিকাল পাঁচটা বেজে গেছে। ওকে ওর ডিউটি করতে হবে। শ্যামল উঠে সেলের মধ্যে গিয়ে বসল। নির্বাক পাঞ্জাবী বৃদ্ধ সেপাই বিরাট একতালা ঝুলিয়ে ভালোকরে একবার নেড়ে পরীক্ষা করে নিঃশব্দে চলে গেল। যাবার সময় একটা সংখ্যা উচ্চারণ করলো 'পনেরো'। মানে 'গুণতি'র কাজটাও এই সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে।

তালাবদ্ধ হয়ে শ্যামল কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে যে দু-একখানা পড়বার মতো বই ছিল সব শেষ। বাইরের এক কমরেড এগুলো পৌঁছে দিয়েছিল সিপাইয়ের হাত দিয়ে। মাধুরী পাঠিয়েছিল যা তাও শেষ কাজেই শুয়ে শুয়ে গান গাওয়া ছাড়া করার আর কিছু নেই। গান গাইছিল ও— "ও সাথী কিষাণ মজুদুর ভাইসব, হুঁশিয়ার" সুরের মিল হ'ক বা না হ'ক। এ-গান ও বড় ভালবাসে কতবার শুনেছে যে গানখানা। শুনে শুনেই মুখস্থ হয়ে গেছে।

হঠাৎ বৃদ্ধ জেলরবাবুর গলা শুনতে পেয়ে শ্যামল উঠে বসে। জেলরবাবু অফিসের জানালা দিয়ে একজন সেপাইকে ডাকলেন। তারপর তাকে কি নির্দেশ দিলেন, সেপাই এসে শ্যামলকে তালা খুলে দিল—জেলরবাবু ডাকছেন, শ্যামলবাবু যান। শ্যামল কিছুটা হতচকিত। কি ব্যাপার কিছুই কল্পনা করতে পারছে না। জানালার কাছে এগিয়ে যেতে হাসি মুখে জেলরবাবু বল্লেন—শ্যামলবাবু, আপনার জন্যে খবর আছে। ভালো খবর।

আগ্রহভরে শ্যামল দুপা এগিয়ে গিয়ে—প্রশ্ন করল কি খবর জেলরবাবু? সরকার আপনাকে 'রাজনৈতিক মর্যাদা' দিয়েছে। আপনি আজ থেকে 'সি'গ্রেডের বন্দী। আজই 'মেসেজ' এসেছে। শুনুন, রাত-নটা পর্যন্ত আপনার তালা খোলা থাকবে তবে সেলের গণ্ডীর বাইরে কখনই যাবেন না। জেলের মধ্যে কতরকমের লোক আছে জানেন তো। দিনের বেলাতেও বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আপনার সঙ্গে যারা যারা ইণ্টারভিউ করবেন তাদের নামের একটা তালিকা আমাকে দিয়ে দেবেন, "সব শুনে শ্যামল ধীর পায়ে সেলে

চলে গেল। শ্যামল বুঝল তার সঙ্গে এই জন্যই মাধুরীকে আজ সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি। মাধুরীর চিঠিতে এই রকম একটা ইঙ্গিত ছিল—আপনাকে ওরা এখান থেকে 'সি' গ্রেডে তুলে ট্রান্সফার করে দেবে শুনলাম। জানি না কথাটা কতদূর সত্যি। আপনার সঙ্গে ইণ্টারভিউ যারা করবে তাদের নামের একটা লিষ্ট ওরা চাইবে। আমার নামটা দিতে ভুলবেন না যেন।"

কিছুক্ষণবাদে জানালা দিয়ে আবার জেলরবাবুর, ডাক শোনা গেল। শ্যামল কাছে যেতেই তিনি বল্লেন—শুনুন, আপনাকে তো এখন উনুন, বিছানা, ভালো খাবার দাবার সব দিতে হবে। লোক দিতে হবে। সব হয়তো এক সঙ্গে পারবো না। বোঝেন তো এটা ডিস্ট্রিক্ট্ জেল। মশাই সেণ্ট্রাল জেলে যদি যান তো দেখবেন রাজার হালে থাকবেন।

শ্যামল উত্তর দেয়—না না। আমার ওসবের কোন প্রয়োজনই নেই। একটা উনুন আলাদা পেলে অবশ্য ভালোই হবে। হোম ডিস্ট্রিক্ট জেলই ভালো, এজন্য সেন্ট্রাল জেলে যাবার আমার কোন শখ নেই।

—তাকি হয় মশাই। আমাদের তো জেল কোড মানতে হবে। আপনার প্রাপ্য আমাদের যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করতে হবে। হুঁ, চাকরীর আর কটা দিন বাকী। এ খুঁাকি পোষাকটা খুলতে পারলে বাঁচি। আচ্ছা শ্যামলবাবু আপনার বাড়ী কোথায়?

শ্যামল নিজেদের গ্রামের কথা উল্লেখ করতে জেলরবাবু একমুখ হাসি নিয়ে বল্লেন আমি মশাই খাতা দেখে আপনার গ্রামের নাম দেখলাম। আপনি দেবী ডাঙ্গা চেনেন নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এ গাঁয়েই তো আমাদের পৈত্রিক ভিটে। বছরে দুবার যাই দুর্গা পূজোর সময় বাড়ী যাই। আর একবার যাই ধান তোলার সময়। জমিজমা যা আছে তা থেকে যা হয় তা শহরে নিয়ে আসতে হয়। তা না হলে এই মাগ্গী ভাতার দিনে মশাই কি আর সংসার চলতো?

শ্যামলের এ-সব একেবারেই ভালো লাগছিল না। জেলরবাবুর কথায় বিশেষ কোন উত্তর দেবারও প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। শুধু একটু হাসি, একটু হুঁ, হ্যাঁ এইসব দিয়ে কাজ সারছিল। কিছুক্ষণ পর জেলরবাবু বললেন—তাহলে এখন যান। কাল আবার কথা হবে। শ্যামল ফিরে এল সেলে। কিন্তু এসেই দেখল এরই মধ্যে একজন পাহারা, একজন ফালতু, একজন কেরানীবাবু তার সেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিছানা-মশারী নিয়ে।

শ্যামলকে শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হতে হয়নি। এরই মাঝে

এসে গেল নিঃশর্ত মুক্তির আদেশ। আর সেটা তাকে ডেকে শোনান হলো রাত্রি তখন তিনটে। পরদিন তার জন্য জেলগেট খুলে গেল। শ্যামল কারামুক্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুকাল অনাস্বাদিত বাইরের পরিবেশটার স্বাদ টেনে নেয়। তার সঙ্গী হতে কেউ গেটে আসেনি। তার মুক্তির হঠাৎ আদেশ কেউই জানেই না। কাজেই সে জেল গেট থেকে একটা বাসে উঠে সোজা রেলস্টেশনের দিকে চলে গেল। জেলমুক্ত হয়ে সে ইস্কুলে গেছলো তার পুরোনো কাজে যোগ দিতে। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই শুনিয়ে দিলেন যে, তার চাকুরীর মেয়াদ আর তিনদিন। কারণ বিদ্যালয়ের সম্পাদকমশাই তাঁকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছেন। তার মাস্টারীটা কার্যতঃ আর নেই। একজন চাকুরী থেকে বরখাস্ত শিক্ষকের নতুন জীবনের পথে এবার তাকে পা বাড়াতে হবে।

নিজের মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হল শ্যামল। শৈশব থেকে প্রথম যৌবনের দিনগুলি কেটেছে যে ঘরটি, আর বাগ্দীপাড়া, বাউরীপাড়া, কৈবর্ত, দুলে, ডোমপাড়া এগুলো তার আপনজন। শ্রীচরণ বাগ্দী, ভোরে দুলে, সোনামুচি এখনও বেঁচে। পরামাণিক বিপিনদা আজ আর বেঁচে নেই। পিঁড়ি পেতে দিত তারপর ঘাড়টা চেপে ধরে মাথার চুল সাফ করতো। এর মধ্যেই কত গল্প হত, যে পুকুরের পাড়ে শ্যামল মর্নিং ইস্কুল হলে মুইকে দড়ি ধরে নিয়ে যেতো দুপুরবেলা চরানোর জন্য সেইসব পুকুর ডোবা অনেক হেজে-মজে। 'মুই, মারা গেল; নরেন্দ্র মারা যাবার বছর খানেকের মধ্যেই। 'মুই'-এর 'গোঁজ'টা মুগুর দিয়ে ঘা দিয়ে পুঁতে দিত। পাড়ার আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে হয়তো বসত সে। ওরা হয়তো বা একটা খাটিয়া এনে বসতে দিত। 'মুই' মনের আনন্দে ঘাস ছেড়ে জলে নেমে 'হিংচেশাক' চিবোতো। শ্যামল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলতো—তোমাদের বাড়ীগুলো কত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নিকনো। তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা এজন্যে কত খাটে। তারা মাঠে খাটে আবার বাড়ীতেও খাটে। আর তোমরা ? তোমরা মাঠে খেটে এসে সন্ধ্যেবেলায় এলিয়ে পড। নিজেরা যা রোজগার করো সবই তো সন্ধ্যেবেলায় পাঁচুই-এর দোকানের মালিকের পকেট ভারী করে আসো। তোমরা নিজেদের শরীরটা নষ্ট করো, সংসারটাকেও অযত্ন করো।

যারা সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তারা হয়তো বুঝেও ব্যাপারটা বোঝে না এটা শ্যামলের অনুভূতি। কারণ সবাই বলে এটা খুবই অন্যায়। ঘাড় নেড়ে নেড়ে লজ্জাও প্রকাশ করে। কিন্তু পরদিনই আবার পাঁচুই থানায় যায়।

এই রকম আলোচনার মাঝে শ্যামল দেখতে পেল পাশের রাস্তা দিয়ে ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই যাচ্ছে। আড়চোখে তিনি একবার দেখে নিয়ে চলে গেলেন। শ্যামলও মাথাটা ঘুরিয়ে নেয়। পরদিন ইস্কুলের ক্লাসে উপস্থিত পণ্ডিতমশাই পড়াধরার সময় শ্যামলের আদিবাসীদের পাড়ায় দড়ির খাটিয়ায় বসে গল্প করার ঘটনার কথা ব্যঙ্গচ্ছলে সমস্ত সহপাঠিদের মধ্যে উল্লেখ করে বসলেন, তখন লজ্জায় তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। শ্যামলকে সমর্থন করতে তখন কোন বন্ধু এল না। এতে সে মনের মধ্যে দারুণ আঘাত পায়। সেদিন পণ্ডিতমশাইয়ের ব্যঙ্গের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য তাকে কে যেন ঠেলে দিল। সাধারণত সব ইস্কুলের পণ্ডিত-মশাইরা যেমন হন, ইনিও তেমনি বদরাগী। তবে ইদানীং রাগে কেমন যেন ভাঁটা পড়েছে। অন্ততঃ সেইদিন মুখের ওপর শ্যামল যে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল, স্বাভাবিক সময়ে ধীরে স্থস্থে বসে যদি চিন্তা করে বলতে হত কিছুতেই সে বলতে পারতো না। ছাত্ররা একসময় পণ্ডিতমশাইকে বলতো 'যম' আর তাঁর হাতের লাঠিটিকে 'যমদণ্ড' বলে অভিহিত করতো।

সেই পণ্ডিতমশায়কে যখন দীর্ঘ একযুগ শিক্ষকতা করার পর গ্রাম্য রাজনীতির প্যাঁচে বলি হতে হল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ইস্কুল ত্যাগ করে চলে গেলেন। তখন সেইসব কাহিনী শুনে সকলের সঙ্গে শ্যামলও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। শ্যামলের চলার পথে এই পণ্ডিতমশাই বেশ ছাপ ফেলে গেলেন।

ছোট গ্রাম তালপুকুরের জমিদার কৃষ্ণদাস চৌধুরীর স্বভাব আর মেজাজের কিন্তু এখনও কোন বড় পরিবর্তন ঘটেনি। অনুগত প্রজা নাড়ুগোপাল তাঁর বিশ্বস্ত চামচা। যেমন গুরু তেমন তাঁর শিষ্য। এই ছোট্ট গ্রামটার মেয়ে বৌয়েরা নাড়ুগোপালের নামে চমকে উঠে তালপুকুরের সমস্ত মেয়ে পুরুষেরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাড়ায় চাটাই পেতে একসঙ্গে খোসগল্পে মশগুল হয়ে ওঠে। গরমকালে পুরুষ মহিলা কেউ আর ঘরের মধ্যে থাকে না। হয় বারান্দায় আর না হয় উঠোনে পা ছড়িয়ে এই গরমের সময় সবাই খোলা আকাশের নিচে বসে আছে। গাছের পাতা নড়ে না। চারদিকে হাওয়া চলাচলও বন্ধ হয়ে থাকে। সারাদিন দারুণ গুমোট। শীগগীরই হয়তো প্রবল ঝড়-জলও শুরু হতে পারে। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে আকাশের এক কোণে। একটা কোণে টুকরো টুকরো জলভরা মেঘ জমছে। এমন

সময় হঠাৎ কমলার ঘর থেকে হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে আসে।

কমলা এদিন তার ঘরের বারান্দায় একা বসেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। স্বামী তখনও মনিববাড়ী কাজ করছে। নাড়ুগোপাল পাড়ার মধ্যে ঢুকেছিল 'কিষেণ' খুঁজতে। প্রথমেই এসে পড়ে কমলার কাছে। কমলা বেশ কর্মঠ। অনেকের তিন দিনের কাজ ও একাই করে ফেলে। দেখতেও কমলা মোটামুটি। অটুট স্বাস্থ্য, চটপটে। অবুঝ সরল সাদাসিধে মেয়েরাও ওকে 'নেত্রী'র মর্যাদা দেয়। খুব বেশীদিন হয়নি বিয়ে হয়েছে।

নাড়ুগোপাল 'কিষেণ' করতে এসে কমলার কুঁড়ের উঠোনে এসে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার সময় নাড়ুগোপালকে সামনে দেখে কমলা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। নাড়ুগোপাল কি ভেবে দুপা একপা করে এগিয়ে পৈঠেয় পা দিয়ে একটা খুঁটি শক্ত করে ধরে দাঁড়ায়। কমলা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করে—এ সময় আপনি কি করতে এসেছেন?

দুপাটি দাঁত বার করে নাড়ুগোপাল উত্তর দেয়—এ কমলা, কাল আমার সাতপণের আউস কাটা হবে। কিষেণ দরকার হবে। তাই তোর কাছে এয়েচিরে। কমলা ততক্ষণে ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আর নাড়ুগোপাল বারান্দার একটা বাঁশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কমলা সোজাসুজি বলে ফেলে—"বাপু, আট টাকা মজুরী চাই। সেটা তুমি শুকনো, আর না হয় চাল আর নগদে মিলিয়ে দেবে।" নাড়ু কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়—"সবাই যা দেবে আমি তাই দেবো। এক পয়সা কমও দেবো না, বরং বেশীই দেবো, দেখে নিস্। তোরা আট টাকায় গোঁ ধরেছিস্, আমার মতো গরীবকেও তা মানতে হবে। তবে তোর কথাই আলাদা। তোকে এতো দেবো যা তুই চিন্তাই করতে পারিস না।"

কমলা এরই মধ্যে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেছে। নাড়ুর ছটফটানিও শুরু হয়েছে। বেশ জোর গলায় একবার গলাখাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কিরে, যাবি কিনা 'হ্যাঁ' কি 'না' সেটা বল্ না? ঘরের মধ্যে থেকে কমলা উত্তর দেয়—সে বাইরে গেছে। আসুক আগে, তারপর মতামত করবো। আপনি এখন যান। ভোরের দিকে আসুন, তখন বলে দেবো যাওয়া যাবে কি না।

নাড়ুগোপাল ততক্ষণে খুঁটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ দ্রুতপায়ে কমলার ঘরের মধ্যে ঢুকেই ভিতরে খিল এঁটে দেয়। কমলা ততক্ষণে প্রাণপণে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য হাতের কাছে একটা চাকী-

বেলুন তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে গেলে গোপাল দৌড়ে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় ঘরের মধ্যে হাতাহাতি, ধ্বস্তাধ্বস্তি বেলুন দিয়ে একটা সজোরে ঘা মারতেই ছিটকে পড়ে নাড়ুগোপাল। কমলা তখন নিজের মান ইজ্জত রক্ষা করতে মরীয়া। পরনের পোষাক পরিচ্ছদের ঠিক নেই। বাইশ তেইশ বয়স। এ হেন যুবতী কমলার সঙ্গে নাড়ুগোপাল বেশ মিষ্টি স্বরে কথা বলে—ও কমলা, কাল আমার সাতপণটার ধান কাটা হবে। তুই আর সোম যাবি, বুঝেছিস। তোর তো আবার অনেক জায়গায় ডাক। তাই বুঝে আগে থাকতেই ঠিক করতে এলাম।

কমলা উত্তর করে—ডাক তো আসবেই। গতর খেটে খাই। বাবু, তোমাদের মতো লোক খাটিয়ে খাই না তো। হ্যাঁ, মজুরী কতো দেবে?

মজুরী শব্দটা শুনে নাড়ুগোপালের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তার চোখে মুখের তখন কি অবস্থা অন্ধকারে কমলার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। অন্ধকারও তখন একটু চেপেই এসেছে। নাড়ুগোপাল কমলার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—মজুরী? মজুরী সবাই যা দেবে তাই দেবো।

—কতো দেবে—সামনাসামনি বলে যাও বাপু পরে ঝামেলি করবে।

গলাটা একটু নরম করে নাড়ুগোপাল বলে—তুই কত চাস্ বল্? তুই যা চাইবি তাই দেবো বরং তোকে বেশীই দেবো।

কমলা অন্ধকারের মধ্যে বাবুর মুখটা একবার দেখবার চেষ্টা করে। ভালোকরে লক্ষ্য হল না। মনে হল নাড়ুগোপালের চোখের মণি ঘুরছে। কমলার গা শিরশির করে ওঠে। নাড়ুগোপালকে জবাব একটা দিতেই হবে, না হলে ও এখান থেকে একপাও সরবে না। কমলা উত্তর দেয়—বেশ যা চাইবো তাই দেবে তো! আমি আমার জন্যে আর যারা যারা খাটবে তাদের সবার জন্যে আট টাকা-মজুরী দিনের শেষে আটঘণ্টা কাজ হলেই গুণে নেবো। বলো রাজী-আছো, বাবু।

নাড়ুগোপাল আট টাকার দাবী শুনে চমকে ওঠে। ওঃ, এই আট টাকা আট টাকা করে চারদিকে কি সোরগোলি না লেগেছে। রোজ মিছিল, রোজ মিছিল, রোদ নেই, জল-ঝড় নেই, লাল পতাকা হাতে গাঁয়ে গাঁয়ে মিছিল।

—আট টাকা! বলিস্ কিরে? আট টাকা দিতে হলে আমাকে চাষবাস

তো তুলে দিতে হবে। না হয় আজকের মতো তুই নে, আবার আর পাঁচজনকে জানাবি কেন ?

তা হয় না বাবু এটাই আমাদের নীতি। তোমার জমি অনেক ভাগে-ভূতেও দাওনি। তিনশ বিঘের ওপর জমি তোমার। তোমাকে আট টাকা দিতে হবে। তবে শুকনো নেবোনি। চাল আর টাকায় ভাগ করে দিও। নাড়ুগোপাল অন্ধকারে খানিক কিছু চিন্তা করতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর কমলার গলার স্বরেই সম্বিৎ ফিরে আসে।

—কি বাবু রাত তো হচ্ছে, চটপট বলে দোর ছাড়ো, না কাজ নাই আমার সে আসুক আগে, তুমি বাবু আবার সকাল বেলায় এসোদিকিন কথাটা বলেই সে তরতর করে উঠে ঘরে চলে গেল।

নাড়ুগোপাল চট করে লাফিয়ে উঠে কমলার পিছু নেয়। গলা চড়িয়ে বলতে থাকে—এই কমলা, শোন্, শোন্, আরও কথা আছে—

কমলা—'কোন আর কথা লয়কো' বলেই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় নাড়ুগোপালের দেওয়া জোর ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে। অন্ধকারের মধ্যে নাড়ুগোপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর শরীরটার ওপর লাফিয়ে পড়ে সজোরে চেপে ধরে। কাপড় টানাটানি করতে শুরু করলে কমলা পাল্টা তার দুটো হাত দিয়ে জন্তুর গলাটা টিপে ধরে। নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে কমলা তখন মরীয়া। প্রায় বিবস্ত্র অবস্থার মধ্যেই ছুটে গিয়ে ঘরের এক কোণে পড়ে থাকা মস্ত একটা আঁকড়ো কুড়িয়ে নিয়ে ঘোরাতে থাকে। নাড়ুগোপালের সাহস হয় না আর এগিয়ে যাবার।

ঠিক এই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে সোম। ওকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো আঁতকে ওঠে নাড়ুগোপাল। পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল উঠোনে। ক্ষিপ্ত সোম তার ওপর চালাতে থাকে কমলার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া মোটা আঁকড়ো। নাড়ুগোপাল সোমের পা দুটো জড়িয়ে ধরে এবারের মতো ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। "সোম আর কখনও এমন কাজ করবে না রে। এবারের মতো ছেড়ে দে, ওরে আর মারিস্ না রে।" ইতিমধ্যে লাঞ্ছিত কমলা পরনের পোষাক গুছিয়ে নিয়ে উনুনের কাছে পড়ে থাকা এঁটো খুন্তিটা তুলে নিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিতে মাটিতে পড়ে থাকা নাড়ুগোপালের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

চীৎকার চেঁচামেচিতে পাড়া থেকে ছুটেও এসেছে অনেকে। বেশ সরগোল

নাড়ুগোপালকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। হাতে কারুর লাঠি, বেত, মেয়েদের হাতে বেলুন, খুন্তি। জমিদারের পোষা লোকটার স্পর্ধায় ওরাও শোধ নিতে চায়। মধ্যে কে একজন বলে উঠল আগে ব্যাটা তুমি ওদের দুজনের কাছে ক্ষমা চাও তারপর সকলের কাছে ক্ষমা চাও। বল্ ব্যাটা এ রাস্তা দিয়ে তুই হাঁটবি না তবে ছাড়া হবে। নাড়ুগোপাল মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাইতেই রাজী হয়। উচিত শিক্ষা পেয়ে বাবু নাড়ুগোপাল সেদিনের জন্য পরিত্রাণ পায় বটে কিন্তু এই ঘটনার পর তালপুকুরের ক্ষেতমজুররা সভা করে ঠিক করে যে, নাড়ুগোপালের জমির ধান কাটতে কেউ যাবে না ওর বিরুদ্ধে চলবে ধর্মঘট, বয়কট আন্দোলন।

এদিকে মাঠে পাকা ধান পড়ে নষ্ট হচ্ছে দেখে নাড়ুগোপাল ভিন্ গাঁয়ের কিছু মজুর ভাড়া করে এনে সাতসকালে মাঠে নামাতেই পাড়ার মজুররা দলবেঁধে ভাড়াটে-দের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলতে আর ওর জমির ধান মাঠে পড়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ও প্রকাশ্যে গাঁয়ের সবাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইবে আর আট টাকা মজুরীর দাবী মেনে নেবে পাড়ার গরীব মজুর কিষেণদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে ভাড়াটেরা কাজে নামতে ইতঃস্তত করতে থাকে। তালপুকুরপাড়ের কিষাণরা ভাড়াটেদের কাছে সোজাসুজি বক্তব্য রাখল। একজন যুবা এগিয়ে গিয়ে বলতে থাকে—নাড়ুগোপাল জমিদারবাবুর পেটোয়া। আমাদের পাড়ার মেয়েকে ধর্ষণ করতে গেছলো। অজুহাত ছিল জমির ধানকাটার কিষেণ করা। ওকে আমরা সেইদিন উচিত শিক্ষা দিয়েছি। তবে শিক্ষার যে শেষ নেই ওকে সেটা ভালোভাবে বোঝানোর জন্যে আমরা ওর জমির ধান নিজেরা তো কাটবোই না, তোমাদেরও আমাদের পথে আসতে বলবো। তোমরাও গরীব, আমরাও গরীব। আমরা চাই না তোমাদের সঙ্গে আমাদের লাঠালাঠি হ'ক। তোমরা চলে গেলে তারপর যারা নামবে তাদের আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। এসব ভালো ভালো কথায় কিছুটা কাজ হয়। ভাড়াটেদের অনেকেই কাস্তে কোমরে গুঁজে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে।

কিন্তু নাড়ুগোপাল এতে যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে রাতের ঘটনায় তার যে মান সম্মান বলতে আর কোন বস্তু নেই এটা যত সে উপলব্ধি করছে ততোই যেন প্রতিশোধের ভাবনা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার কিষাণরা একে একে উঠে যেতে থাকলে সে পাড়া থেকে কিছু তরুণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবককে আর জমিদারবাবুর কয়েকজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে ধর্মঘটী মজুরদের যাকে সামনে পেল তার ওপরই

ঝাঁপিয়ে পড়ে। মজুররা প্রথমটা হতচকিত হয়ে পাড়ায় ঢুকে আরও লোকজন নিয়ে এসে নাড়ুগোপালের দলবলকে ঘিরে ফেলে। কমলার নেতৃত্বে পাড়ার মেয়েরাও ছুটে এসেছে। সোম চীৎকার করে বলতে থাকে—"আয় তোরাও আয়, মেয়ে মদ্দা সবাই জোটবাঁধি, আয় তোরাও নেমে আয়।" এর মধ্যে পুলিশ এসে মাঠে নেমে পড়েছে। ঘন ঘন হুইসেল বাজাচ্ছে—মাঠ থেকে সবাইকে চলে যেতে হুকুম দিচ্চে। মজুররা এই অবস্থায় অনাবশ্যক শক্তি ক্ষয় না করে মাঠ থেকে উঠে গেল বটে কিন্তু জমিদারের দুজন নিজস্বলোক, যাদের মধ্যে একজন আবার ইস্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী করে। কে বা কারা আচমকা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রহার করে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। এরা আন্দোলনের লোক নয়। সুযোগ সন্ধানী প্ররোচক।

সংঘর্ষ থেকে সরে আসা মজুরদের সামনে ওদের লড়াইকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দিল শ্যামল রঞ্জিত কমল তপন আরও অনেকে। সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরকম লড়াই এই এলাকায় কখনও ঘটেনি বটে তারজন্য গোটা এলাকা জুড়ে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল।

ঘটনাস্থলে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করল না ঠিকই কিন্তু সেইদিন রাত্রি থেকেই জাল পাতল, নেতাদের গতিবিধির ওপর গোয়েন্দা লাগিয়ে দিল। দুদিনের মধ্যেই রঞ্জিতদের বাড়ী থেকে পুলিশ প্রায় জনা দশেককে, আর তালপুকুরপাড়ের ক্ষেতমজুরদের মধ্যে থেকে প্রায় জনা কুড়িকে তুললো হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি পরিয়ে তুললো প্রিজনভ্যানে। অসতর্কতার জন্যই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ধরা পড়ল রঞ্জিত, কমল, শ্যামল, তপন সবাই। ওরা যে তালপুকুরপাড়ে হাজির হয়ে বক্তৃতা দিয়েছে তা কারুর নজর এড়ায়নি। পুলিশ ঐ সভা থেকে ওদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় সেরাত্রে সকলেই সামনে কলেজের মাঠে ছাত্রদের সোস্যাল ফাংশন দেখে। ফাংশন শেষ হলে ওরা ষ্টেশন বাজার এলাকায় প্রথম আসে, তারপর নিচে বন্ধুর বাড়ীতে বসে কে কোথায় রাত্রের মতো চলে যাবে আলোচনায় বসে। কারণ ওরা যে পুলিশের নজরে আছে এটা বেশ ভালোই বুঝে গেছে। ইতিমধ্যে কানে এসেছে পাশের পাকুয়া বাজার থেকে দলের একজনকে পুলিশ সন্ধ্যার সময় তুলেছে। কমল এটা শুনে মন্তব্য করে—"ভাগাড়ে শকুন একবার যখন পড়েছে, আরও পড়বে। এখানে আমাদের বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়। চল সরে পড়ি।" সবাই যে যার সাইকেলে চড়ল। কিছুদূরে যাওয়ার পরে একটা তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। সাইকেল থেকে

নেমে ঘন অন্ধকারে আবার স্থির করা শুরু হল কে কোথায় রাত কাটাবে। কমল প্রথম বলে—ভাই, আমি বাড়ী চলে যাই। শ্যামল আর রঞ্জিত তোমরা যেখানে যাবে ঠিক করেছো যাও। তপনবাবু আপনি কোথায় যাবেন চলে যান মশাই।

তপন উত্তর করে—আমি কোথায়-যাবো তাতো ঠিক করে রেখেছি। আমি আজ রাত্রে গ্রামেই থাকবো না। কিন্তু আপনি বাড়ীতে থাকলে যদি ধরা পড়েন ?

তপনের কথার সঙ্গে রঞ্জিত যোগ করে—ঠিকই তো, কি দরকার কমলদা, আপনিও বরং আমাদের সঙ্গেই থাকুন।

কমল আপত্তি জানিয়ে বলে—না না ভাই তোমরা আমাকে জোর কোরো না। রঞ্জিতের কথায় সমর্থন জানিয়ে শ্যামল কমলের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধের সুরে বলল—কমলদা আজকের একটা রাত আমরা সবাই একসঙ্গে কাটাই না, কেন বাড়ী যাব, বাড়ী যাব করছেন।

কমলের উত্তর সোজা। সে বলল—তোমাদের আরকী, বিয়ে থা করনি। সমস্যা বুঝবে কোত্থেকে। সব সময় নিজেদের দিয়ে চিন্তা করো।

শ্যামল বলে—ও সব অভিযোগ মাথা পেতে নিয়েই বলছি—আমাদের সকলের পরামর্শ এভাবে উপেক্ষা করা বোধহয় আপনার উচিত হচ্ছে না।

—তার মানে ? তোমরা কি আমার ওপর জোর করছো, ম্যাডেট ?

—হ্যাঁ, বলতে পারেন। কেন দাদা, চলুন তো এখান থেকে। রাত তো অনেক হল। এরপর কথা না বাড়িয়ে চারজনেই যে যার সাইকেলে উঠে পড়ল। শ্যামলের সাইকেল ছিল না। রঞ্জিতের সাইকেলে চেপে বসল।

সেরাত্রে ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন জনৈকা সহৃদয়া বৌদির আশ্রমে গিয়ে উঠল তখন রাত বারোটারও বেশী। বৌদি রাতটা আশ্রয় দিলেন এই শর্তে যে, ভোরবেলা মোরগের ডাক শুরু হলেই উঠে পড়তে হবে, উনি উনুনে চা তৈরী করে দেবেন। তারপর অন্ধকার থাকতে থাকতেই বাড়ী ছাড়তে হবে। সে রাত্রে কারুরই শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঘুম হলো না। কিছুদূরে জি. টি. রোড দিয়ে অবিরাম ভেসে আসা চলন্ত শরীর গর্জন ওদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাল। কেবলই মনে হয় ঐ বুঝি পুলিশের জীপ গ্রামে ঢুকছে। রাত ফুরোবার আগেই শর্ত মেনে বৌদির সযত্নে তৈরী চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ওরা গাঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। এ সময় অতিরিক্ত শীত। কনকনে ঠাণ্ডায় ঘরের বাইরে পা দেওয়া যায় না।

তিনজনে রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক চারদিক ভালো করে তাকিয়ে নিল।

রঞ্জিত একটা ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে চুপিচুপি গলার স্বর খুব নীচু করে বলল—শ্যামল, কমলদা আপনারা এখানে একটু দাঁড়ান, আমি একটু আসছি।

শ্যামলও গলার স্বর নামিয়ে উত্তর দিল—রঞ্জিতদা, হ্যাঁ আপনি আপনার বাড়ীর চারপাশটা বেশ ভালোকরে ওয়াচ্ করে আসুন। তাড়াতাড়ি আসবেন দেরী করবেন না। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাড়াতাড়ি আসছি। তোমরা দাঁড়াও" বলেই দ্রুত পায়ে রঞ্জিত চলে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসে ইসারা করে জানাল—কোন কিছু নেই। বাড়ীর মধ্যে চলে এস। সকলে গিয়ে রঞ্জিতের বাড়ী প্রবেশ করে একেবারে তার নিজের ঘরে পাতা চেয়ারে রঞ্জিত ও শ্যামল আর বিছানায় কমল গিয়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে চাও এসে গেল। রঞ্জিতের বৃদ্ধা মায়ের তৈরী চা কাপভর্তি হয়ে এসে গেছে। চা-পানের মধ্যে মধ্যে ফিসফাস কথাবার্তা। গতরাত্রের অভিজ্ঞতা—রাতটা বৌদির কাছে কেমন কাটল সেসব কথাই শুরু হল। এরই ফাঁকে একটু থেমে শ্যামল বলে—রঞ্জিতদা, একটু চুপ করুন তো, বাইরে কিসের যেন আওয়াজ হচ্ছে। বলতেই কান খাড়া হয়ে উঠল সবার। খসখস আওয়াজ হচ্ছে না শ্যামল বলতেই রঞ্জিত বললো—"না, না, ওতো গরুর খড়ফাড়ার শব্দ।" কথাটা শুনে বিশ্বাস হল না শামলের। ইতিমধ্যে ঘরে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকল তপনের ভাই মলয়। সবাই প্রথমে চমকে উঠেছিল। শ্যামল মলয়কে বললো—"মলয়, ভালো করে বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে এসো তো।" মলয় যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, সেইরকম নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে যেতে শ্যামল গতোক্তি করে "মনে হচ্ছে বুটের আওয়াজ।" কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পুনরায় মলয়ের প্রবেশ, তখন তার মুখের চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। একেবারে ভয়ে ফ্যাকাশে। মলয় সংবাদ দিল গোটা বাড়ীটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। শ্যামল রঞ্জিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে রঞ্জিতদা এখন উপায়? শ্যামলের প্রশ্নের জবাব না দিয়েই চেয়ার ছেড়ে দরজা ঠেলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ওর অবস্থা দেখে শ্যামলও ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। চোখে পড়ল ধানের মরাইয়ের তলা। তাড়াতাড়ি করে তার তলায় কোনোরকমে দুহাতে কোদাল, কুড়ুল ঠেলে সরিয়ে দেহটাকে উপুড় করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। কমল অবস্থা দেখে হতভম্ভ হয়ে রঞ্জিতের বিছানায় যেমন এসে বসেছিল, সেই অবস্থায় বসে রইল। মনে হতে পারে যেন পাথর হয়ে গেছে।

এরমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাইরে থেকে দরজায় কড়ানাড়ার প্রবল শব্দ মাঝে মাঝে গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ সবাইকে চমকে দেয় রঞ্জিতবাবু বাড়ীতে কে আছেন

—রঞ্জিতবাবু আছেন, দরজা খুলুন। দরজা না খুললে ভেঙ্গে ঢুকবো। দরজায় ঘন ঘন বুটের আঘাত কানে আসতে আর থাকতে না পেরে রঞ্জিতের বৃদ্ধা মা দরজার কাছে এসে গলা ছড়িয়ে বল্লেন কে বাইরে ? কি দরকার আপনার রঞ্জিতের সঙ্গে এই ভোরবেলায় । রঞ্জিত বাড়ী নেই। একথার পর ক্ষিপ্ত কণ্ঠের আওয়াজ এ-বাড়ী আমরা সার্চ করবো। আমরা পুলিশের লোক সকাল হয়ে গেছে, এখন দরজা না খুললে দরজা আমরা ভেঙ্গেই ঢুকবো। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধার প্রবল আপত্তি টিকলো না—বুটের ঘায়ে দরজা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দিতেই এক বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে সদরের এক বড পুলিশ কর্তা হন হন করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো।

পুলিশ অফিসার কয়েক মিনিট বাদে যখন নিচে নেমে এলো তখন তার পিছু পিছু নেমে এল মলয়, ব্রজেশ্বর, তারক, সঞ্জয়। ওরাও কলেজে রাত্রে থিয়েটার দেখে ওপরের চিলে কোঠায় শুয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা ঘটবে ভাবেইনি। ওদের একটা জায়গায় সার দিয়ে বসিয়ে হাতে হাতকড়া লাগানো হলো। এরপর দারোগাবাবুর প্রবেশ রান্নাঘরে। হাতে একটা বিরাট টর্চ নিয়ে কোমরের বেল্টে বাঁধা পিস্তলটার দিকে একবার তাকালেন। সবঠিক আছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে চারদিকে টর্চ ফেলে কিছু লক্ষ্য করা গেল না। কিন্তু ঘরের মধ্যে মাচায় যেখানে ঘুঁটে ভর্তি সেখানে টর্চ ফেলতেই কে যেন নড়েচড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবুর জলদ গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ—এ্যাই মাচার ওপর কে, নেমে আসুন, নেমে আসুন বলছি। হুঙ্কারেই কাজ হয়ে গেল। ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল স্বয়ং রঞ্জিত। আর গায়ে মাকড়সার জালে ঝুলে ভর্তি, মুখখানা ময়লা ভর্তি। রঞ্জিত লাফ দিয়ে মাটিতে পা দিতেই দারোগাবাবু সভয়ে দুপা পিছিয়ে এলেন। রঞ্জিতকে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নাম রঞ্জিতবাবু ? রঞ্জিত ঘাড নাডতেই বলে—আসুন, আসুন, বসুন এখানে, বলে অন্যদের সঙ্গে একসারিতে বসিয়ে দিল। তারপর সকলকে উদ্দেশ্য করে একবার বলে উঠে—আরে মশাই, এত ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন ? ব্রিটিশ আমলে যারা স্বাধীনতার জন্য লডাই করেছে তারা এখনকার থেকে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করেছে, অনেক বেশী সময় জেল খেটেছে। দারোগাবাবু কথা বলছে, হঠাৎ তার চোখ পডল মরাইয়ের তলায়। একটা মানুষের পা চোখে পডতেই লাফ দিয়ে ছুটে গেল। তারপর বজ্রহুঙ্কার করে ওঠে—"এ্যাই কে মরাইয়ের তলায় ? বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন বলছি।" ধুলোমেখে সাধুর বেশে শ্যামল বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই দারোগাবাবু লাফিয়ে ওঠে। আনন্দে গদগদভাবে চক্ষুদুটো

উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শ্যামলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো—উফ্, আপনাকে খুঁজতেমশাই আপনার গ্রামে দুদিন গেছলাম। বেকার ছুটিয়েছেন মশাই। থাক, আর তো যেতে হল না। আসুন, দয়া করে রঞ্জিতবাবুর পাশে বসুন। এরপর দারোগাবাবু ঢোকে রঞ্জিতের শোবার ঘরে। খাটের ওপর ঠাঁয় পাথরের মতো বসে থাকা কমলের পরিচয় জানতে চায়। কমল নিজের নাম বলতে দারোগাবাবু নিজের হাতের লিষ্টের সঙ্গে কমলের নাম ও ঠিকানা দেখে নেয়। কিন্তু নাম না পাওয়ায় মুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করে কোথায় বাড়ী আপনার?

ধীর কণ্ঠে কমলবাবু উত্তর দেয়—কোরপাই।

দারোগাবাবুর ফের জিজ্ঞাসা—কোরপাই তো এখানে কেন?

কমলবাবু উত্তর করে—গতরাত্রে কলেজে ফাংশন শুনছিলাম। রাত হয়ে গেছলো বলে রঞ্জিত বললো—রাতটা তার বাড়ীতে থেকে যেতে। তাই। দারোগা এরপর আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বুটের আওয়াজ করে বেরিয়ে আসে যেখানে রঞ্জিত, শ্যামলরা গ্রেফতার হয়ে সার দিয়ে বসেছিল। দারোগার হুকুমে এবার ওদের কোমরে দড়ি পড়লো আর প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া। দু-তিন জন সেপাই মিলে কয়েকমিনিটের মধ্যে একাজ সেরে ফেললো।

তালপুকুরের কাছাকাছি যে মাঠে জমিদারের লোকজনদের সঙ্গে কিষাণদের সংঘর্ষ হয়েছিল তারই কাছাকাছি একটা ইস্কুলের মাঠে অপেক্ষমান পুলিশ ভ্যানে সকলকে তোলা হল। কমলবাবু ও আরও অনেকে পিছু পিছু সমস্ত পথটাই এসেছে সমানে মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে তুলে ধরে। জমিদার-পুলিশী আঁতাত ধ্বংস হ'ক, "দমন পীড়ন করে কৃষক আন্দোলন রুদ্ধ করা যায় না যাবে না"—আওয়াজে দশদিক তখন মুখরিত। ভ্যানের মধ্যে সবার আগেই পোরা হয়েছে তালপুকুরের বাসিন্দা ক্ষেতমজুর সোম, শ্যাম, মোহন, কচি এদের। রঞ্জিতের অনুরোধে মুক্ত কমল এক প্যাকেট সিগারেট খাঁচার মধ্যে যেই পুরে দিতে যাবে সেই পুলিশ অফিসারটি দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে কড়া ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার নাম?

কমল দুপা সরে এসে একটু বিরক্তভাবেই উত্তর করে—কতবার বলবো? আমার নাম কমল দাঁ।

অফিসারের এবার নতুন মূর্তি। নাম শুনেই বল্লেন—আপনার নামেও তো গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে। তারপর সেন্ট্রিকে গুরুগম্ভীর মেজাজে হাঁক দিয়ে হুকুম করলেন—এ্যাই, ভ্যানের ডালাটা খোল্। এটিকেও ঢোকা। এ ধরনের ব্যবহারে কমল মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পাক চক্রে ফেলে তাকেও শেষ

পর্যন্ত খাঁচায় পোরা হল। জেল থেকে সেই কমল দা আর শ্যামল একই দিনে সবার শেষে মুক্তি পায়। শ্যামলকে কোর্ট থেকে জামীন করিয়ে বের করে আনতে সন্দীপ সারাদিন না খেয়ে কোর্টে পড়ে রইলো। জামীনের ফিটু করিয়ে লকআপ থেকে শ্যামলকে বার করে আনতে পেরে সন্দীপ সেদিন খুশীতে ডগমগ। লকআপ মুক্ত হয়ে দুজনে দুজনকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে। এ বুঝি সহযোদ্ধার প্রেম!

সন্দীপ, শ্যামল তাদের সঙ্গীদের নিয়ে কোর্ট সংলগ্ন বটগাছের নিচে একটা চায়ের দোকানে ভাঁড়ে চায়ের অর্ডার দিল। গরম চায়ে চুমুক দিতেই সন্দীপ লাফিয়ে ওঠে—ওঃ কি গরম রে বাবা। শ্যামলেরও একই অবস্থা। চা-পান শেষ করে ওরা সকলে বাসের জন্য তাড়াতাড়ি করতে টেবিলে ভাঁড়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সন্দীপ—বাঃ, গল্প করতে করতে সকলে চায়ের খালি ভাঁড়গুলো ফেলে যাচ্ছ। ওগুলো আমাদের ফেলে দেওয়া উচিত। কারণ এর পর যারা বসবে তারা আমাদের নিন্দে করবে। সকলেই যেন একটু লজ্জিত হয়ে যে যার চায়ের ভাঁড়গুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বাসে সন্দীপ আর শ্যামল পাশাপাশি বসে। ওরা দুজনে ধীরে কথা বলছিল। পাশে বসা লোকটিও শুনতে পাচ্ছিল না। সন্দীপ জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা শ্যামল, তালপুকুরের এই এতবড় ঘটনাটা তুমি কিভাবে চিন্তা করছো?

শ্যামল উত্তর দেয়—এই ঘটনা এই এলাকায় দারুন প্রভাব ফেলবে। জমিদার-বাবুদের এরপর আর গরীব লোকেরা মানতে চাইবে না।

—কিন্তু এতগুলো লোক যে জেলে ঢুকলো, মামলায় জড়ালো—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্যামল বলে—গরীবদের মনোবল এরপর আরও বেড়ে যাবে। এরপর জেলের ভয়ও আর থাকবে না। তাছাড়া এখনও গরীবদের অনেকে জমিদারবাবুকে হয়তো 'রাজাবাবু' বলে ডাকে, মোহও আছে। জমিদারের সঙ্গে পুলিশের যৌথ অত্যাচার ওদের সে মোহভঙ্গ ঘটাবে।

—কিন্তু তোমরা নেতৃস্থানীয়রা এভাবে ধরা পড়লে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্যামলের পক্ষে একা দেওয়া খুবই শক্ত। কারণ ব্যাপারটা তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাই সে নীরব রইলো।

—কি হল? বল? বল, চুপ করে রইলে কেন? এভাবে ধরা পড়ছো বলে অনেকে সমালোচনা করছে।

শ্যামল এবার ছোট্ট করে উত্তর দেয়—তাদের সমালোচনা কোন্‌দিকে জানি না। তবে যেভাবে সবাই বেমক্কা ধরা পড়লাম, সেটা খুবই বোকার মতো কাজের

জন্ম হয়েছে। ভবিষ্যতে আমাদের এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে—অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। বাস থেকে নেমে ট্রেনে চড়ে ওদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কমল দায়ের। কমলবাবু জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন আজই সন্ধ্যের সময়। কমলকে সবাই অভিনন্দন জানাল। ট্রেনের কামরার মধ্যে গলা জড়াজড়ি করে ওরা গান ধরলো—"আমরা গান গাই, প্রাণে প্রাণ মিলাই, এসো আজ বাঁধি প্রাণ একসাথে"। যাত্রীরা সবাই উৎসুক হয়ে কান খাড়া করে এই তাজা প্রাণগুলোর দিকে ঠায় তাকিয়ে।

গোটা রাজ্যের ওপর দিয়ে ভূমিকম্প আর প্রবল ঝড় বয়ে গেল। নির্বাচনী ঝড়ের দাপটে জমিদার কৃষ্ণদাস চৌধুরী একেবারে কুপোকাৎ। উনি নেহেরুকন্যার ইন্দিরার গড়া নতুন দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। হেরেছেন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থীর কাছে। ভোটের পর মাধুরী প্রশ্ন করেছিল শ্যামলের কাছে—শ্যামলদা, যে সরকার এবার ক্ষমতায় আসছে তাতে তারা চাষা-মজুর 'ছোটো লোক'দের হয়ে কথা বলবে—কৃষ্ণদাস চৌধুরীরা তো চুপচাপ থাকবে না। শ্যামল উত্তর দেয়—সে তো খুবই স্বাভাবিক মাধুরী। ষড়যন্ত্রকারীরা চুপ করে বসে থাকবে না। কংগ্রেস দলের কর্মীদের কাজ কি? জনসাধারণের ভালোমন্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই কাজতো দলের চাই। ষড়যন্ত্র করাটাই হলো সেই দলীয় কাজের অঙ্গ। এ ব্যাপারে জনসাধারণের ভূমিকা খুবই সক্রিয় আর সচেতন থাকার দরকার। আমরা উদাসীন থাকলে বিরাট ভুল করবো।

মাধুরী তার প্রশ্নের জবাব পেয়েছে বলেই মনে হল। আজ বিজয় মিছিল বের হবে। তাতে যোগ দিতে হবে। এসব মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করলো—শ্যামলদা, আজ যে বিজয় মিছিল বের হওয়ার কথা। সেটা কখন শুরু হবে, কোত্থেকে বের হবে।

শ্যামল তৎক্ষণাৎ হাত ঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য করে স্মরণ করিয়ে দেয়—আর এক ঘণ্টার মধ্যেই বের হবে। চলো বের হওয়া যাক্। শোনা যাচ্ছে মিছিল খুব বিরাট হবে।

সকলের মুখে এক কথা। বিশাল মিছিল। আর মিছিল কি সুশৃঙ্খল, সুন্দর। রাস্তার ধুলো মাথায় উঠছে। মিছিলের সামনে একটা লরী। তার মাথায় এক

ডজন লাল পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। চালকলের জন্য কয়েক শ্রমিক লরীর মাথাটা চেপে ধরে পতাকার পাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দূরে লক্ষ্য করছে। তাদের সঙ্গে আছেন দুজন মধ্যবিত্ত যুবা। সকলে মিলে জোর গলায় গান ধরেছে—

"সংগ্রাম শুরু আজ দিকে দিকে শোনো আহ্বান।

পথে পথে মিছিলে চলো কাঁধ মিলিয়ে মজুর-কিষাণ।"

মিছিলের পদভারে মাটি কাঁপছে। বাজি, পটকা ফাটছে। মাথায় লাল আবির মেখে ওরা মাতোয়ারা। যত এগোচ্ছে, মিছিল ততই বড় হচ্ছে। শিশু কোলে ক্ষেতের কিষাণী মাঠে যাচ্ছিল। তার আর আজ মাঠে যাওয়া হল না। হাতের হাত মুঠো করে চেপে ধরে সাত তাড়াতাড়ি লাইনে ঢুকে পড়লো। ঐরা মাঠে থাকবে কেন? কানে পৌঁছয়নি আজকের মিছিলের কথা। তা না হলে অনেক মেয়েকেও মিছিলে আনতে পারতো।

প্রভাতী সংবাদপত্রে বের হল রাজ্যের নতুন ধরনের সরকার গঠিত হওয়ার সংবাদ। এ সরকার জনগণের ওপর ভরসা করবে। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আগের সরকার যে কয়েক হাজার মামলা করেছিল তা প্রত্যাহার করে নেবে। বিনাবিচারে আটক সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটাবে। জমিদার-জোতদারদের বাড়তি ও বেনামী লুকোনো জমি উদ্ধার করবে। আর সে-সব জমি ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করবে। গতরে খাটা মানুষগুলো একটু হাফ ছেড়ে বাঁচবে। নতুন করে লড়াই শুরুর আগে গাছতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে গাঁয়ের গরীবরা নিতে পারবে।

তালপুকুরের পাড়ার মধ্যে রাতের বেলায় চিমনী জ্বেলে আর চ্যাটাই পেতে গানের মধ্যে আসর বসেছে। একজন ঢোল বাজাচ্ছে, আর একজনের হাতে বাজছে ঝুমচাক। একজন গাইছে আর সকলে শুনছে। গানের সুরে ভেসে আসছে "এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে সোনালী নয়তো রক্তে রঙিন ধান, দেখবে সকলে জ্বলছে সেখানে দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ। হয় ধান, নয় প্রাণ। এ শব্দে সারা দেশ দিশাহারা।" তেজপুর থেকে তালপুকুরে উঠে আসা আদিবাসী ঈশ্বর মুর্মু, বিজয় হাঁসদা, সোম বাস্কে, দয়াল হেম্বরম, বসন টুডু, সবাই গোল হয়ে কান খাড়া করে গানের আসরে জমে বসেছে। তেজপুরে ওরা বছরের পর বছর ধরে লড়াই চালিয়েছে মস্তবড় জমিদার সুদখোর আনোয়ার মোল্লার বিরুদ্ধে। ওদের সে লড়াইয়ে কাহিনী আজ স্থানীয় লোকের মুখে মুখে। বল্গাহীন অত্যাচারের

প্রশান্ত-

মুখে ওরা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে না পেরে তালপুকুরের পাড়ে এসে উঠেছে।

তেজপুরের দুচার কথা বলা যাক। এ গাঁয়ের মস্ত বড় জমিদার জোতদার আনোয়ার মোল্লার এই মৌজাতেই আড়াইশ' বিঘা শুধু চাষের জমি আছে। চব্বিশ পরগণার মাতলাতেও আছে প্রায় শ'তিনেক বিঘা। এতো জমি তবু সাধ মিটছে না, প্রায়ই শোনা যায় আনোয়ার মোল্লা জমি কিনছে। গাঁয়ের আর এক মস্ত জোতদার শ্রীনিবাস সরকারের সঙ্গে মোল্লার দোস্তী খুব। যেন মাসতুতো ভাই। দুজনেই গলাকাটা সুদে টাকা খাটায়, একেবারে পুরোদস্ত চামার। কে অভাবে পড়ে জমি বেচবে, তার সন্ধানে ওরা দুজনে ঘুরে বেড়ায়।

এ গাঁ খানি তখন চারদিকে ঘন বনজঙ্গলে ঘেরা ছিল। বিরাট বিরাট শাল, বট, ঝাউ গাছের মধ্যে কাঁটা গাছের ঝোপ। এখানে আগে বাঘ বাস করতো। দিনের বেলায় বাঘ ছিটকে ভিন গাঁয়ে গিয়ে চাষীদের হাতে মারা পড়েছে। সড়কি, বল্লমের খোঁচায় বনের এক পশু প্রাণ দিয়েছে।

কালক্রমে পশু জমিদারদের সঙ্গে মানুষ জমিদারের বাধল লড়াই। শ্রীনিবাস-আনোয়ারেরা বনজঙ্গল সাফ করার কর্মসূচীতে মেতে উঠল। পরিকল্পনা করলো দুমকা থেকে আদিবাসী আনার। বাঘে মানুষে লড়াইয়ে দুমকার লোকেরা হবে জমিদার পক্ষে। ওদের দিয়ে বনজঙ্গল কাটানোর কাজ চলবে, ওরা বাঘের সঙ্গে লড়াই করবে। বনজঙ্গল সাফ করার পর বসবাস করার মানুষ চাই। কাজেই এখানে ওদেরই কুঁড়েঘর তৈরী করতে বলা হল। ওরা বউ নিয়ে এল। সংসার পেতে বসল। বউ ছেলে পুলে নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাই করে নিল নিজেরাই। জমিদার দিল শুধু তার জমিতে বাস করার অনুমতি। এই দুই জমিদারের বাড়ীতে সপ্তাহে এদের পালা করে বেগার খেটে আসতে হত। বাস্তুভিটেয় ওরা লাউ, কলা, উচ্ছে এসব শাকশব্জী ফলিয়ে একদিকে যেমন নিজেদের তরকারীর ব্যবস্থা করতো, অন্যদিকে হাটে-বাজারে ঝুড়িভর্তি করে নিয়ে গিয়ে বসে দুপয়সা রোজগারও করতো। জমিদারের চোখে পড়তেই দুপয়সা আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেল। ওদেরকে সাফ বলে দেওয়া হল প্রতিদিন পালা করে দুই জমিদারের বাড়ী তরকারীর ভেট পাঠাতে হবে। ভেট দিতে অস্বীকার করলে বা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিবার ভেট পাঠাতে ভুলে গেল সে পরিবারের কপালে জুটতো অশেষ লাঞ্ছনা। জমিদার লেঠেল, পাইক পাঠিয়ে কখনও বা সশরীরে সপারিষদ নিজেই উপস্থিত হয়ে ফসল লুঠ করতো। গাছ কেটে ফেলে দিয়ে তার ফসল তুলে নিয়ে যেতো। যাবার সময় হুকুম তালিম না হওয়ার জন্য বাড়ীর লোকেদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হত।

যুবতীকন্যা বা স্ত্রীও লুঠ হয়ে গেছে এমনও বিরল নয়। লোকে বলে শ্রীনিবাস সরকারের প্রাসাদের মধ্যে একটা লাশ ঘর আছে। ঐ লাশ ঘরের পাশে ফাঁকা মাঠ। তারপর পায়ে চলার একটা পথ আছে। পথ চলতি পথিক কান পাতলে কেমন একটা পচা গন্ধ ও গোঙানী শব্দ শুনতে পায়। খাজনা সময় মতো না মিটিয়ে দেওয়া, অবাধ্যতা, কোন মহিলা জোর করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তাকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে লাশ ঘরে ফেলে রাখা হত। লাশ পচে পচে শুকিয়ে যেতো ঘরের মধ্যেই। একদিন শ্রীনিবাস সরকারের ইচ্ছা হল বাড়ীর কাছে ফুলের ও দামী গাছের বাগান করবে। শহরের নার্শারী থেকে বোগেন ভোলিয়া, ইউক্যালিপটাসের চারা আনবে আদিবাসীরা যে পাড়ায় বাস করছে ঐ জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে বাগান করার ভালো উপযুক্ত জায়গা। যারা বসে আছে তাদের বিতাড়িত না করলে ঐ জায়গার দখল পাওয়াও শক্ত। শ্রীনিবাস পরামর্শে বসে তার সাঙ্গাত আনোয়ার মোল্লার সঙ্গে। আনোয়ার মোল্লার বন্ধু শ্রীনিবাসের ইচ্ছাও সমস্যার কথা শুনে এক গাল হেসে ঘাড় দুলিয়ে উত্তর দিল—এ আর এমন কি সমস্যা ভাই। তুমি এতো ভাবছো দেখে আবার আমার হাসি পাচ্ছে। এখন তো বাঘ নেই তেজপুরে। সাঁওতালগুলোকে বেকায়দায় ফেলো। দেখবে ল্যাজ তুলে ব্যাটারা পালাবে। মামলা-মোকর্দমায় জড়িয়ে দাও আর ওদের কাউকে পাকড়াও করে ওদের মধ্যেই বোভার ভয় ছড়িয়ে দাও। শ্রীনিবাস বন্ধুর পরামর্শ মন দিয়ে শুনলো বটে, কিন্তু কার্যকরী করতে বন্ধু কতখানি বন্ধুর প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেবে মনে মনে সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলো।

শরতের নির্মল আকাশের তলায় পড়ন্ত বেলায় তেজপুরের আদিবাসী মেয়েরা উঠোনে চ্যাটাই পেতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিজয়ের বৌ মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটোনোর উনুনে তুষের জ্বাল দিচ্ছে। তার সঙ্গে গুঁজে দিচ্ছে কাঠ, উলঙ্গ বাচ্চা শিশুটা চ্যাটাইয়ে বসে খেলা করছে। মাঝে মাঝে মায়ের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। মা আবার ধরে এনে চ্যাটাইয়ে বসিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঘরের বারান্দায় বসে নাতির খেলা দেখছে। একটা খুঁটি ধরে বসে কোটরগত চোখ বার করে বৌকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে, রোজের ট্যাকা পেয়েছিস্ ?

বৌ শিশুর মুখে স্তন পুরতে পুরতে উত্তর দিল—আমি তো আজ পাই নাই। কাল দেবে বলেছে।

—তবে চাল কিনলি কোত্থেকে ?

—ধার করে এনেছি।

—বিজয় কোথায় গ্যাছে জানিস্ ?

ঘাড় নেড়ে বৌ জানিয়ে দিল যে—সে জানে না। উনুনের আগুনে চেলা কাঠটা ঠেলতে ঠেলতে বলে চলে—"রোদ্দুর না উঠতেই সে বেরিয়ে গ্যাছে। চৌপোরাত ঘুমোয়নি। আমি শুধুতে বল্লে—বউ, পেটের মধ্যে যন্ত্রণা। শাশুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—পেটের মধ্যে যন্ত্রণা তো কাজে যেতে দিলী ? বউ উত্তর দেয়—আমিতো বল্লুম তা'লে তুমি আজ কাজে যেওনি। উ শুনলো আমার কথা ? আমাকে উত্তর দিল—কাজ কামাই দিলে তোরা খাবি কি ? আমি বল্লুম কেন আমিও তো মুনিষ খাটি।" ইতিমধ্যে কোলের শিশু স্তন থেকে দুধ না পেয়েই সম্ভবতঃ কান্না জুড়ে দিয়েছে। ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শিশুকে নিয়ে বউ ঘরের বাইরে রাস্তার গিয়ে দাঁড়ায় শিশুকে কোলে নিয়েই নাচাতে থাকে।

মুসলমান পাড়ার মেয়েদের নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাধুরী শ্যামলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আলোচনায় বসেছিল। শ্যামল দলের সম্পাদক। কাজেই তাকে ওয়াকিবহাল করা বিশেষ প্রয়োজন। গরীব শ্রেণীর ঘরের মেয়েরা সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঘৃণ্য শিকার—সে কথাই নানাভাবে মাধুরী রিপোর্ট করছিল। পর্দানসীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরাও সেদিন মহিলা সমিতির ডাকে কলুপাডার খয়রুনের বাড়ীর উঠোনে সমবেত হয়ে সমিতির কথা নিশব্দে হজম করে গেছে।

মাধুরী বলে—একটা রিস্ক্ নিয়েছিলাম আমরা সেদিন। খয়রুন্নেষা বেগমকে 'তালাক' দেওয়া নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা কিভাবে সমিতি মোকাবিলা করবে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পুরুষেরা কেউ কেউ প্রচারে মেতেছিল মহিলা সমিতি নাকি মুসলমাস ঘরের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। ধর্মের ওপর আঘাত হানছে। আমরাও পাল্টা প্রচাবে নামলাম।

শ্যামল খুব আগ্রহ নিয়েই সব শুনছিল। মাধুরী বলে যায়—আমরা বলতে লাগলাম এসব অপপ্রচার। আমরা মোটেই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু এই যে 'তালাক' প্রথার যন্ত্রে খয়রুনের মতো নিরপরাধ মেয়েরা বলি হচ্ছে তার অবসান তো ঘটাতেই হবে। আমরা বাড়ী বাড়ী গেছি। খয়রুনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছি মানুষকে। মুসমলমান ঘরের অনেক মেয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে।

—পুরুষেরা কি বলে ?

—কিছু যুবক উৎসাহ ভরে আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে।

—তাহলে তো হাওয়া অনুকূলে ?

—তেড়েফুঁড়ে নেমে পড়ার পর হাওয়া বেশ কিছুটা পক্ষে।

শ্যামল সাবধান করে দেয়—এই দাওয়াই সব কিছু না বুঝে প্রয়োগ কোরো না। দারুন 'টাচি' ব্যাপার।

—কিন্তু জাত ধর্মের নামে এতো বাড়াবাড়ি !

—তবু এদেশেই কবি নজরুল জন্মেছিলেন।

—কবির কবিতাগুলো যারা মুখস্থ করে প্রকাশ্যে আবৃত্তি করে তারাও যে নিজেকে প্রবঞ্চিত করে। যাইহোক, তারপর খয়রুনের উঠোনের মিটিংয়ে কি স্থির হল ?

—স্থির হল তাকে যে তালাক দিয়েছে মহিলাসমিতি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। খয়রুনকে বিনা কারণে 'তালাক' দেওয়া হয়েছে। ওর স্বামী আর এক মেয়ের প্রেমিক সেজেছে। সমিতিতে সভায় আলোচনা হয়। এখনই খয়রুনকে বাড়ী নিয়ে যেতে বলা হল।

শ্যামল প্রশ্ন করল—ওর স্বামীকে কোথায় পেলে ?

হাসতে হাসতে মাধুরী উত্তর দেয়—স্বামী পুঙ্গব ভয়ে একটা চায়ের দোকানে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে 'ধরে আনা' হয়েছে।

—ধরে এনেছো ? দল বেঁধে না—

—না না দল বেঁধেই যাওয়া হয়েছিল, আমাদের দলের সঙ্গেই সে আসে।

—একেবারে সুবোধ বালকের মতো ?

—মোটেই না। চিল চেঁচাতে আরম্ভ করেছিল। আমরাও—

—মানে, তোমরা—

—তাছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—পাড়ার লোক ?

বেশ একটু গৌরবের ভঙ্গীতেই মাধুরী বর্ণনা করে চলল কিভাবে শেষ পর্যন্ত খয়রুনের স্বামী খয়রুনকে হাত ধরে নিয়ে গেল সেসব কাহিনী। মাধুরীর কথায় এটা বোঝা গেল খয়রুনকে সেই রাতেই ঘরে আবার নিয়ে না গেলে পাড়ার মেয়েরাও একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটাতো। কেন না একবার বিচ্ছেদ ঘটে গেলে আবার তা জোড়া দিতে স্বাভাবিক যে পদ্ধতি চালু আছে তা যে কোন মেয়ের কাছেই চিন্তা করাও অসম্মানজনক।

শ্যামল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনার আদ্যোপান্ত আরও কিছু জেনে নিয়ে অন্যপ্রসঙ্গে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রসঙ্গান্তর টেনে বলে—সবই ঠিক আছে। তবে আরও

অনেক গাঁয়ে মেয়েরা অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলন করছে। সেগুলো মূলতঃ মেয়েদের মজুরী নিয়ে। যেমন, তেজপুর, চিতলগাঁ, শামুকপোঁতা, উদাসপুর এসব গাঁয়ে খেতমজুর মেয়েরা জনমজুরী দাবী নিয়ে যেভাবে লড়ছে তার তুলনা নেই। এদিকটা যেন অবহেলা করা না হয়।

ওদের কথাবার্তার মাঝে প্রবেশ করেন চিন্ময়ী দেবী। ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস। বাড়ীতেও ঠিক তাই। ওঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সবাই অদ্ভুতভাবে নীরব হয়ে গেল। নিশ্চুপভাবে ঢুকে চিন্ময়ী দেবী সমস্ত ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। শ্যামলকে ঘরের মধ্যে দেখে তাঁর কাছে এসে বসতে বল্লেন। পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। শ্যামলের চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—সে সম্বন্ধে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করে বল্লেন—"কোথায় দিনরাত ঘোরাঘুরি করিস্ নিজের শরীরটার ওপর লক্ষ্য রাখ্।" তারপর মাধুরীকে এক ধমক দিয়ে বলেন—"কিরে, বকবক করছিস, শ্যামলকে খেতে দিয়েছিস্ কিছু? কিরে শ্যামল, চেয়ে খেতে পারিস্ না। হ্যাঁ, শোন্ তুই আমার বাড়ীতে এখন থেকে থাকবি। কোথাও যাবি না। হ্যাঁ আমায় না বলে কোথাও যাবি না, বুঝলি।" এসব নির্দেশ দিয়ে চিন্ময়ী দেবী শ্যামলের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। শিশুর মতো শ্যামল চিন্ময়ী দেবীকে জড়িয়ে ধরে।

চিন্ময়ী দেবী জানতে চান শ্যামল মাকে দেখেছে কিনা। সে যখন এক থেকে দেড় বছরের শিশু তখন মা মারা যান। শিশুর তখন ঘনঘন 'তরকা' হত। মাও প্রকৃতপক্ষে অনাহারে, অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তায় মারা গেছেন। শ্যামল প্রত্যুত্তরে বলে—"ওসব আলোচনা ছেড়ে দিন।"

পাশ থেকে মল্লিকা ফোঁস করে ওঠে—তুমি মা উলুবনে মুক্ত ছড়াচ্ছো।

কদিন থেকেই কলেজের পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাময়। একদল ছাত্র কলেজের সেক্রেটারী স্থানীয় জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলো। খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে সেখানে। আর এসব খবর চারদিকে ছড়িয়েছে। আলোচনা হচ্ছিল সেক্রেটারীর বাড়ীতে। হোষ্টেলের একজন ছাত্র বিনীতভাবে জানতে চায়—আমাদের হোষ্টেল নতুন। মাত্র দুবছর হল তার বয়স। এরমধ্যে দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। ঘরে ঘরে জল পড়ছে।

সেক্রেটারী উত্তর করেন—"ব্যাপারটা দেখবো, তবে আমার কি করার আছে জানি না।"

ছাত্রটি আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—সে কি, আপনিই তো ঐ বিল্ডিং তৈরীর

কনট্রাকটর ছিলেন।

আর একজন কথার পিঠে কথা ছোঁড়ে—সবচেয়ে ভালো উত্তর তো পাবো আপনার কাছ হতে।

সেক্রেটারী বলেন—এসবের সবকিছু জানতেন প্রিন্সিপ্যাল। তিনি তো—আপনারা জানেনই সব কিছু।

ক্ষণিক উত্তেজিত হয়ে একজন ছাত্র বলে—প্রিন্সিপ্যাল সম্বন্ধে আপনি বোধহয় কিছু না বললেই ভালো হয়।

সামান্য চিন্তা করে সেক্রেটারী বললেন—কিন্তু তিনি তো হিসেব ঠিকমতো দেখাতে পারেননি বলেই 'সুইসাইড' করেছেন। আপনারা এসব জানুন।

ছাত্ররা সবাই মিলে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ওদের সঙ্গে শ্যামলও ছিল। সবাইকে শান্ত হতে বলে, সেইই গম্ভীর গলায় শেষ জবাব করে—এসব মিথ্যা অপপ্রচার। আমরা সবই জানি। একটা শিশু ট্রেনের তলায় চাপা পড়ছিল তাকে বাঁচাতে গিয়েই তিনি চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়েন। আপনি যা সব উক্তি করছেন, এরপর আর আপনার সঙ্গে আলোচনা দীর্ঘ করলেও ফল কিছু হবে না। পরে আপনার সঙ্গে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। জমিদার বাড়ী ছেড়ে ওরা এরপর রাস্তায় নেমে আসে।

সেদিন সকাল সাড়ে আটটার সময় প্রিন্সিপ্যাল ধীর পদক্ষেপে কলেজের দিক থেকে একটা ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে উত্তরে যাচ্ছিলেন। রেললাইনের ওপর পাঁচবছরের অর্ধ উলঙ্গ এক শিশু চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকাচ্ছিল। শিশুটির সামনে ডোমপাড়ায় বাড়ী। আপের দিক থেকে দ্রুতগামী বারৌনী এক্সপ্রেস প্রায় ষ্টেশনে ঢুকে পড়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সত্যেনবাবু এক মুহূর্ত দেরী না করে শিশুটিকে লাইন থেকে সরিয়ে আনার জন্য ছুটলেন। শিশুকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে ছুঁড়ে দিলেন লাইনের বাইরে। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল তাঁর দেহের টুকরোগুলো। ফতুয়া, কাপড় যা সব তাঁর পরিধানে ছিল কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। লেভেলক্রসিং-এর ওপর একটা পা খণ্ড বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েছিল। লাইনের পাশে মাংসের একটা দলা পিণ্ড। প্রায় আধমাইল দূরে পাওয়া গেল দ্বিতীয় পা। অনেক চেষ্টা করে তার মাথার খুলিটা ফেটে চৌচির অবস্থায় কিছুদূরে লাইনের পাশে একটা গর্তের মধ্যে মিলল। অন্ততঃ এক মাইল লাইন আর পাথর মানুষের রক্তে ভিজে গেল।

ঘটনার আচম্বিতে বিহ্বল মানুষ চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। চীৎকার আর কান্নার আওয়াজে চতুর্দিক ভারী হয়ে ওঠে। শত সহস্র গুণমুগ্ধ সাধারণ মানুষ। ছাত্র-ছাত্রীর বিক্ষোভ আর ভিড়ে সেদিন সারাদিন আর ঐ লাইনে ট্রেন চলেনি।

আত্মদানের এমন নজীর সচরাচর দেখা যায় না। আর সেই অমর মহান আত্মদানের ঘটনাকেই কলেজের কর্তাব্যক্তিরা কালিমালিপ্ত করছেন দেখে ছাত্ররা খুব সঙ্গত কারণেই সেদিন উত্তেজিত হয়েছিল। রাজ্যের প্রতিটি প্রভাতী সংবাদ পত্র পরদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মহান আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানায়। অকৃতদার প্রিন্সিপ্যাল জমিদার চৌধুরীদের শোষণ-তোষণ নীতি কখনই সমর্থন করতেন না।

দেশে নির্বাচনের হাওয়া এসেছে। মাত্র মাস তিনেক পরেই সাধারণ নির্বাচন। জনগণ তাঁদের আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। এবার এখান থেকে দাঁড়িয়েছেন এই কলেজেরই গর্ভনিং বডির সেক্রেটারীর দাদা। গর্ভনিং বডির প্রেসিডেন্ট জমিদার শশাঙ্কশেখর চৌধুরী।

শশাঙ্কবাবু প্রিন্সিপ্যাল সত্যেনবাবুকে একদিন সরাসরি তাঁর হয়ে ভোটের প্রচার জন্য অনুরোধ জানালেন—সত্যেনবাবু, চারদিকে আপনার তো প্রচুর নাম ডাক। কলেজের আপনি দীর্ঘদিনের প্রিন্সিপ্যাল। আমার হয়ে এক আধদিন যদি আপনার ছাত্রদের কাছে আবেদন করেন—সত্যেনবাবু রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন জনসভায় গেলেন না। এতেই চৌধুরীরা রাগে ফেটে পড়ল।

সত্যেনবাবু থাকতেন তাঁর দাদা বিপিনবাবুর সংসারে। তিনি ছাপোষা মানুষ, হাই ইস্কুলের হেডমাস্টার। শ্যামল সরাসরি বিপিনবাবুর ছাত্র। মহান আত্মদানের ঘটনার পর শ্যামল বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যায়। বাইরের ঘরে বৃদ্ধ একা বসে। চোখের জল মুচছেন। খোলা দরজার সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করছে। দুচোখ গড়িয়ে জল ঝরে পড়ছে। শ্যামলকে দেখে চোখের জল মুছে ওকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ। বিপিনবাবুই প্রথম নীরবতা ভাঙলেন। শ্যামলের কথা বলার আগে নিজেই বল্লেন—শ্যামল, আমি আর হয়তো বাঁচবো না। তুমি চিন্তা করতে পারো শ্যামল ওরা' আমার ভাইয়ের পাশবইটা পর্যন্ত আটকেছে। আর প্রচার করছে কিনা ভাই আমার 'সুইসাইড' করেছে। এতবড় জঘন্য অপপ্রচার! যে মানুষ একটা প্রতিষ্ঠানকে নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতো, যার নিজের দিকে

তাকাবার কোনো ফুরসত ছিল না, ছাত্রদের পড়াশুনা নিয়েই যে দিবারাত্র চিন্তা করতো সেই মানুষের প্রয়োজন ওদের কাছে ফুরিয়ে গেল।

সত্যেনবাবু মারা যাওয়ার ঠিক একমাসের মধ্যে বিপিনবাবু এক রাত্রে হৃদরোগে মারা গেলেন।

গোপী আর বিমল দৌড়তে দৌড়তে এসে গেট ঠেলে ঘরের মধ্যে একটা চৌকিতে বসে হাঁপাতে থাকে। জ্বর গায়ে শ্যামল চুপচাপ বসেছিল। শ্যামলকে চুপিসারে কিছু বলে ফের সোজা গেট খুলে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই ষ্টেশনের দিক থেকে একটা সোর-গোলের আওয়াজ শোনা গেল। শ্রীশবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শ্যামলের কাছে এসে উদ্বেগ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—"শ্যামল, কি ব্যাপার, ও কিসের আওয়াজ! গোপীরা কেন এ বাড়ীতে এসেছিল। ওদিকে হল্লা কিসের?"

অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানা ছেড়ে দুহাতে গেট সরিয়ে রাস্তায় নেমে শ্যামল পিচঢালা রাস্তার উত্তর-দক্ষিণ দুদিকে ভালো করে যতদূর দৃষ্টি যায় স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ বাদে আবার ঘরে ঢুকে শ্রীশবাবুর উদ্দেশ্যে বলে—"স্যার, আপনি ভেতরে যান, ষ্টেশনের দিকে একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। মনে হচ্ছে গণ্ডগোলটা এদিকে এগিয়েই আসছে।"

বৃদ্ধ শ্রীশবাবু ঘরময় অস্থির পায়চারী শুরু করে দেন। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বল্লেন—"দ্যাখো, আবার বোধহয় আমার বাড়ীই ওদের টার্গেট হবে।" চিন্ময়ী দেবী উত্তেজিত-ভাবে গেট খুলে বাইরে যেতে চাইলে শ্রীশবাবু হাত ধরে টেনে স্ত্রীকে ঘরে ঢুকিয়ে নিলেন। কোলাপসিবল্ গেটও বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন। ঘরবন্ধ হল শ্যামল।

জমিদার এবং কলেজ সেক্রেটারী ইন্দ্র চৌধুরী আপ লোকালে ষ্টেশনে নেমে তাড়াহুড়া করে গাঁয়ের একটা রিক্সার ওপর চেপে বসে মাথার ঢাকাটা তুলে দিয়ে বললেন—অ্যাই তাড়াতাড়ি চল্। রিক্সাওয়ালা মদন রিক্সাসাটা চালানোর জন্য একটা সজোরে টান দিয়ে সিটের ওপর চেপে প্যাডেলে জোরে চাপ দিতেই কটাস করে একটা আওয়াজ হল। ইন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। মদন তাড়াতাড়ি সিট থেকে নেমে রিক্সার তলার দিকে তাকিয়ে দেখল চেন কেটে গেছে। মুখ চুন করে ইন্দ্রবাবুকে বলল—বাবু, চেন কেটে গ্যাছে আর যাবে না, বলে ময়লা গামছা দিয়ে একবার মুখটা মুছে নিল। রাগে গস্ গস্ করতে করতে ইন্দ্রবাবু রিক্সা থেকে মাটিতে পা দিয়েই মদনের গালে কষিয়ে এক চড় দিতেই সে

চীৎকার করে ওঠে। ইন্দ্রবাবু বলে ওঠেন—"শালা, আমার তাড়াতাড়ির সময় বাড়াবাড়ি।" ইন্দ্র প্রত্যুত্তর করে। বাড়াবাড়িটা কোথায় করলুম বাবু। চেনটা কি আমি ইচ্ছা করে কাটলাম।

একটা পান বিড়ির ষ্টলের সামনে দাঁড়িয়েছিল গোপী। দুতিন জন কলেজের ছাত্র বন্ধুও ছিল সঙ্গে। গোপী একদৃষ্টিতে সব ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করছিল। সদলবলে গোপী মদনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ করে ইন্দ্রবাবুর আচরণের, উল্টোদিকে মিষ্টির দোকানে বসে লম্বা চুলওয়ালা জনা পাঁচেক রোগা লম্বা চেহারার যুবকও ঘটনার ওপর অনেকক্ষণ দৃষ্টি রাখছিল। ওদের পরনে ছিল পায়ের দিকে বিরাট ঝুল-বিশিষ্ট প্যাণ্ট আর পায়ে চটি। মিষ্টি খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। আর একহাতে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট। মিষ্টির দোকানের দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর বিরাট বিরাট ফটোর সমাবেশ। তার মাঝে গান্ধীজী, নেহেরু, ইন্দিরাগান্ধীর বিরাট তৈলচিত্র। যুবকের পরস্পরের সঙ্গে ফিসফাস করে কি আলোচনা করেছিল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই তৈলচিত্রগুলোর পানে একবার চেয়ে নিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটে পরপর দুবার টান দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে চটি দিয়ে চেপে ধরে রগড়ে দিল। তারপর জামার হাতা গোটাতে গোটাতে রাস্তায় নেমে পড়ে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে ওরা মদনের রিক্সার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ওদের মধ্যে একজন ইন্দ্রবাবুর হাত ধরে বার করে আনে। তারপর হঠাৎ চীৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। মিষ্টির দোকানদার সোজাসুজি সব দেখছিল। সেও দোকানে বসেই হল্লা করতে থাকে—"ব্যোম ব্যোম, তারক ব্যোম।" নানা-প্রকার অঙ্গীভঙ্গি বাদ যায় না। হঠাৎ গোপীর একজন সঙ্গীকে দুহাতে জাপটে ধরে কিল চড় ঘুষির ঘটনায় পরিস্থিতি ভিন্ন চেহারা নিল। মুহূর্তের মধ্যে মদন রিক্সা সমেত চিৎ হয়ে পড়ল। ইন্দ্র চৌধুরী এক ফাঁকে সরে পড়লেন। বেঁধে গেল জোর গোলমাল। গোপী সঙ্গীদের নিয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

গেটের বাইরে এবার বেরিয়ে এলেন শ্রীশবাবু স্বয়ং। দূর থেকে প্রবল চীৎকার ভেসে আসছে। চোখ তুলে বুঝতে চেষ্টা করলেন ঘটনা-প্রবাহ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তাঁর চোখে পড়ল শতাধিক যুবকের একটা হল্লা। সব মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক। বয়স চোদ্দ পনেরো থেকে বিশ বাইশের মধ্যে। মুখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'আনন্দমঠ' কাহিনীর প্রসিদ্ধ ধ্বনি। শ্রীশবাবুরা এককালে এই ধ্বনি দিতে দিতে ব্রিটিশের কারাগার বরণ করেছিলেন। এই ধ্বনি দিয়েই বিপ্লবী ক্ষুদিরাম শহীদ হয়েছিলেন। হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলে পড়ে অতল গহ্বরে ঝুলে

াড়েছিলেন। হাজারো তরুণ-তরুণী "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য" ভেবে দেশমাতৃকার রণে আত্মনিবেদন করেছিলেন। শ্রীশবাবুর সারা শরীরে ঐ ধ্বনি শিহরণ জাগিয়ে তুলল। এই ধ্বনি দিয়ে মিছিল মিটিং করার অপরাধে তিনি যে আট বছর অন্ধকার কারাগারে কাটিয়ে এসেছেন। ধ্বনি দিতে দিতে যুবকেরা কাছাকাছি এসে পড়ায় শ্রীশবাবু গেটে তালা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। দরজা জানালা সব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল।

চিন্ময়ী দেবী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। জ্বরাক্রান্ত বিছানায় শুয়ে থাকা শ্যামলের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন—"তুমি একদম উঠবে না।" পুত্রকন্যাদের দিকে তাকিয়ে আদেশ করেন—তোমরা কেউ বাড়ীর বারান্দায় যাবে না! স্বামীকে বল্লেন—"চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকো।" ঘরের কাজ করে যে মেয়েটি তাকে বল্লেন—"তুই, ওদিকে চলে যা।" সবাই কেমন যেন ভীতসন্ত্রস্ত। কেবল তিনিই একমাত্র যেন এবাড়ীতে সাহসী।

গেটের সামনে হল্লা পৌঁছে গেল। গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে চীৎকার চলছে—"শালা, বেরিয়ে আয় বলছি। মাস্টারী করা বার করে দেবো। গোপীদের বার করে দেওয়া চাই-ই চাই।" গ্রীলতালাবদ্ধ। কাঠের গেটটা ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে আছে। পাঁচিলের একটা অংশ ভেঙ্গে পড়ে গেল।

ঘরের মধ্য থেকে একা বেরিয়ে এলেন চিন্ময়ী দেবী। ওঁর সঙ্গে শ্রীশবাবুও বেরিয়ে আসেন। চিন্ময়ী দেবী ধীর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—কি চাও তোমরা? ভিড়ের মধ্যে একজন চীৎকার করে বলে—"এ বাড়ীতে বিমল আর গোপী লুকিয়ে আছে। ওদের বের করে দিতে হবে।"

চিন্ময়ী দেবী বলেন—না, ওরা এবাড়ীতে কেউ নেই। একথায় কর্ণপাত না করে আবার চীৎকার করে ওঠে—"আমরা বাড়ী সার্চ করবো।" হল্লার এক যুবক সি. পি. এম. ওয়াক্ থুবলে খানিক থুতু ভিতরে ছিটিয়ে দিল। শ্রীশবাবু কণ্ঠস্বর চড়িয়ে উত্তর দেন—"না। বাড়ীতে আমি কাউকে ঢুকতে দেবো না।" চিন্ময়ী দেবীর অবশ্য একটু ভিন্নসুর। তিনি প্রস্তাবে আংশিক রাজী হয়ে বল্লেন—রাজী, সবাই ঢুকতে পারবে না। এক একজন করে দেখবে। দেখা হয়ে গেলে বেরিয়ে যাবে। হল্লার সামনে দাঁড়িয়ে মণ্টু। তাকে চেনেন এবাড়ীর সকলেই। রাস্তায় এবাড়ীর সকলের সঙ্গেই কুশল বিনিময়ও হয়। চিন্ময়ী দেবী প্রথমে তাকেই আহ্বান করলেন—"মণ্টু, তুমিও তো ওদের সঙ্গে এসেছো। প্রথমে তাহলে তুমিই এসো। ঘরগুলো দেখবে গোপীরা কোথাও আছে কিনা দেখে ওদের বলে

দাও।" মণ্টু কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হল না।

এত প্রবল মদের গন্ধ ভেসে আসতে থাকে যে, চিন্ময়ী দেবীর গা গুলিয়ে ওঠে। জোর করে সেসব চেপে একভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। শ্রীশবাবুকে ঠেলামেরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

বাইরে তীব্র উত্তেজনা। শ্যামলও উত্তেজিত। বিছানার থেকে হঠাৎ ঝেড়েমেড়ে উঠে একবারে বারন্দায় চিন্ময়ী দেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে চীৎকার ওঠে—"ঐ যে, ঐ যে শ্যামল রয়েছে, ওকেও তো আমরা চাই। ও কি-জন্য এ বাড়ীতে রয়েছে?" আর একজন পাশ থেকে, চেঁচিয়ে ওঠে ওতো সি. পি. এম.-এর পাণ্ডা। দিতেই হবে ওকে আমাদের হাতে। হঠাৎ রাস্তার ওপর সশব্দে একটা পটকা ফাটে। তারপর দুটো, তিনটে। পরপর আওয়াজ। ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি আর উল্লাস। সবমিলিয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস।

ওদের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠেন চিন্ময়ী দেবী। কঠিনস্বরে উত্তর দেন—"শ্যামলকে কিছুতেই তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না।" আঙ্গুল তুলে চীৎকার করে ওঠেন—"না, না, না। ও জ্বরের ঝোঁকে পড়ে আছে। ঘোরের মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। শ্যামল আমার ছেলের মতো, এ-ব্যাপারে আমি আর একটা কথাও বলতে পারবো না।" একটা বড় আকারের ইট টালির ওপর বিকট আওয়াজ করে পড়ে ছিটকে পড়ল। কয়েকটা টালি ফাটল। অন্ধকার ঘরে তিন বোন একটা জায়গায় জড়াজড়ি করে আতঙ্কে পড়ে আছে। একভাই বাড়ীর ছাদে উঠে পড়ল। সশব্দে ইটের কয়েকটা টুকরো এসে পড়তে থাকে কয়েকটা জানালার রডের ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ইটগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়।

কে বা কারা থানায় সংবাদ দিয়েছিল। দারোগাবাবু সদলবলে এসে হাজির। জীপ থেকে নেমেই কার সঙ্গে কথা বলে নিলেন। কনষ্টেবলদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গ্রীলের তালা খোলার জন্য গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করলেন। চিন্ময়ী দেবী আঁচল থেকে চাবির থোলার একটা বেছে নিয়ে পুলিশ অফিসারকে গেট খুলে দিতে দিতে বলেন—শুধুমাত্র পুলিশের লোককেই আমি ভিতরে আসতে দিতে পারি। অফিসারের উদ্দেশ্যে বল্লেন—"আপনি আসতে পারেন। আসুন দারোগাবাবু। একাই ঢুকলেন ঘরে, সঙ্গে কাউকে নিলেন না বা ঢুকতে দিলেন না।" সঙ্গে সঙ্গে গ্রীলের তালা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

পুলিশ অফিসার প্রথমে বড় ঘরটায় ঢুকলেন। এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে কে জানতে চাইলে শ্রীশবাবুর ছোট মেয়ে এগিয়ে এসে উত্তর দেন—আমাদের বড়দা। জ্বর হয়ে শুয়ে আছে। দারোগাবাবু 'ও আচ্ছা' বলে পরপর ঘরে ঢুকে সার্চকরা শেষ করে বারন্দায় এসে বল্লেন আমি সব ঘর দেখেছি। অবাঞ্ছিত কেউ বাড়ীতে নেই। একজন চড়াগলায় বলে ওঠে আমরা দেখেছি শ্যামল এ বাড়িতে ঢুকেছে। আর আপনি 'কেউ নেই' বল্লেই হল। ও-সব পিঁয়াজি ছাড়ুন। আমাদের সার্চ করতে দিন। আমাদের ঢুকতে দেওয়া হ'ক। পুলিশ ফুলিশ! মাস্টারী করতে এসে স্বামীস্ত্রী দলের পাণ্ডাদের আশ্রয় দিচ্ছেন।

পুলিশ অফিসার বক্তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বল্লেন—কি কি বল্লে ভাই। আমি যা দেখেছি সকলকে বলেছি। এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। এবাড়ীর ওপর যেন আর হাঙ্গামা না হয়। অফিসার জীপে চড়ে বসলেন, কনষ্টেবলদের উঠে পড়তে আদেশ করলেন, জীপ উর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'একভাবে তখনও চিন্ময়ী দেবী। গ্রীলের তালার চাবি আঁচলে বাঁধলে দাঁতমুখ বিকৃত করে পূর্বের যুবকটি গ্রীলের রডগুলো দুহাতে আঁকড়ে ধরে একটা অশ্লীল খিস্তি করে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। চীৎকার করে সে বলল—"শালা শ্যামল কতক্ষণ আর কতদিন ঘরের মধ্যে থাকবে দেখা যাবে। শালা এক সময় বের হবে না? তখন কেটে কুঁচিয়ে ঐ নর্দমায় লাশটা রেখে যাবো।" বলে পাশের গভীর নিকাশীখালটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আরও আধঘণ্টা কি ঘণ্টাখানেক চিল চেঁচিয়ে ওরা মুখে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি আর দেবীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে চলে গেল। যাবার সময় প্রচুর পটকা ফাটার আওয়াজ শোনা গেল। বাড়ীটার ওপর দিয়ে একটা প্রবল ঝড় এরাত্রে বয়ে গেল। অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্যামল পরদিন এ-বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল।

শ্রীশবাবু হাতে একটা সাদা কাগজ নিয়ে সশরীরে পরদিন থানায় উপস্থিত হলেন। সাধারত উনি থানায় বিশেষ যেতে চান না। এবারই প্রথম স্থানীয় কিছু দুস্কৃতকারিদের নাম নিয়ে থানায় উপস্থিত। চোখে চশমা, ভালো দেখতে পান না। সঙ্গে বড় মেয়ে মল্লিকা। যে অফিসার ওঁর বাড়ীতে গত রাত্রে গেছলেন তাঁকে চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোন চেয়ারে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। ঘরের মধ্যে পা দেবার আগেই বেয়নেটধারী দ্বাররক্ষীর কাছে বাধা পেয়ে থানার গণতন্ত্রের আস্বাদ আগেই বুঝে নিয়েছিলেন। দ্বার রক্ষীর অনুমতি পেয়ে ঘরের মধ্যে প্রথমেই যে ব্যক্তিকে পেলেন তাঁকে বল্লেন—"গতরাত্রে

আমার বাড়ীতে হামলা করা হয়েছে। একজন অফিসার আপনার এখান থেকে গেছলেন তাঁকে কি পাবো !"

যে ব্যক্তিকে শ্রীশবাবু কথাগুলো জিজ্ঞেস করছিলেন, তিনি যেন শুনতেই পাচ্ছিলেন না। ভাবখানা এমন যে গাঁয়ের এক বুড়ো তার মেয়েকে নিয়ে থানায় এসে কি বকবক করে যাচ্ছে। লোকটি মাথা তুলে একবার বৃদ্ধ আর একবার তার কন্যার দিকে লক্ষ্য করে বিরক্তির স্বরে ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন—"না না। তিনি এখন নেই আর ওসব হয়েই থাকে, পার্টি করবেন।" শ্রীশবাবু কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়ে একটু সরে পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন—বড়বাবুকে পাবো ? সেই ব্যক্তিই যে বড়বাবু তা তাঁর জানা ছিল না। বড়বাবু তখন বিপরীত চেয়ারে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন। আলোচনার ব্যক্তিকে দেখে মল্লিকা চিনেছে। ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মধু ঘোষ। বড়বাবু আলোচনা বন্ধ রেখে মাথাটা কিছুটা তুলে বল্লেন—"কি চাই আপনার বলুন।" মল্লিকা উত্তর করে—"কাল রাত্রে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে একদল আমাদের বাড়ীতে চড়াও হয়েছিল।" বাধা দিয়ে বড়বাবু বল্লেন আপনারা বুঝি কম্যুনিষ্ট। মল্লিকা চটপট উত্তর দেয়—"কম্যুনিষ্ট এখনও হতে পারিনি। তবে আমার বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ডাকে যোগ দিয়ে মাত্র আট বছর জেল খেটেছেন। আর উনি সেই পুরোনো আদর্শ নিয়েই থাকেন। তবে ছাত্ররা যারা বাবার কাছে আসে তাদের অনেকেই হয়তো বা কম্যুনিষ্ট হবে। বেশকিছু কংগ্রেস রাজনীতির লোক তো বাবার বিশেষ বন্ধু "। এতকথা শোনার ধৈর্য থানার বড়বাবুর হল না। হবার কথাও নয়। কারণ ইতিমধ্যে আলোচনারত ব্যক্তিটির চোখ-মুখের রঙ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের তারা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। পরনের খদ্দরে একবার মুখটা মুছেও নিলেন। এসব ভাবভঙ্গী নিশ্চয়ই বড়বাবুর দৃষ্টি এড়ায়নি। আর এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা চলছিল সেটাও যে আগের রাত্রের ঘটনা নিয়ে নয় তাই বা কে বলতে পারে ! বড়বাবু গলার স্বরে কিছুটা রুক্ষতা এনে হাঁক দিলেন—স্যাইরাম এর কাছ হতে সব শুনে একটা ডায়েরী লিখে নাও। তারপর শ্রীশবাবুর দিকে তাকিয়ে চলে যান ওর কাছে। বলে আবার মধু ঘোষের সঙ্গে ফিসফাস আলোচনায় বসে গেলেন।

রামবাবুর কাছ হতে বিদায় নিয়ে শ্রীশবাবু ও মল্লিকা থানা ছেড়ে চলে গেল। কাজের কাজ কিছুই না হওয়ায় বিশেষ অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাড়ী ফেরার পথে গভীর চিন্তা করতে করতে হয়তো ওরা ক্লান্তি অনুভব করছিলেন।

দলনেত্রীকে ওরা বলছে—"মা, 'মা জগদ্ধাত্রী' এশিয়ার মুক্তি সূর্য।" এইসব বিশেষণে ভূষিত করে নিজেদের গৌরবমণ্ডিত করে চলেছে। যারা 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে' মুষ্টিবদ্ধ করে হাত ওপরে তুলেছিল। বিচারে এখন তাদের হাত কাটা যাবে। যারা জমিদারকে দেখে নয় আর এগারো মাসের শাসনের স্বযোগে অমান্য করতে শিখেছিল তাদের অন্ধকার গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। এখন এইভাবে চলবে বিচার। আর অগ্নিযুগের বিপ্লবী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত হবেন এ আর বড় কথা কি ?

যেন ঘূর্ণি লেগেছে। একদিনে ছ'শজন নিহত! ক্ষেতমজুর সেখ গফুরকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে পিটিয়ে খুন করা হল! অপরাধ সে নাকি মুরগী চুরি করেছিল। কার মুরগী তা আর ধরা পড়ল না। 'কোম্বিং অপারেশন।' ঘাঁটি নির্মূল, সংবাদপত্রের হেডলাইন-আটক আইনে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিন হাজার তিনশ আট। এবং সকলেই উগ্রপন্থী! মন্ত্রীদের সঙ্গে পুলিশকর্তাদের বৈঠক। ঠাসা সংবাদ! সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ?

মাথার মধ্যে মাকড়সার জাল বুনছে। গতরাত্রের দুশ্চিন্তা শ্যামলের শরীর দুর্বল করে তুলেছে। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে কড়ানাড়ার আওয়াজ। দরজা খুলতেই মাধুরীর দর্শন। "কি ব্যাপার, এসো, এসো, বিছানা ময়লা।" দুহাতে নিজেই ময়লা সাফ করতে করতে বলে—"এর ওপরেই বসতে হবে।" মাধুরী বাধা দিয়ে বলে—না, না আমি ফরসা ময়লা বিচার করতে আসিনি। ভবঘুরে লোকদের বিছানা কি ধোয়া, সাদা ধবধবে হবে! যাক শুনুন, আমি একটা সংবাদ নিয়ে এসেছি। দেবব্রতবাবুকে মিশায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

শ্যামল চমকে ওঠে—"সেকি! কখনকার খবর? কালই যে তাঁর কাছে সাবধান থাকার খবর পাঠালাম? সে খবর কি পৌঁছায়নি?" দেবব্রতর গ্রেপ্তারের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ যা শোনা গেছে, মাধুরী যা সংগ্রহ করেছে তা শ্যামলকে আনুপূর্বিক শোনায়। আজই দেবব্রতকে তার ইস্কুল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উৎসবের দিন। বড়দিনের ছুটি। ইস্কুল কলেজ সব বন্ধ। গতকাল ইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রমোশনের দিন ধার্য ছিল। ছাত্র-শিক্ষক সবাই কেমন যেন ব্যস্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের আজ হাসিকান্নার দিন।

পিচরাস্তা থেকে ইস্কুলের যাবার পথটার দুধারে বেশ জঙ্গল হয়ে গেছে। মধ্য-বয়সী এক কাঠুরে কুড়ুল দিয়ে গাছের ডালকাটছিল। কোনোদিকে তার দৃষ্টি ছিল না। গুড়গুড় করে একটা ডাল গাছ থেকে খসে পড়ল। লোকটা গাছ থেকে

আস্তে আস্তে নেমে এল। কাটা ডালটা টেনে একটা ঢিবির ওপর তুলে রাখে। ডালটাকে চাঁচাছোলার কাজ করে যায়।

ইস্কুলে ছাত্রদের প্রমোশন দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। দেবব্রত একাই বাসার দিকে রওনা দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এক গতিতে এগিয়ে যায়। পথের ওপর অর্ধনগ্ন কাঠুরে দেবব্রতর সামনে হঠাৎ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঝোপ থেকে একইভাবে দেখতে আর একজন কাঠুরে এসে প্রথমজনের সঙ্গে যোগ দেয়। দেবব্রত হঠাৎ এভাবে বাধা পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—"ওরে গুণ্ডা, গুণ্ডা।" চীৎকার শুনে ইস্কুলের শিক্ষক ছাত্র সামনে পাড়ার লোকেরা ছুটে আসে। দেবব্রত পরে বলেছিল—আমি ভেবেছিলাম ওরা কংগ্রেসী গুণ্ডা। তাই আমি একটাকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর পা দিয়ে কীচকবধ করবো, ঠিক এমন অবস্থায় দেখে আমার সামনে পিছনে উন্মুক্ত রিভলবার হাতে দুজন কাঠুরে দাঁড়িয়ে গেছে। তখন বুঝলাম এ তো কংগ্রেসী সমাজবিরোধী নয়। পুলিশ। ঐ দুজনে বলছে—"সাবধান দেবব্রত বাবু, ওকে এখনই ছেড়েদিন। একজনকে চিনলাম এখানকার থানার থার্ড অফিসার। ইতিমধ্যে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা ধুলো ঝেড়ে মাটিতে বসে তারপর দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দেয়—আমি থানার বড়বাবু। আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে রিভলবার থেকে গুলি ছুটবে। হাত তুলুন।"

দেবব্রত বুঝলো সমগ্র পরিস্থিতি। দুহাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পন করল। সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রতকে একটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দেওয়া হল। দড়ি ধরে পুলিশের লোকগুলো দেবব্রতকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

পুলিশের লোকেরা দড়ি ধরে টানতে টানতে দেবব্রতকে পিচের রাস্তার ওপর অপেক্ষমান ভ্যানের কাছে নিয়ে আসে। এদিকে লোকজনও প্রচুর জড়ো হয়ে গেছে। এদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে এক ক্ষেতমজুর রমণী তরুণী বিধবা মালিনী। সঙ্গে মহিলাসমিতির আরও জন পঞ্চাশেক সদস্যা সকলেই ক্ষেতমজুর। ছাত্র-শিক্ষক সব মিলিয়ে অন্ততঃ শ'দুয়েক।

বড়বাবু জমায়েতকে সরে যাবার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশের ভঙ্গীতে দেবব্রতকে বল্লেন—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছেন নাকি, উঠুন, ভ্যানে উঠুন। দেরী করবেন না। উপস্থিত জনতা চঞ্চল? শক্তিসামর্থ যুবক জোরকরে দেবব্রতর হাত চেপে ধরে চীৎকার করে ওঠে—"না। আমরা মাস্টারমশাইকে নিয়ে

যেতে দেবো না। আমাদের বলে যেতে হবে মাস্টারমশাইয়ের কি অপরাধ।" এদের সঙ্গে সঙ্গে জমায়েত হুড়মুড় করে পুলিশ, পুলিশ ভ্যান, বন্দী সকলকেই ঘিরে ধরল। ওরা টানাটানি করতে থাকে দেবব্রতকে ধরে।

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে বুঝে বড়বাবু হঠাৎ জোরে হুইসেল বাজিয়ে দেয়। হুইসেলের আওয়াজেও কেউ সরে না দেখে রিভলবার তুলে হুমকী দেন এখনই সব সরে না গেলে ফায়ার করবো। হঠাৎ লাঠিচার্জ। জনতার দিগ্বিদিকে ছোটাছুটি। প্রচণ্ড সোরগোল। জোরকরে টেনে-হিঁচড়ে দেবব্রতকে ভ্যানে তোলা হল। ভ্যানে তুলেই তারপর চললো প্রচণ্ড লাঠির আঘাত। গাড়ী ছুটলো পীচঢালা রাস্তা দিয়ে তীব্রগতিতে। একদিকে ভ্যানের ইঞ্জিনের কর্ণভেদী আওয়াজ, অন্যদিকে গাড়ীর মধ্যে পুলিশের গর্জন, মারধোরের আওয়াজ, আহত দেবব্রতর চীৎকার। সবমিলিয়ে প্রচণ্ড সোরগোল।

জনতা দেখেছে তাদের গাঁয়ের ষোলবছরের মাস্টারমশাইকে পুলিশ ভ্যানের মধ্যে উপুড়করে ফেলে বুট দিয়ে আঘাত করছে। লাঠির আঘাতে, রাইফেলের বাট দিয়ে মেরে মেরে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলেছে। দেবব্রতর গায়ের জামা কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছে, গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আহত দেবব্রতর কানে আসছে উন্মত্তের মতো পুলিশবাহিনী চীৎকার করছে—"বল্ শ্যালা, বাইরে থেকে মাস্টারী করতে এসে আর লোক ক্ষ্যাপাবি। এইবার মজা দেখাবো। চলো এখনও হাজতে বাকী অংশ পড়বে।" আর একজন বলে "ইন-কিলাব জিন্দাবাদ করার মজা এবার টের পাবে, চলো হাজতে।" বলে বুট দিয়ে আবার এক ঘা লাগাল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এবার সে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

শ্যামল সব শুনে মাধুরীকে প্রশ্ন করে তুমি এতো কোথা জানলে কোথা থেকে? মাধুরী উত্তর করে—"জেনেছি ঐ গাঁয়ের এক যুবকের কাছ থেকে। ছেলেটি ঘটনাস্থলে ছিল। সে গাঁয়ের কুমোরদের ছেলে। কুমোররা এ-গাঁয়ে অত্যন্ত ধনীলোক, ঐ বাড়ীর ছেলে। দলের কেউ নয়। থানায় গেছলো হাজতে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে কিছু খাবার দিয়ে আসতে। হাজার হোক দেবব্রতবাবুর কাছেই তো সে পাঠ নিয়েছে। পুলিশ খাবার দিতে দেয়নি। তবে হাজতের বাইরে দাঁড়িয়ে গরাদ ধরে ওর সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলেছে। দারোগার আদেশে সেণ্ট্রির ওদের দুজনার সব কথা শোনার কথা ছিল। যে হাজতে সেণ্ট্রি ছিল সে লোকদেখানো, ওদের দুজনার কথা বলার মাঝে গিয়েও দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঐ ছেলেটিই তাকে এসব কাহিনী শুনিয়েছে। শ্যামলদা, দেবব্রতবাবুকে জামী
ছাড়িয়ে আনা যাবে না।" কিছুটা উদ্বেগ মিশ্রিত কণ্ঠে মাধুরী প্রশ্নটা করে।

শ্যামল ঘাড় নেড়ে অন্যমনস্কের মতো জবাব দেয়। মাধুরী পুনরায় প্রশ্ন করে—কি জামীনের জন্য যাবেন না? শ্যামল এবার সপ্রতিভ হয়ে ওঠে, ও বলে—জামী কি পাওয়া যাবে? চেষ্টা করে দেখা নিশ্চয়ই হবে। আগে থানা হাজত থেকে কোর্ট হাজতে পাঠাক। তবে আমার দৃঢ় ধারণা, জামীন ওরা দেবে না নিশ্চয়ই নতুন আটক আইনে জেলে পুরবে। দেবব্রতবাবু ঐ গাঁয়ে কি রক জনপ্রিয় তাতো পুলিশ ও সরকারের কাছে রিপোর্ট আছে। এই জনপ্রিয়তাই ওদের আতঙ্ক।

মাধুরী কথার স্বর পাটে দেবব্রতর গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ ছেড়ে সংগঠনের কথ তোলে। মাধুরী বলল—"শ্যামলদা আমরা যেন ক্রমশঃ পিছু হাঁটছি বলে মনে হচ্ছে গ্রামগুলো ভীষণভাবে আক্রান্ত। অথচ তার মোকাবিলা করতে পারছি না আমরা মেয়েদের যে সংগঠন তৈরী করেছিলাম তা যেন কেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।" শ্যামল উত্তর দেয়—"এখন যারা রাজ্যপাট চালাচ্ছে তারা যে বেছে নিয়েছে গ্রাম বাংলা। তাছাড়া প্রতিরোধ তো চলছেই। তবে তার চেহারা হয়তো সবক্ষেত্রে সমান নয়। এই যে ঘটনার কথা শোনাল, সেই দেবব্রতবাবুর গ্রেপ্তারের সময় দলবেঁধে ক্ষেতমজুর মেয়েরা তো তাঁকে ছিনিয়ে আনতে গেছলো। আগে কোনোদিন 'কোম্বিং অপারেশন'-এর নাম জানতে? সরকার থেকে যদি সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দেওয়া হয় তখন দেশের অবস্থা কি হয় ভাবতে পারো। একজন ইস্কুলের প্রাচীন মাস্টারমশাইকে জনতার সামনে গ্রেপ্তারের সময় মারের চোটে প্রায় মেরে ফেলার মতো করলো। সাম্যবাদ প্রচারের অপরাধ আর একজন হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষককে চেয়ারে বেঁধে ছাত্রদের সামনেই গুণ্ডারা পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারল। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হত্যা করে গুণ্ডারা স্ত্রীকে সেখানেই ধর্ষণ করলো থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে এক তরুণীকে থানার দারোগা থেকে কনষ্টেবল পর্যন্ত সবাই হাজতে গিয়ে ধর্ষণ করে এল। এসব ঘটনা আমাদের এই স্বাধীনদেশে ঘটছে। শ্যামলী ওরা অত্যাচারকে যখন নির্মম করছে তখন আমাদেরও তো সংগঠন আর আন্দোলনের ধারার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একাজ কে করবে? তুমি, আমি, আর আমাদের মতো যারা দিনরাত সংগঠনের কাজ করে তাদেরই তো একাজের গুরুত্ব বুঝতে হবে।"

মাধুরী আলোচনায় ছেদ টানার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলে—"আমি এখন উঠবো।

তবে একথা ওরা প্রচার করে যে, ওরাই নাকি হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার পূজারী।"

শ্যামল মাধুরীকে এগিয়ে দিতে আসার পথে মন্তব্য করে—তাতো ঠিকই, চোরের মায়ের বড়গলা একথাটাতো মিথ্যা নয়। তুমি অফিসে একবার যাবেতো? তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

অফিসের কাজে শ্যামল সেদিন খুবই ব্যস্ত ছিল। আগের দিন রাত্রে থাকা-খাওয়া নিয়ে নানা সমস্যায় পড়ে তাকে পুরো অভুক্ত থাকতে হয়েছে। ঘরের মধ্যে পাতা বেঞ্চিতে বসে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। 'গণশক্তি' কাগজটা পড়া শেষ করে শ্যামল সেটাকে আলমারীর মাথায় তুলে রাখছে। ঠিক এই মুহূর্তে অফিসের বাইরে একজন পুলিস অফিসার, দু-জন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে—শ্যামলবাবু কার নাম? শ্যামল বসু ভেতরে আছেন উনি?

পুলিশ অফিসার দু-জন কনষ্টেবল নিয়ে অফিসের রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে। শ্যামলের সরে পড়ার কোন উপায় ছিল না। ধরে নিয়ে চলে গেল ওরা। একজন কনষ্টেবল ঘাড়ের কলারটা চেপে ধরে নিয়ে চলল। রাস্তার দুধারের দোকানদাররা হাঁ করে এই দৃশ্য দেখে অনেকেই নির্বাক হয়ে রইল। শুধু যতদুর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

ষ্টেশন প্লাটফর্মে একজন এ. এস. আই. ও সাদা পোষাকে কয়েকজন কনষ্টেবল নিয়ে যেন অপেক্ষা করছিল থানার বড়বাবু। শ্যমলকে ধরে আনা হচ্ছে দেখে ধীরে ধীরে তিনি দলবল নিয়ে প্লাটফর্ম থেকে নেমে এলেন। বন্দীকে নিয়ে স্কোয়াড রেললাইন পেরিয়ে ও-পাড়ায় পা দিতেই চোখে পড়ল আগের মতো একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা আর একজন অফিসার আর জনা তিনেক কনষ্টেবল। বন্দীর পিছু পিছু ওরাও হাঁক দিতে থাকে।

বন্দী শ্যামল বসু থানায় উপস্থিত হল। তাড়াতাড়ি একজন কনষ্টেবল হাতকড়া পরিয়ে দিল। আয়োজনের যেন কোন ত্রুটি নেই। হঠাৎ পাশের চেয়ারে বসা পুলিশের মেজকর্তা গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম করেন—"আপনার কাছে যা যা আছে তা টেবিলে জমা দিন।" শ্যামল একথায় কোন সাড়া শব্দ দিল না দেখে গর্জে উঠলেন মেজবাবু—"কি। পকেটে যা যা আছে সব বার করে টেবিলে রাখুন। না হলে সেন্ট্রিকে বলছি আপনার কাছ হতে সার্চ করে সব বার করতে।" শ্যামল তবুও চুপ করে থাকে। পকেটে যে তার ডায়েরীটা আছে। ওটা কি করে বার করে। আচমকা ধরা পড়ে ওটা হস্তান্তর করতেই পারেনি। টেবিলে একটা সজোরে

ঘুসি মেরে বুঝিয়ে দিলেন মেজবাবু তিনি ভীষণ রেগে গেছেন। শ্যামলকে হাবভাবে খুব একটা উদ্বিগ্ন বলে বোধ হচ্ছিল না ওদিকে পুলিশ পক্ষের ভীষণ জেদ।

টেবিলে ঘুসি মেরে মেজবাবু আবার প্রবল চীৎকারে ঘরখানা যেন কাঁপিয়ে দিলেন—কি মশাই আমাদের আপনার মতো আরও আসামী নিয়ে আসতে হবে। একবারে দেরী করা চলবে না।

শ্যামল স্বাভাবিকস্বরে উত্তর দেয়—আমার কাছে একটা ছোট পকেট ডায়েরী আছে। সেটা আমি দিতে রাজী নই।

হুঙ্কার ছেড়ে মেজদারোগা গোল গোল চোখ করে বল্লেন—হোয়েন ইউ আঃ আণ্ডার অ্যারেষ্ট। আপনার পজেশানে যা যা আছে সব সীজ করা হবে।

জিদ ধরে শ্যামলও উত্তর করে—নো, এটা আমি দেব না, ওটা আমি ডেস্ট্রয় করে দেবো।

থানার বড় দারোগার মনমেজাজ বোঝা ভারী মুস্কিল। তর্কবিতর্কের মাঝে এসে তিনি ঘরে ঢুকলেন। নিজের চেম্বারে গিয়ে শ্যামলকে ডাকলেন—"শ্যামলবাবু। ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন।" পরে মেজদারোগার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে— —কি হয়েছে মেজবাবু, চেঁচামেচি করছেন কেন?

সেকেণ্ড অফিসারটি উত্তর দেয় স্যার,—শ্যামলবাবুর কাছে মানে ওঁর পজেশানে যা যা আছে উনি তা দিতে রাজী হচ্ছেন না।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল এ-কথার তীব্র প্রতিবাদ করে বলে—একথা মোটেই সত নয়। আমি শুধু আমার ডায়েরীটা দিতে রাজী নই। ওটা আমি ডেসট্রয় করবে দারোগা এবার বেশ ঝাঁঝালো স্বরে তেড়ে উঠে বলে—কিন্তু আপনাকে তো আইন মানতে হবে।

জবাবে শ্যামল উত্তর দেয়—"বন্দী হয়ে এখানে এসে আমি আর আইন অমান্য করতে চাই না। আমি আপনাকে ডায়েরী দেখাতে পারি। চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন কারণ আপনাদের মনে হতে পারে ওতে আপত্তিকর কিছু আছে। কিন্তু তারপর আমি ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবো।"

এরপর খানিক কিছু চিন্তা করে বড় দারোগা একটা সাদা কাগজ বন্দীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন আপনার কাছে যা যা আছে এক দুই করে তার একটা লিষ্ট তৈরী করে এই কাগজটায় লিখুন। আর প্রত্যেকটি জিনিস বার করে টেবিলে রাখুন।

"আদেশ মানার ভঙ্গীতে শ্যামল পকেট থেকে একে একে সব বার করে টেবিলে রাখে আর সাদা কাগজটায় লিখে রাখতে থাকে। ওয়ান রিষ্ট ওয়াচ, ওয়া

ফাউণ্টেনপেন, ওয়ান কভারড্ এনভেলাপ, ওয়ান ডায়েরী এণ্ড ওয়ান রুপী।
দারোগা এবার একটা বড় খাম বন্দীর হাতে দিয়ে বল্লেন—ঐগুলো সব এবার ঐ খামের মধ্যে পুরুন। খামটার মধ্যে ঢুকিয়ে মুখটা এঁটে দিন। ঐসব আপনাকেই কাষ্টেডিয়ান করা হল। সব প্রক্রিয়া শেষ হলে দারোগার শেষ নির্দেশ আসে—"যান। ঐ খামশুদ্ধ নিয়ে হাজতে ঢুকুন।" বলেই সেন্ট্রিকে হাজতের তালা খুলে বন্দীকে ঢুকিয়ে দিতে বল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালিত হল। শ্যামল হাজতে প্রবেশ করার পর সেণ্ট্রি গেটে একটা ঢাউস তালা লাগিয়ে দিল।

ছোট হাজতটার মধ্যে পড়েছিল একটা শতচ্ছিন্ন চটের থলে ও ছেঁড়া কাঁথা। প্রস্রাব পড়ে রয়েছে এক কোণে। দীর্ঘক্ষণ বাদে একটু বসার সুযোগ পেয়ে শ্যামল হাত দিয়েই মেঝেটা একটু সাফ করে নিয়ে বসল। তারপর এনভেলাপটার আঠা দেওয়া মুখ ছিঁড়ে ফেলল। কাগজ পত্র ডায়েরী যা ছিল সব কুটি কুটি করে ফেলে। তারপর একজনের হাতে সেগুলো গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে পাচার করে দেয়। তাঁকে অনুরোধ করে—ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত ঘড়ি, পেন ইত্যাদি আপনার কাছেই থাকুক। ছেঁড়া কাগজ পত্র ডায়েরী পুড়িয়ে ফেলবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিত্যানন্দ তার অভুক্ত 'কাকু'কে খাওয়ানোর জন্য থানায় ডালভাত নিয়ে এসে হাজির। মেজ দারোগা কিছুতেই রাজী নয় বন্দীকে বাড়ীর কোন কিছু খেতে দেওয়াতে। জীপ প্রস্তুত। বন্দীকে এখনই তাতে নিয়ে ওঠার জন্য সাতজন সশস্ত্র কনষ্টেবল দু-জন অফিসার জীপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

হাজতের সেণ্ট্রি বন্দীকে বের করল। হাতে আবার হ্যাণ্ডকাপ। কোমরে দড়ি পরাল। দুজন রাইফেলধারী সেপাই বন্দীর দুদিকে গার্ড দিয়ে নিয়ে চলল। ধীর পদক্ষেপে বন্দী জীপে উঠে বসল। সঙ্গে জীপে ঠাসা হয়ে গেল রাইফেলধারী পুলিশ আর অফিসারে। মনে হচ্ছে হয় কোন যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অথবা মারাত্মক খুনী বা ডাকাতকে চালান করা হচ্ছে। জীপ ষ্টার্ট দেওয়ার মুহূর্তে একজন এ. এস. আই. চুপিসারে টিফিন ক্যারিয়ারটা জীপে তুলে দিয়ে একজন এ. এস. আই.-এর কানে কানে কি যেন বলে দিল।

হু হু করে জীপে ষ্টার্ট দিল মাইল দশেক দূরে জি. টি. রোডের ধারে একটা থানার সামনে এসে জীপ ষ্টার্ট বন্ধ করল। থানায় ঢুকলেন বড়বাবু, পিছু পিছু একজন এ. এস. আই., এ. এস. আই. টি নামার সময় শ্যামলের দিকে টিফিন ক্যারিয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে—"জীপে বসেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।" সামনের কল থেকে একবালতি জল এনে দেবার জন্য একজন সেপাইকে চুপিসারে বলে চলে

গেল। ভাত খাওয়ার ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে গেছে। দুচার গ্রাস মুখে দিয়ে আর খেতে পারা গেল না। বড় দারোগা থানার মধ্যে বসে কাজ করছে। এই ফাঁকে এ. এস. আই. টি থানা থেকে বের হয়ে এসে শ্যামলকে নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করে—খাওয়া শেষ হয়েছে তো! আরে মশাই, কারুর ভালোর জন্য কি কিছু করা যায়। এই দেখুন না, আপনার জন্য ভাত বয়ে এনেছি বলে সব সাহেবদের কি আমায় তড়পানি। যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি। একটা মানুষ সারাদিন না খেয়ে থাকবে তার মুখে কিছু অন্ন তুলে দেওয়ার কি পুলিশ বিধিতে বারণ। শালার এ চাকরী মানুষে করে। আমাকে বলে কি ওরা জানেন? বলে কি যাকে 'আণ্ডার আরেষ্ট' করা হয়েছে, তার জন্য অত দরদ কিসের তোমার? কেন ওকে জীপ থেকে নামিয়ে এই থানার হাজতে ঢোকাওনি? আরে বাবা, মানুষ দেখলে বোঝা যায় না, সে ধরা পড়লে পালাবে না চুপটি করে বসে থাকবে। হুঁ—এইভাবে বকবক করে যেতেই থানা থেকে নেমে এল আরও সব পুলিস কর্তারা। আর একটা অপেক্ষমান জীপে তাঁরা চড়ে বসলেন।

এরপর শ্যামলকে নিয়ে আসা হল সদর থানায়। ঢুকিয়ে দেওয়া হল অন্ধকার আর এক হাজতে। ঢুকতেই কিসে যেন পা ঠেক্‌লো। চমকে ওঠে—মানুষ শুয়ে আছে! পায়ের আঘাতে সে যেন নড়েচড়ে উঠল। দুপা পিছিয়ে গেলো শ্যামল। কে একজন শুয়ে রয়েছে মনে হচ্ছে চটের ওপর গুটীশুটি মেরে। লোকটা কি বৃদ্ধ না জোয়ান, ন কিশোর? অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, লোকটার গায়ে কি পোষাক আছে না উলঙ্গ? লোকটা কি অন্ধ, না স্পষ্ট দেখতে পায়? সে পুরুষ না মহিলা? সে কি খঞ্জ না চলা-ফেরা করতে পারে? চোর না রাজনৈতিক কর্মী? খুনি না ডাকাত? কি জন্য এইভাবে অন্ধকারে গুটিশুটি মেরে মরার মতো পড়ে আছে। একেবারে সাড়াশব্দ দিচ্ছে না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে নেই তো! গায়ে হাত দিতে ভয় হচ্ছে। গায়ে পা লেগে যেতেই দুকদম সভয়ে পিছিয়ে গেল শ্যামল। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করল। অনেকক্ষণ পর এক চিলতে আলো এসে ঢুকলো। এই আবছা আলোয় বোঝা গেলো একজন পুরুষ এবং আন্দাজ বিশবাইশ বছরের যুবক। পাতলা গড়ন। গায়ে জামা গেঞ্জী কিছু নেই। পরনে একটা পাতলুন। ওর কাছে এসে শ্যামল বসে পড়ে—মুখ চোখ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যুবকটির চোখমুখ ফোলা, পিঠের দিক থেকে রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে। ওর মুখের কাছে ঝুঁকে ধীর গলায় জিজ্ঞেস করে—"একটু উঠে বসতে পারেন?" যুবকটি ঘাড নাড়ে। মনে হচ্ছে ভালো জ্ঞানই নেই। চোখ ভাল করে

লেতে পারছে না। ভালো করে বসতে পারছে না।

হাজতের মধ্যে এক কোণে একটা মালসায় কিছুটা ভালো জল পাওয়া গেল। ামল হাতে মালসাটা তুলে নিয়ে সহবন্দীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চোখে মুখে লে ছিটাতে থাকে। নিজের কাপড়ের একটা অংশ ছিঁড়ে ন্যাকড়া করে ক্ষতস্থান-লো বাদ দিয়ে সেই বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজিয়ে আস্তে আস্তে ঝরা রক্তের চাপ তুলে য়। মাথার চুলে ভিজে হাত বুলিয়ে দেয়। হাত দিয়ে চোখে মুখে হাওয়া ওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রূষা করার পর জ্ঞান ফিরে লে যুবকটি ধীর গলার বলে—উঃ, আমার মুখ থেকে কথা বার করার জন্য মেরে ানপায়ের উরু ভেঙ্গে দিয়েছে। আমার পিঠে রাইফেলের বেয়নেটের খোঁচা মরেছে।

—আপনাকে কবে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে ?

—সাতদিন হ'ল আজ ধরে। প্রথম চারদিন আমাদের থানা হাজতে। আর াকী তিনদিন এক নাগাড়ে এখানেই পড়ে আছি।

—নিয়ম হল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে কোর্টে তুলতে হবে।

—হুঁ, ওদের কাছে নিয়ম। আইন এসবের কোন মূল্য নেই।

—এ কদিন কি খাইয়েছে আপনাকে ?

—দুবেলা চারখানা করে কচুরী, সঙ্গে কুমড়োর ঘ্যাট, কোনদিন ডাল। তবে মারের জন্য, যন্ত্রণার জন্য কোনবেলাই খেতে পারিনি। বলতে পারেন একদিন প্রায় না খেয়েই আছি। আপনাকে কি কেশে ধরেছে ?

—এখনও কিছু বলেনি। বুঝতে পারছি বিনাবিচারে আটক আইনে ধরেছে। বিচারের জন্য কোর্টে তুলছে না বলেই মনে হচ্ছে।

—"আমার খোঁজ বোধহয় কেউ পাচ্ছে না। সাতদিন কেউ আসেনি খোঁজ করতে। জানি না আমাকে নিয়ে ওরা কি করবে ? শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে কিনা তাই বা কে জানে ? কপালে তো বিশ্বাস নেই। যাক্‌গে যা হবার হবে। ফাঁসীই দিক আর গুলী করেই মারুক। একটা কথাও ওরা আমার কাছ হতে বার করতে পারবে না।" কথাবার্তার পর দুজনেই মেঝেতে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তালা খোলার আওয়াজ কানে এলো।

কয়েকঘণ্টা বাদে একজন পুলিশ অফিসার হাজতের সামনে দাঁড়িয়ে সেন্ট্রিকে দিয়ে তালা খুলিয়ে ভরাট গলায় শ্যামলের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল—শ্যামল বোস কার

নাম ? বেরিয়ে এসো তো বাছাধন।

কুৎসিৎ ভাষা শুনে শ্যামলের গা ঘিনঘিন করে উঠল। মেঝে থেকে উঠে দরজার কাছে দাঁড়াতে হাজতের লোহার দরজা খুলে গেল। একজন অফিসার আর একজন সেপাই তাকে পাহারা দিয়ে পাশের একটা ঘরে নিয়ে ঢুকলো।

ঘরটায় লম্বা চওড়ায় বেশ বড়ো। একটা লম্বা আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের লম্বা তু'পাশে কয়েকজন পুলিশের কর্তা ব্যক্তি বসে। শ্যামলকে ওদের মধ্যে একজন একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো। তুজন অফিসারকে চিনতে পারা গেল। একজন ওখানকার থানায় বসে। আর একজন সি. আই.। হাতভর্তি মোটা লোম, আকারে বিরাট লম্বা। মাথাটা প্রকাণ্ড। মহাভারতের ঘটোৎকচের মতো দেখতে। শ্যামলের হাতে ইনি পাঁচকপি আটকা-দেশের কাগজ যাতে রাজ্যপালের আদেশে জেলাশাসক স্বাক্ষর করেছেন ধরিয়ে দেয়।

—শ্যামলবাবু, আপনি এই পাঁচ জায়গায় সই করুন।

একটা সেট পাঁচ পাতা জুড়ে। অভিযোগের বন্যা বইছে। পাঁচজায়গায় সই করা শেষ হলে একটা তাড়া শ্যামলকে দিয়ে দেওয়া হল। আগ্রহভরে প্রথমেই শ্যামল অভিযোগগুলি একমনে পড়ে যায়। পড়া শেষ হলে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে এক বছরের জন্য আপাততঃ তাকে আর চার দেওয়ালের বাইরে আসতে হচ্ছে না।

—কিন্তু এসব তো সব মিথ্যা অভিযোগ। আন্দোলন করি আমরা নিশ্চিত তারজন্য মিছিল করি, মিটিং করে সবাইকে আমাদের উদ্দেশ্য জানাই। আমাদের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য কখনও আমরা গোপন করি না।

—কি করবো বলুন, ওরা যা যা বলছে তাইতো করতে হচ্ছে। আপনার যখন সরকারে ছিলেন যা বলেছিলেন করেছি।

—কই কখনও তো শুনিনি যুক্তফ্রণ্ট সরকার তাদের বিরোধীদের কখনও গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল। তাছাড়া পুলিশমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় ঢুকে যা করেছেন তা কি আপনাদের সঙ্গত কাজ ?

—না, তা নিশ্চয়ই নয়। যাক্ এখন ওসব আলোচনা করে কোন লাভ হবে না। ড্রাইভারকে রেডি হতে বলুন মুখার্জীবাবু। মুখার্জী একজন সেন্ট্রি। জোরে বুটের শব্দ আর তুহাতে সেলাম ঠুকে ঘরখানা যেন কাঁপিয়ে দিল। মুখার্জী বলল—ইয়েস্ স্যার। বলেই পিছু ফিরে অপেক্ষমান জীপের ড্রাইভারকে কিছু বলে দিল।

জেল কর্তৃপক্ষ রাত আটটায় শ্যামলকে গ্রহণ করলো। কত রকম খাতা। সব সই সাবুদ করে, হাত পায়ের ছাপ নিয়ে, দেহতল্লাশ শেষ করে আরও দুঘন্টা কেটে গেল। শেষে একসময় বিশাল লৌহফটকের মধ্যে মাথা গলিয়ে ঢোকার জায়গাটার তালা খুলে শ্যামলকে ভিতরে ঠেলে দিল গেটের ওয়ার্ডার।

লৌহফটকের ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরে ঢুকে এলো গুদামবাবু। সে শ্যামলের নামধাম আসামী কোন গ্রুপের তা বুঝে নিয়ে এসেছে। একটা ঘর খুলে আসামীর হাতের কার্ডটা দেখে আর একবার মিলিয়ে দেখে নিয়ে একটা থালা হাতে দিয়ে বলল—এটা সঙ্গে নিয়ে যান।

কিন্তু এর আগে আমি আরও কয়েকবার এসেছি। তখনতো দুটো কম্বল চাদর, বাটী, গেলাস এসব দেওয়া হয়েছিল। আর এ থালাটাও তো তোবড়ানো পিছনের দিকটা আবার পোড়া পোড়া। কি ব্যাপার বন্দীকে শোবার কম্বল, জলের গেলাস এসব দেওয়া হবে না ?

—দেখুন মশাই, এটা ডিস্ট্রিক্ট জেল। সেণ্ট্রাল জেল হলে অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতেন। তাছাড়া এখানকার ক্যাপাসিটির বাইরে বন্দী ঢোকানো হচ্ছে।

কিন্তু এখনই নিশ্চয়ই ছাপিয়ে যায়নি ?

—শুনলাম, জেলে গোপন খবর এসেছে আরও প্রচুর বন্দী ঢোকানো হবে। জায়গা খালি রাখতে বলেছে। সবাইকে থালা, বাটি, কম্বল তাই দিচ্ছে না। যাকে কম্বল দিচ্ছে, তাকে থালা দিচ্ছে না, যাকে থালা দিচ্ছে তাকে হয়তো কম্বল দিচ্ছে না।

—থালা ছাড়া বন্দী খাওয়া-দাওয়া করবে কি করে। আর কম্বল ছাড়া কি মাটিতে শোবে ?

—এ-কথার উত্তর খুব ভালো আমার জানা নেই। তবে দেখছি একজনের খাওয়া শেষ হলে তার থালাটা আর একজন চেয়ে নিচ্ছে। আর এখন গরমকালতো মেঝেতেই দেখছি অনেকে গড়াগড়ি দিচ্ছে। যাক্, অনেক কথা হয়ে গেল, দেরী হয়ে যাচ্ছে ; চলুন, আপনাকে হেড ওয়ার্ডারের কাছে পৌছে দিয়ে আসি।

গুদামবাবু হেডওয়ার্ডারের হাতে শ্যামলকে পৌছে দিয়ে চলে গেলো। এরপর হেডওয়ার্ডার এক নম্বর ওয়ার্ডের তালার চাবি খুলে শ্যামলকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

দেবব্রত শ্যামলকে দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। একেবারে কোমর

জড়িয়ে ধরে চ্যাংদোলা করে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলার অবস্থা।—আরে, শ্যামল, এসো এসো ভাই। এখানেও আমরা জোট বাঁধি এসো। ভাবছিলাম, তুমিও নিশ্চয়ই আসবে।

শ্যামলের অবস্থা এমনিতেই কাহিল। তার ওপর দেবব্রতর সবল দুইবাহুর পেষণে জীবন বেরিয়ে যায় আর কী ? গলারস্বর না বেরুনোর অবস্থা।

—উঃ, নামিয়ে দিন দেবব্রতবাবু—বলে নিজেই যাহোক করে নিজেকে দেবব্রতর দুই বাহুর চাপ মুক্ত করে।

—তা শ্যামল, কিভাবে তুমি ধরা পড়লে ?

—সে-সব কথা পরে হবে খ'ন। এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত, একটু মুখহাত ধোব, বিশ্রাম নেবো। কোথায় জল বলো।

—আরে তুমি যখন আমাদের খপ্পরে, কোন অসুবিধাই হবে না। চলো মুখ হাত ধোবে চল। হলের এক কোণে জল ছিল। তার পাশেই পায়খানা, মূত্র-ত্যাগের জন্য একটা পাকা এক বুক উঁচু পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গা। পায়খানায় বেসিন পাতা আছে। তাতেই সবাই মলত্যাগ করে। ওরই পাশে দু-তিনজন একটা কম্বলের ওপর শুয়ে আছে। মুখহাত ধুয়ে সমস্ত অবস্থাটা দেখে শ্যামল চলে এলো।

কাপড়ের খুঁটে মুখটা ভালো করে মুছে নিয়ে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে শ্যামল বলে যে, আগেও সে এই জেলে এসেছে। একবার বিনাবিচারে আটক হয়ে, আর বার তিনেক বিচারাধীন বন্দী হিসেবে। জেলের হালচাল এখন দেখছি একে-বারে পাল্টে গেছে। তখন গ্রীষ্মকালে দু'খানা আর শীতকালে তিনখানা কম্বল। চাদর, থালা, বাটী এসব বন্দীকে দিয়ে তবে তাকে ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া হত।

—চরে খাও জেলের মধ্যে—বলে দেবেন এক পাক ঘুরে নিল।

এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে সদর ফটকের সব কিছুই দেখা যায়। শ্যামল সেইদিক মুখ করে চুপচাপ তাকিয়েছিল। কত মাল মালগুদামে ঢুকছে, তার হিসেব হচ্ছে, কোন ঝুড়ি যাচ্ছে জেল হাসপাতালে, কোনটা যাচ্ছে কিচেনে, কোনটা বা কনডেমড্ সেলে বা সাধারণ সেলে। সব কয়েদীরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েদীদের পরণে ময়লা জেলের মধ্যে তৈরী ফতুয়া আর হাফপ্যাণ্ট। লোকগুলোর বয়সের কোন বাছবিচার নেই, ষাট বছরের বৃদ্ধ বা ত্রিশ বছরের জোয়ান মরদের ঐ একই পোষাক।

দুজন সেপাইয়ের ওপর ভর করে কে যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফটকের খুপরী

দিয়ে গলে ভিতরে ঢুকলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে শ্যামল দেখল—গতকালের সদর থানার হাজতের সেই যুবকটি। ধরে ধরে তাকে এক নম্বর ওয়ার্ডেই পৌঁছে দিয়ে গেল ওয়ার্ডাররা।

দরজা ঠেলে ওকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দরজা তালাবন্ধ করে ওয়ার্ডার চলে গেল। শ্যামল তার কাছে চলে যায়। হাত ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

—ভাই, আপনি কম্যুনিষ্ট। সেদিন তো কিছু বল্লেন না।

—সেদিন কি আপনার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক আলাপ ছিলো। মজার ব্যাপার শত্রুপক্ষই আমাদের বন্ধুদের পরস্পরকে চিনিয়ে দিচ্ছে। এই দেখুন না, আপনি আমি পরস্পরকে চিনতাম না। ওদের খাতায় কিন্তু আমাদের পরিচয় আছে। কারাগারে আমাদের একই ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

—আপনার নাম ?.

—সঞ্জয় দে।

—বাড়ী ? এই শহরেই বাড়ী। তবে গ্রেপ্তার করে এনেছে গ্রাম থেকে।

সবাই মিলে যার কাছে যা দেবার মতো ছিল দিয়ে সঞ্জয়কে সাহায্য করলো, কেউ কিছু খাবার দিল। ওকে আবার কম্বল, থালা কিছুই দেয়নি। ব্যাণ্ডেজের কাপড, ওষুধ, ডেটল সব জড়ো হয়ে গেল।

সঞ্জয়কে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। ক্লান্তির ভাব স্পষ্ট চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

—দেখুন আমি এখন একটু শুয়ে পড়ি। সব ঠিক করা যাবে পরে। ওকে সবাই বিশ্রাম করতে দিয়ে যে যার জায়গায় চলে গেল।

রোজই সকাল থেকে জীবনরতন হলের সামনে জেলসুপারের কেশ টেবিল বসে। সকাল হতে না হতেই রাজনীতির নামগন্ধহীন কয়েকজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী চেয়ার, টেবিল সাজায়। চারদিক ঝাঁট দেয়, টেবিল, চেয়ারে চাদর পাতে। সাহেব মানে সুপার আসবেন সকাল নটায় শোভাযাত্রা করে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন জেলর, ডেপুটি জেলর, হেডক্লার্ক, ক্লার্ক, লাঠ হাতে বড জমাদার, গুদামীবাবু, দুজন ওয়ার্ডার, একজন মেট, সাহেব আসার আগে বড় জমাদার একবার এসে সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সমাধান হয়েছে কিনা দেখে যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেলে কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় সেন্ট্রি মোতায়েন করে যাবে। এই সময় জেলের মধ্যে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের তালা চেকআপ করা হয়। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কাল ফিতে-ওয়ালা ‘পাহারা’, এরাও কয়েদী। তবে মেয়াদ শেষ হতে চলেছে।

নতুন আসামীদের বলা হয় 'আমদানী'। বড জমাদার ওপর থেকে হুঙ্কার ছাডবে—"এ্যাই আমদানী তোমরা জোড়ে জোডে বসে যাও।" আদেশ কানে পৌঁছানো মাত্র জোড়া জোডা উঁচু হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পডে। এইভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না সাহেবের উপস্থিতেতে মিনতি শেষ না হয়। এভাবে দুঘন্টাও থাকতে হতে পারে আর কোন কোন দিন চারঘণ্টাও হতে পারে।

কেরাণী বাবু এসে প্রত্যেকের নামধাম মিলিয়ে নেয়। শরীরে যার যা স্পষ্ট খুঁত আছে তার দুটো চিহ্ন অন্ততঃ বন্দীর কার্ডে লেখা থাকবে। সেটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মিলিয়ে নেয়। কেউ ঐ একভাবে হাঁটু মুডে বসে থাকতে না পেরে যদি একটু আলগা হয়ে যায় আর তা যদি বড জমাদারের চোখে পড়ে, তাহলে আর রক্ষা নেই। বড জমাদারের বজ্রকণ্ঠ থেকে খিস্তি বেরিয়ে আসে।

দশটা বেজে গেছে তবু সাহেবের ঢোকার চিহ্নমাত্র নেই। তিন ঘণ্টা হল হাঁটু মুডে 'আমদানীরা' বসে আছে। হঠাৎ বড জমাদার হুঙ্কার দিয়ে গর্জে উঠল। 'সাবধান'। বোঝা গেল সাহেব এবার আসছেন। তাঁর আসার সময় হয়েছে। সাহেব আসছেন, সাহেব আসছেন বলে বন্দীরা ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে।

বিরাট লৌহদ্বার দুদিক থেকে খুলে গেল। সাহেব ঢুকলেন, সঙ্গে শোভাযাত্রা। মাটিরদিকে মুখ চেয়ে গট গট করে উনি উঠে এলেন জীবন রতন হলের সাজানো চেয়ারে। বন্দীরা বড জমাদারের গলার বিকট আওয়াজে আবার লাফিয়ে উঠল। সকলে দাঁডিয়ে দুহাত তুলে দিলে সেলাম করে। দু'চারজন কপালে হাত ঠেকাল না। ওরা রাজনৈতিক বন্দী, এটা রেওয়াজে দাঁডিয়েছে।

বন্দীদের বুক দুরু দুরু। চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে জেলের ডিপুটি, গুদামীবাবু, বড জমাদার, মেট এরা সবাই, যেন এরাও আসামী। চোরের মতো সাহেবের পিছনে সব দাঁডিয়ে। কেরাণীবাবু একজন করে বন্দীর নাম ডেকে তাকে নিচে সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াতে বলেন। বন্দী সামনে এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম ঠোকে। কেরাণীবাবু তার নাম উচ্চারণ করে বাবার নাম বলে দেয়, কবে তাকে কোর্টের তারিখ তাও বলে দেয়। যার সাজা হয়েছে তাকে বলে দেয় কতবছর বা মাসের সাজা। তখন থেকে তাকে জমাদারের লাঠির ডগায় চলতে হবে। জেলরবাবু তার খাটনা ঠিক করে দেবেন। বিনা-বিচারে আটক বন্দীরাও এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা যেন একটু খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। জেলের বন্দীদের মধ্যে সর্বময়কর্তার কাছে কারুর কিছু বলার

থাকলে এইখানে এসে জানিয়ে যাবে।

লাইন থেকে একজন সাজাওয়ালা বন্দী দাঁড়িয়ে ওঠে। সে জানায় তার একখানা পোষ্ট কার্ড দরকার বাড়ীতে চিঠি লিখবে। একজনের একখানা পিটিশন ফর্ম চাই। এক কোণে একজন বন্দী অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে। বড় জমাদার বেশ জোর গলায় জানাল—"শোভান কাল তুই আকবরের সঙ্গে মারামারী করেছিস্। চাকু চালিয়েছিস্। তোর কি বলার আছে বল্।" চুপ করে থাকে শোভান। শোভান আর আকবর একই পাড়ায় পাশাপাশি বাস করতো। দুই বন্ধু। কি হল। একদিন রাস্তার ড্রেনকাটা নিয়ে ওদের দু'জনার মধ্যে খুনো খুনি হয়ে যায়। কোর্টের বিচারে দু'জনেরই দু'বছর করে সাজা হয়। জেলে এসেছে ওরা একবছর হয়ে গেল। একই ওয়ার্ডে থাকে। একজন ডাল চাকীতে ডাল ভাঙ্গে আর একজন তাঁতকামানে তাঁত বোনে। সন্ধ্যার পর দুজনেই একসঙ্গে ঢোকে সেলে। পাশাপশি সেল। দারুণ চেহারা দু'জনেরই। কাল বিকালে জেলের সামনে চাতালে বসে দুইবন্ধুতে গল্প করছিল। শোভানের কাছে খবর এসেছে ওর বৌ নাকি বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। বিয়ে হওয়ার পর মাত্র ছ'মাস পার হওয়ার পর শোভান মারামারি করে সাজা পেয়ে জেলে চলে গেল। শোভানের বউ কেন তাকে ছেড়ে গেল এই নিয়ে শোভান বলছিল। হঠাৎ আকবরের কি একটা কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো শোভান। কোমরের থেকে চকচকে চাকুটা বার করে আকবরের কোমর ঘেঁসে চালিয়ে দিল। আকবর সামান্য সরে যেতে পেরেছিল বলে প্রাণে বেঁচেছে, কিন্তু এখন জেল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

জোড়হাত করে শোভান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়ে জেলরবাবু বলেন—"কি তোমার কিছু বলার থাকলে সাহেবকে বলো।" অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শোভান বলে—"হুজুর, আমার রক্ত হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল, মাপ চাইছি।" সাহেবকে হিষ্টরী টিকিটটা এগিয়ে দিল বড় জমাদার, শোভানের দশদিন রেমিনান কাটার আদেশের কথা ঘোষণা করলেন জেলর। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে দশদিনের জন্য ডাণ্ডাবেড়ী। কনডেম্‌ড্ সেল।

কেস টেবিলের কাজ শেষ করে সাহেব এবার শোভাযাত্রা নিয়ে সারা জেলখানাটা ঘুরে দেখতে বের হন। এই রকম একদিন কেশটেবিলের পর তিন নম্বর সেলে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন এক রাজবন্দীর। জেলখানার অব্যবস্থার প্রতিবাদে উনি লাগাতর অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ নিয়ে পঞ্চম দিন হল। ডাক্তারের রিপোর্ট বলেছে বন্দীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। তাকে অনশন থেকে বিরত

থাকতে বলা উচিত ; তাই সুপারের খোঁজ-খবর নেওয়া। সুপার সব শুনে 'কোর্ট ফিডিং'য়ের আদেশ দিয়ে গট গট করে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বন্দী সাহেবের কাছে তার কিছু আরজি আছে বলে জানালেন। সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন—কি আপনার বলার আছে বলুন। আমরা রাজনৈতিক কর্মী। সরকার যদি রাজবন্দীর মর্যাদা আমাদের দিয়ে না থাকেন বা তাঁদের বিরোধীদের রাজবন্দীর মর্যাদা দেবার ইচ্ছা না থাকে তো আপনারাও কি অমানুষের মতো ব্যবহার করবেন। সুপারকে চুপকরে থাকতে দেখে অনশনরতী বলে চলেন—আমরা জেলে মেঝেয় শুচ্ছি, কম্বল পাচ্ছি না। একটা খাবার থালা পাচ্ছি না। হাসপাতালে চুলকানি হচ্ছে বললে ডাক্তারবাবু পেটের অসুখের ওষুধ দেন। দুপুরে ভাতে কাঁকর ধান, দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ-সবের কি কোন পরিবর্তন হবে না ?

—আপনি অনশন ভাঙ্গুন তারপর ওসব নিয়ে আলোচনা করবে। পাশের সেল থেকে আর একজন রাজনৈতিক কর্মী সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন—আমরা কি এখানে পিকনিক করতে এসেছি ? গরাদখানায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, অথচ থালা, কম্বল পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। রোজই তো বিকালে রাত্রের জন্য চারখানা করে বজরার রুটি দেওয়া হচ্ছে, তাও আবার পোড়া। জেল কোডে কি আছে যে বন্দীদের জোয়ার বজরার রুটি দিতে হবে। একশ সাতচল্লিশ গ্রাম চালে কার পেট ভরে ? এত কথার তোড়েও সুপার এবং উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি জেলর-এর সঙ্গে ফিসফাস কথা বলতে বলতে কনডেম্ড্ সেলের দিকে চলে গেলেন।

সাহেবকে আসতে দেখে কনডেম্ড্ সেলে পাহারারত সিপাই বুট ঠুকে সেলাম করে খাড়া হয়ে গেল। এতক্ষণ খৈনী টিপছিল। খৈনী দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শোভাযাত্রা এসে থেমে গেল। সেলের মধ্যে লোহার গারদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরে শোভান। তারপরের সেলে ডাণ্ডাবেড়ী দেওয়া দশবছরের সাজায়ওলা আসামী ব্যাঙ্ক ডাকাত 'রাজা' তার পরেরটায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত জোতদার খতমকারী প্রভাস গোস্বামী তারপরেরটায় ফাঁসির আসামীর ঘর। সেটা এখন ফাঁকা পড়ে আছে।

সাহেবকে দেখে শোভান বলে—হুজুর আমার কিছু বলার আছে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সুপার। জিজ্ঞেস করলেন—বল, তোমার কি বলার আছে।

—হুজুর, আকবর বেঁচে আছে তো ? সে ভালো হয়ে উঠেছে ?

সে খবরে তোমার কি দরকার। তুমি তো ওকে জেলের মধ্যেই খুন করতে

গেছলে। চুপ করে রইলো শোভান। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জেলর বলেন—কি চুপ করে আছো কেন ? বল তোমার কি জন্য তার খবর দরকার ?

হুজুর সে আমার প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু। খোদার নামে কসম, আমি আর ওকে মারবো না।

—তুমি কি এখন থেকে ভালো হয়ে চলবে ! জিজ্ঞেস করল সুপার।

—হ্যাঁ হুজুর বাকী মেয়াদটা ভালোভাবে কাটিয়ে ঘরে ফিরে যেতে চাই।

—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় শোভানের যে তার বউ তো তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাকে তাহলে তো আবার সাদী করতে হয়। একবার যাকে ভালবেসেছিল তার কথাই সারাজীবন মনে রাখবে না আবার সাদী করবে সারাদিন রাত শুধু এই চিন্তাই করে থাকে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীর গারদের সামনাসামনি হতে সে দূরে সরে গেল। দূর থেকে সে বলে ওঠে—বুর্জোয়া ব্যবস্থা আমি মানি না তার কাছে আমার কিছু বলার নেই।

সুপার যাবার সময় জেলরকে আর বড় জমাদারকে বলে গেলেন—শোভানের পায়ের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দিতে। তবে সে এখন 'কনডেমড্ সেলে'ই থাকবে। কারণ জেলের মধ্যে চাকু চালানোর অপরাধে তার বিরুদ্ধে পৃথক একটা কেশ চালু হয়েছে।

সাতনম্বর ওয়ার্ডে সার্চ শুরু হয়েছে। সুপার, জেলর, জমাদার, সেপাই সব সদলবলে ঢুকেছে। কম্বল থালা বাটী সব ওলট পালট চলছে। টান মেরে সব ঘরের মধ্যেই দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জলের কলসীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখা হচ্ছে তারমধ্যে কেউ কিছু ঢুকিয়ে রেখেছে কি না ? হয়তো সার্চ করলে জলের কলসীর মধ্য থেকে ধারালো চাকু বের হবে। বন্দীরা সবাই কনভিক্ট। সাজাপ্রাপ্ত আসামী। সবারই ফতুয়ার পিছন দিকে একটা নম্বর উল্লেখ করা। ওটা ধরেই তাকে ডাকা হয়। বন্দীরা দূরে একজায়গায় জোড়ে জোড়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সার্চ শেষ করে বের হবার মুখে সারা গায়ে খুজলী চুলকাতে চুলকাতে একজন বন্দী ক্ষীণকণ্ঠে একটা পোষ্টকার্ড চাইলো সাহেবের কাছে। সাহেব জেলরবাবুর দিকে তাকালেন। জেলরবাবু বড় জমাদারের দিকে, বড় জমাদার কেরাণীবাবুর দিকে তাকালেন। কেরাণীবাবু দেখিয়ে দিলেন গুদামীবাবুকে। হাত জোড় করে ক্ষীণজীবী বন্দী সেইভাবে দাঁড়িয়েই থাকলো। শোভাযাত্রা সিংহ দ্বারের কাছে পৌঁছে গেল। একনম্বর ওয়ার্ড সার্চ করা হয়নি। সম্প্রতি

বন্ধ হয়েছে ঐ ওয়ার্ডে যাওয়া। সাহেবরা যেতেই বিরাট সিংহদ্বার আবার তুফাঁক হয়ে গেল। সুপার, জেলর থেকে সেপাই পর্যন্ত সকলে মূল ফটক দিয়েই অফিসে ঢুকে পড়ল। সিংহদ্বার কেবল সুপার জেলরের জন্য খোলা হয়। অন্যরা অন্যসময় সিংহদ্বারের মধ্যে ছোট্ট দ্বারটি দিয়ে মাথা হেঁট করেই প্রবেশ প্রস্থান করে।

জেল অফিসে হুলুস্থূলু পড়ে গেছে। কি করে জেলের মধ্যে এটা সম্ভব হল? তাহলে কি ওয়ার্ডাররা ঠিক মতো ডিউটি দেয় না। বড় জমাদার কি করে? বসে বসে কি কেবল খৈনী টেপে? কনভিক্টদের সঙ্গে কি রাজনৈতিক কর্মীদের যোগাযোগ আছে, না ওয়ার্ডারই একাজ করেছে? জীবনরতন হলের দেওয়ালে পোষ্টার পড়েছে। ডেপুটি জেলর খুবই উত্তেজিত। ওকে যে বড় সাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। শোভাযাত্রা নিয়ে চলে আসার পরই নাকি এ কাণ্ড ঘটে গেছে। পোষ্টারটা যে লিখেছে উঃ কি সুন্দর তার হাতের লেখা। যেন ছাপার অক্ষর। মোটা মোটা লাইন, লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট। দূর থেকে চোখে পড়ে। তিনচার রকম রঙ দিয়ে বুলিয়েছে। "আধা ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাস নিপাত যাক" পোষ্টার পড়েছে।

ডেপুটি জেলরকে অফিসের সবাই 'ডেপুটি জেলর' না বলে 'ডিপ্‌টিবাবু' বলে অভিহিত করে। ডিপ্‌টিবাবুর হৈচৈ সবশেষে সাহেবের কানে গেল। শুনেই তো সাহেবমশাই তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। আদেশজারী করলেন—অ্যাই, বড় জমাদারকে ঐ পোষ্টারটা ছিঁড়ে আনতে বল। এখনই আনতে হবে। বল্লেন—এতো সাহস কার হল। বড় জমাদার ডিপ্‌টিবাবুর ভয়ে সিঁটিয়ে সুপারের ঘরে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। ওরা দাঁড়িয়েই আছে। এদিকে যেন সুপারের লক্ষ্যই নেই। এইভাবে কয়েকমিনিট কাটারপর খুট করে বড় জমাদারের বুটের শব্দ হলে চোখ তুলে এবার তাকালেন সুপার সাহেব। চোখের রঙ রক্ত-জবার মতো লাল দেখে ভয়ে সিউরে ওঠে দুজনায়। ডিপ্‌টিবাবুই প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন—স্যার, পোষ্টার পড়েছে।

সুপার প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—"জেলের মধ্যে পোষ্টার পড়লো কি করে খোঁজ নিয়েছেন? আপনার মতো অপদার্থ ডেপুটিবাবু এই জেলে চলবে না, আপনাকে আমি শাস্তি দেবো। আজ থেকে আপনি পায়ে বুট পরতে পারবেন না।" যান্ চলে যান্ ও বড় জমাদারবাবু, আপনি ভিতরে কি রকম ডিউটি দেন। আমরা চলে আসার পর খোদ কেশ টেবিলের জায়গায় পোষ্টার পড়ল এটা কি জেনেছেন? জোড়হাত করে সে বিনীতভাবে বলল—হ্যাঁ হুজুর, সব শুনেছি।

কিন্তু আমি তো ঐ সময় তাঁতকামানে কাজ দেখছিলাম। আমি দেখিনি হুজুর ক ঐ পোষ্টার মেরেছে ?

—পোষ্টারটা মারার আগে তো লেখা হয়ে ছিল ? তার আগে তো লেখার সাজসরঞ্জাম জাগাড় করতে হয়েছে। তারও আগে তো কয়েকজনে মিলে বসে প্ল্যান করেছে। চা এতগুলো কাণ্ড চার-দেওয়ালের মধ্যে ঘটে গেল, আর আপনি কিছুই জানেন না লে পার পেতে চাইছেন। ওসব হবে না, আপনাকে আমি শাস্তি দেবো। আজ থেকে আপনি মাথার টুপি পাবেন না। যান্ চলে যান্। ন্যাকামী করতে এসেছে এখানে। হুজুর, আমি তাঁতকামানে ছিলাম ওরা দুজনে ধীর পায়ে চলে যাবার সময় শুনে গেল। সাহেব বলে চলেছে—শালা দাঁড়া ঐ তাঁতকামানে তোমাকেও পাঠাচ্ছি। উঃ, আমি মন্ত্রীর কাছে, সরকারের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবো। উঃ, কল্পনা করা যায় ? জেলের মধ্যেও পোষ্টার মারা হচ্ছে। আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি হলো বলে। এইসব অপদার্থ লোকগুলোকে নিয়েই আমার চাকরী।

এক নম্বর ওয়ার্ডেও হুলুস্থুলু পড়েছে। খবরের কাগজে এসেছে। দৈনিক কাগজে এই জেলের মধ্যে যেসব দুর্নীতি আছে তা ফলাও করে বেরিয়েছে। বিধানসভায় নাকি আলোচনা হয়েছে। কাগজে যেভাবে বেরিয়েছে তা খুব নির্দিষ্ট। যেমন জেলর সুপারের বাড়ীতে কাজ করানো হচ্ছে কয়েদীদের। তাদের ঘরের কাজগুলোও করানো হয়। অসুস্থ বন্দীদের দুধ খাওয়ানোর জন্য দুটো বড় দুধেল। গাই ডিপুটিবাবুর বাড়ীতে রোজ দুধ দিচ্ছে। জেলে মাংসের দিনে বন্দীরা মাংসের বদলে শুকনো হাড়কুঁচো দেওয়া হচ্ছে। ভাত কম দেওয়া হচ্ছে। রাত্রে বজরা বা জোয়ারের রুটি চারখানা করে দেওয়া হয়। মাংস গেট থেকেই সুপার, জেলর, জমাদাদের বাড়ী চলে যাচ্ছে। ইণ্টারভ্যু য় বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একদিকে যেমন দুঃসাধ্য, অপরদিকে তেমনি টাকা ফেললে সকাল দুপুর বাছবিচার করা হয় না। খাসির মাংসের বদলে একদিন শুকরের মাংস জেলগেটে এসে ধরা পড়লে বেশ হৈচৈ পড়ে যায়। বন্দীরা কম্বল থালা পায় না ; কিন্তু কম্বলগুলো একটাকা পিসরেটে চারদেওয়ালের বাইরে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। একাজ করা হচ্ছে সিপাইদের দিয়ে। শেষমেষ সব বৃত্তান্ত টিফিনের কৌটোর মধ্যে পুরে একটা কাগজে সব লিখে বাইরে পাঠানো হল।

ডেপুটিবাবু শ্যামলকে ডেকে এনে বসলেন অফিসের মধ্যে।—হ্যাঁ মশাই। আপনাদের সব চেক করা হয় না বলে আপনারা সব কিছু বাইরে পাচার করছেন।

হাঁ করে ডেপুটিবাবুর কথাগুলো যেন গিলছিল শ্যামল। ডেপুটিবাবু বলেন—

দেখেছেন আজকের কাগজ ?

—না, কৈ দেখি।

—এই যে। এইখানটা পড়ুন। ওসবতো তার ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়া শেষ। তাই সে বললে—আপনারা মশাই ঠিক হন, কাগজে এসবের হবে না।

দিনকয়েক পরে অফিসে সংবাদ এলো বিধানসভা জেলসুপারকে জানিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই জেলের সব কিছু পরিদর্শন চলবে। ভাতও মেপে দেখা হবে। বন্দীদের চোরাগোপ্তা পাঠানো অভিযোগ সত্যি কিনা খতিয়ে দেখা হবে।

সারারাজ্যের জেল পরিদর্শক মশাই এলেন জেলের অব্যবস্থা দেখতে। রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁর কাছে তাদের অভাব অভিযোগ জানাবার সুযোগ করে দেবার দাবী জানালো।

এক নম্বর ওয়ার্ডের গেটে তালা পড়ে গেছে। ঘরের দরজায় তালা দিতে পারেনি। কারণ তার আগেই বন্দীরা ঘর থেকে সামনের চাতালে নেমে শ্লোগান দিতে শুরু করেছে। ওয়ার্ডের বাইরে জনপ্রাণী নেই। রাজ্যের জেল পরিদর্শক আসবেন। সাজ্যাতিক ব্যাপার। নিস্তব্ধ কারাগারের বেলগাছটার ডালে ঘুঘু পাখীর ডাক স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আরও কত নাম না জানা পাখীর কণ্ঠ, পাখীর ছোটাছুটির মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেণ্ট্রিরা অনাগত কোন ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে।

রাজ্যের বড়সাহেব সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। কোন কোন সেপাইদের আরও আড়ষ্ট হতে দেখা গেল। এদিকে এক নম্বরের রেলিংয়ের ধার ঘেঁসে রাজনৈতিক কর্মী বন্দীরা বড়সাহেবের মুখোমুখী হবার জন্য উদ্‌গ্রীব। জেল হাসপাতাল যাবার পথে বড়সাহেব এক নম্বরের পাশদিয়ে গেলেও যেন কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মুখে প্রবল গাম্ভীর্য নিয়ে একদল অফিসার আর সেপাই নিয়ে সেদিকে গটগট করে চলে গেলেন। বন্দীরাও আগের থেকে আরও প্রবলভাবে দাবীর কথা সোচ্চারে উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরতে লাগল। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। 'রাজনৈতিক কর্মীদের রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।' 'জেলে রাজনৈতিক কর্মীদের অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে রাখা চলবে না।' এমন নানান ধরনের শ্লোগান।

ফেরার পথে আবার বিক্ষোভের মুখোমুখি। এবার থালা বাজানোর প্রবল আওয়াজ! বন্দীদের থালা, বাটী, কম্বল দিতে হবে—দিতে হবে। এমন নানান ধরনের দাবী শুনে বড়কর্তা একমুহূর্ত এক নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

একজন সামনে এগিয়ে রেলিং ধরে বলে—"আমাদের ওয়ার্ডে ষাটজনের বেশী তেই যেখানে ধরে না, সেখানে জোর করে একশ'র ওপর বন্দী এক জায়গায় হয়েছে। পিছন দিকে দুটো ওয়ার্ড পড়ে রয়েছে, তবু সেখানে জায়গা ওয়া হচ্ছে না।"

বড়সাহেব উত্তর দিলেন—আপনারা যখন সরকারে ছিলেন, তখন কারা-ন সংস্কার করেননি কেন? জানেন তো আপনারা—যখন সরকারে থাকবেন তখন জেলখানায় আপনাদের আসতেই হবে।—কিন্তু জেলকোডে আমাদের টুকু দেওয়া আছে, তাও কি আমরা পাবো না?

—না না সে তো পাবেনই। সুপার জেলরের দিকে তাকিয়ে তাদেরই দেশ্য করে বল্লেন—আচ্ছা আপনারা জেলকোড ধরে সুযোগ-সুবিধা দেন না। ঙ্গ সঙ্গে সুপার জেলর দুজনেই ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ স্যার, আইন অনুযায়ীই দিই র। বলে হাঁকতে লাগল।

—তবে আপনারা তাহলে সবকিছুই তো পান? চলুন চলুন অনেক কাজ ছে। আপনারা যদি আবার কখনো ক্ষমতায় আসেন, তখন প্রথম কারা-আইন শোধনের দিকে একটু নজর দেবেন। এইবলে তিনি আবার সদলবলে চলতে ং করলেন।

বিরাট বিরাট সেকড চালানো বটগাছটার তলায় বিকালে জনসভা হচ্ছে। ত্যেক ওয়ার্ডের দেওয়ালে দেওয়ালে জনসভার পোষ্টার পড়েছে। মিটিং হবে। লোচ্যবিষয় রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে। সব য়ার্ড থেকেই বন্দীরা বেরিয়ে এসেছে। বিকেল চারটায় গেটগুলোর তালা লে দেওয়ার নিয়ম। বক্তারা বক্তৃতা করছেন। ঠিক যেন জেলের বাইরে কাশ্য কোন জনসভা, কয়েকশত বন্দী বক্তাদের সামনে বসে পড়েছে। প্রথমে -চাবটে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হল। তারপরই সভাপতি নির্বাচন ও বক্তৃতা। ক্তৃতার মাঝে ঘন ঘন হাততালি। প্রবল উত্তেজনার মুহূর্ত। মাঝে মাঝে দু-একজন বন্দী চারপাশ তাকিয়ে নিচ্ছে তাদের মিটিংয়ে কেউ বাধা দিতে সছে কিনা?

এরমাঝে কখন বড় জমাদার ফাইল নিয়ে ঢুকেছিল, সঙ্গে ছিল পাহারা, মেট, কজন সেপাই আর রাত্রের জন্য রুটির ডালা, ডালের বিরাট বালতি। স্তু কে খাবার ধরবে। সবাইতো মিটিং শুনছে। অবস্থা দেখে বড় জমাদার ন্দীদের শিক্ষা দেবার জন্য রাত্রের খাবার ফেরৎ নিয়ে চলে গেছে। আর ডাকলেও

আসবে না।

মিটিং শেষে ঘটনাটা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন করারও কিছু নেই। এক নম্বরের বন্দীদের যাদের সাক্ষাতকারের সময় বাড়ী থেকে চিঁড়ে মুড়ি, পাঁউরুটি এসেছিল তা অন্যান্য বন্দীদের মধ্যে ভাগ করে খাওয়া হল। এইভাবে সেই রাত্রিটা গেল কেটে।

এইভাবেই রাত কাটে, দিন আসে। সহমর্মীতা নিবিড় হয়ে ওঠে। তবু যেন কেউ কেউ মুক্তির জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল শ্যামলের। খুট করে আওয়াজ। কে যেন ঘরের মধ্যে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে। চারদিকে লক্ষ্য করে এতবড় হলের মধ্যে কোন্ খান থেকে আওয়াজ আসছে। ঠাওর করতে পেরে একটা কোণে পা টিপে টিপে চলে যায়। যেন অন্য কারুর ঘুম না ভাঙ্গে। একসঙ্গে সেদিন একশ পঁচিশজন সারদিয়ে ঘুমোচ্ছে।

—ও, কে? শ্যামল?

—হ্যাঁ, কি করছেন একা বসে বসে।

—কিছু না, এমনি।

—অমল দা, আপনি কাঁদছেন?

—না, না কাঁদছি না, বলে কাপড়ের খুঁটে অমল চোখের জল মুছলো। তারপর খানিক মুহূর্ত বাদে বলে—দেখো, ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে ছেলে মেয়ে বৌ সব রয়েছে। তাদের কথা ভেবেই অস্থির হচ্ছি।

—কিন্তু আপনি যদি এভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তাহলে আপনার থেকে বয়সে ঢের ছোট যারা তাদের কিভাবে স্থির রাখবো বলতে পারেন?

—না ভাই, তুমি আমাদের মতো ছাপোষা মানুষের সমস্যা বুঝবে না। তুমি কি বুঝবে, সংসার তো করলে না।

ছিন্নভিন্ন ফতুয়া গায়ে অশীতিপর এক বৃদ্ধ এক নম্বরের বাইরের নারিকেল গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। জানালার ধারে বসেছিল চুপচাপ করে শ্যামল। বৃদ্ধ হাতে কিছু ছেঁড়া কাগজ নিয়ে জানালার ধারে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো। এক কয়েদী গাছের পাতাগুলো নীরবে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে যাচ্ছে। বৃদ্ধকে জানালার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ঝাঁটা হাতেই বৃদ্ধের দিকে তেড়ে এলো। ততক্ষণে বৃদ্ধ এক নম্বরের জানালার কাছে পৌঁছে গেছে। শ্যামল কয়েদীকে কিছু বলতে নিষেধ করে বৃদ্ধকে বলল—আপনি কিছু বলবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার এই কাগজগুলো পড়ে কি লেখা আছে একটু বুঝিয়ে
লে দেবেন ?

শ্যামল তার হাত থেকে কাগজপত্রগুলো নিয়ে খুব মনোনিবেশ সহকারে পড়তে
াকে।

—"বাবু ওরা বলছে আমার নাকি ফাঁসি হবে।" কথাগুলো বলতে বলতে ওর
াখে জল ভরে আসে। বৃদ্ধের গলার স্বর আটকে যায়।

—কোন্ ঘর থেকে আপনাকে একথা বলেছে ?

—ঐ ঘর থেকে—"বলে বৃদ্ধ সাতনম্বর ওয়ার্ডের দিকে হাতের আঙ্গুল তুলে
দখায়।" সাতনম্বরে থাকে নকশালপন্থীরা এবং কিছু নাম করা বিচারাধীন
াকাত।

কাগজগুলো পড়া শেষ হলে বৃদ্ধকে শ্যামল প্রশ্ন করে আপনার বাড়ী
কাথায় ?

—আজ্ঞে, আরামবাগ।

—কি করেন সেখানে ?

—আজ্ঞে বাবু। দুবেলা ভিক্ষে করে খাই।

অবাক বিস্ময়ে একবার কাগজগুলোর লেখার উপর আর একবার বৃদ্ধের মুখাবয়বের
িকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—সেকি, ভিক্ষে করে খান। একজন ভিক্ষুককে মিশায় ?

বৃদ্ধের ওপর বিনাবিচারে আটকাদেশ জারি করা হয়েছে। এগুলো সেই
ংক্রান্ত কাগজপত্র। বর্ণিত অভিযোগ মোটামুটি এইরূপ :—এই ব্যক্তি "অমুক"
ামে বিকেল পাঁচটার সময় পার্টির এক গোপন সভায় উপস্থিত থেকে
বধ উপায়ে নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে জোর করে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা
রেছিল। ব্যাঙ্ক ও পোষ্টঅফিস লুঠ করার ষড়যন্ত্র সমেত ডিনামাইটের সাহায্যে
লাইন উড়িয়ে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত করেছিল। এই ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রামে
হারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের মধ্যে লাল
তঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল···ইত্যাদি ইত্যাদি···। সত্যি প্রশাসনের যেসব কর্তারা
ঁসব আটকাদেশ জারী করেন তাদের প্রশাসনিক দক্ষতার তারিফ না করে পারা
য় না। তা না হলে রাস্তা থেকে ভিখারীকে ধরে আনা। এ ব্যক্তিতো ঐসব
াখা চোখা শব্দ জীবনেও কখনো শোনেনি। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ঐ ভিক্ষুক কি
তি করলো !

শ্যামল বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে বলে—ও এমন কিছু নয়। একটা পিটিশন ফর্ম

ডেপুটিবাবুর কাছ হতে চেয়ে নিয়ে আসবেন। বোর্ডে এর জবাব আমিই লি দেবো। আপনি কাগজ পত্রগুলো আমার কাছে রেখে যান। 'যে আজ্ঞে' ব বৃদ্ধ আবার ধীর পদক্ষেপে ফিরে গেলো।

এক নম্বরে 'গিনতী' করে কখন জমাদার চলে গেছে। এক নম্বর ওয়া বন্দীদের দুপুরের আহার মাথায় করে বয়ে এনে নামালো তিনজন সাজাপ্র কয়েদী। যারা কম্বলে শুয়েছিল তাদের টেনেটেনে তুলতে হচ্ছিল। কিছুক্ষ মধ্যেই ওয়ার্ডের মধ্যে বিরাট লাইন পড়ে গেল। থালা যাদের আছে তা লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। কনভিক্টদের তিনজনের মধ্যে একজন এক হাতা ক ভাত থালায় তুলে দিচ্ছে। আর দু'জনের মধ্যে একজন ডাল আর একজন কুমড়ে ঘ্যাট দিয়ে চলেছে। পরপর নিচ্ছে আর লাইন এগিয়ে চলেছে। মাঝখা একজনের থালায় ডাল ঢালতে গিয়ে উঠে এলো একটা সম্পূর্ণ পাখীর বাস বেশ চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। চেঁচামেচির শব্দ শুনে বড জমাদার এসে উপস্থিত ওঁকে পাখীর বাসাটা দেখিয়ে বন্দীরা প্রতিকার দাবী করতে থাকে। বড় জমা প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে ফিরে গেলেন। এটাই বোধহয় বরাবরের বিক্ষো প্রশমনের ওষুধ।

বিকালে রুটির ডালা মাথায় করে কনভিক্টরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘোরে। স থাকে একজন করে সেপাই। হাতে তার একখানা লাঠি, পায়ে চটি, প খাঁকিরঙের হাফপ্যাণ্ট ও ট্রাউজার্স। বেল্ট বলে কোমরে কিছু নেই। সাত ন মাথা থেকে ভারী ডালা মাটিতে নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জহর। কখন স আসবে। এখানে লাইন দিয়ে আহার নেওয়ার বালাই নেই। দু-একজন এ রাত্রের আহার নিয়ে সবে মাত্র খেতে শুরু করেছে। এমনসময় আচমকা সাতন একজন বন্দী সজোরে জহরের মাথায় লাঠি বসিয়ে দিল। জহরের মাথা ফি ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটলো। সেপাই কিছু বোঝবার আগেই রুটির ডালা ফে দিয়ে পালিয়ে গেছে জহর। এক অভাবনীয় পরিস্থিতি। এক ধরনের স ডেকে আনা হল।

সাজাহান নামে দশবছরের কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একগাদা ঝাঁকড়া চুল এক কনভিক্ট কোথা থেকে বেরিয়ে কয়েদী ভাইসব বেরিয়ে এসো, জহরে ফেটেছে—বলে চিৎকার শুরু করে দিল। কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয় বন্দীরা ইতস্ততঃ ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। তারপর দুমদাম করে দরজায় মারার আওয়াজ। সাতনম্বরের ঢোকার প্রথম দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়

সকলেই উত্তেজিত। বিনাদোষে কেন জহরের মাথা ফাটানো হল? শোধ নিতে কনভিক্টদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

হঠাৎ বেজে উঠলো ঢং ঢং শব্দ। জেলের অফিসের মাথায় অবস্থিত চৌকি থেকে একজন সেপাই পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে হুইসেলের আওয়াজ। যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রবেশ দরজা, গেটে ঝটপট তালা পড়ছে। কে কোন্ ওয়ার্ডে আশ্রয় নিচ্ছে তার কোন ঠিক নেই। ওয়ার্ডের মধ্যে সকলে লাইন দিয়ে হাঁটু মুড়ে জোড়ে জোড়ে বসে থাকে। ততক্ষণে লৌহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। লাঠি হাতে সেন্ট্রিরা দৌড়ে দৌড়ে ভিতরে ঢুকছে। ওদের মধ্যে কেউ ফুলপ্যান্ট, কেউ হাফপ্যান্ট, কেউ বা পরনে লুঙ্গি পরেই ছুটে এসেছে। সারা জেলখানায় একদল সেন্ট্রি ছুটতে থাকে। রাইফেল নিয়ে দৌড়ে এল কয়েকজন সেন্ট্রি। ভিতরে ঢুকলেন সুপার, জেলর, আর তাঁদের দলবল। শূন্যে সশস্ত্র সেন্ট্রিরা কয়েক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করলো। ভিতরে ডিউটিরত সেন্ট্রিরা যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছে। চারদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে গাছের ভাঙ্গা ডাল, ডাবের খোলা, মাটির কলসীর ভাঙ্গা টুকরো।

সাতনম্বর থেকে দুমদাম শব্দ শোনা যাচ্ছে। জেলর, সুপার সদলবলে সাত নম্বরে ঢুকেছেন। খানিকবাদে যেমন ওঁরা এসেছিলেন, ঠিক তেমনভাবে চলে গেলেন। ঝড় ধীরে ধীরে থেমে যায়।

সাতনম্বরের ওরা বি-ক্লাশ হয়ে গেছে। মহামতি লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী দিবসটিতে ওরা জেলের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না বাঁধালো।

শ্যামল জেলসুপারের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন জানালো ওদের দলকে বাইশে এপ্রিল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থাপিত মহান লেলিনের জন্ম দিবস পালন করার জন্য জীবন রতনহলটা ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ক।

সুপার বল্লেন—আপনারা জেলর বাবুর সঙ্গে দেখা করুন। শ্যামলরা জেলরের সঙ্গে দেখা করার পর অনুমতি মিললো। তবে যেখানটা তারা চেয়েছিল সেখানটা নয়। গেটের কাছে বড় নারকেল গাছ আর ছোট চাঁপাগাছটার মধ্যিখানের ফাঁকা জায়গাটা ব্যবহার করতে পারে।

দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটা হবে। সব ওয়ার্ডেরই দরজা তখনও বাইরে থেকে তালাবন্ধ। বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কোন গাছেরই পাতা নড়ছে না। সবকিছু নিথর, নিস্পন্দ। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির ঝাপটা একনম্বরে

তুলকালাম বাঁধিয়ে দিয়েছে। সবাই কম্বল, জামাকাপড় গোটাতে ব্যস্ত। এমন সময়ে কানে এলো শ্লোগানের আওয়াজ। সবাই সচকিত, উৎকণ্ঠিত। ঐ বৃষ্টির মধ্যেই সাতনম্বর থেকে একদল যুবক হাত তুলে শ্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে আসছে। ওদের ওয়ার্ড খোলা। ওরা এসে জমল সেই নারকেল আর চাঁপা গাছের মাঝখানে। সেখানে আর ঘন্টাখানেক বাদেই মার্কসবাদীদের লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী দিবস পালন করার কথা আছে।

ওদের প্রত্যেকে ওভারকোর্ট পেয়েছে। এগুলো তো জেল সেপাইদের গায়ে দেখা যায়। ওরা প্রত্যেকে উলঙ্গ। ওরা সবাই কখনো কখনো দুহাত শূন্যে তুলে নাচছে আর এক নম্বরের জানলার গায়ে তেড়ে তেড়ে আসছে। মুখে ওরা ঘনঘন আওয়াজ তুলছে 'জ্যোতিবসুর মাথার খুলি, পাইপ গানের একটি গুলি।' 'প্রমোদবাবুর মাথার খুলি, পাইপ গানের একটি গুলি।' 'কমরেড মাওসেতুঙ চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান, এশিয়ার মুক্তিসূর্য জিন্দাবাদ' আরও কত কী। বোঝা গেল ওরা কারা? মহান নেতা লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা আর শ্যামলদের আর হল না। ওদের ওয়ার্ডই খোলা হ'ল না। যেখানটায় ওরা সভার অনুষ্ঠান করবে স্থির করেছিল সেখানটাই তো প্রতিবিপ্লবী-দের দখলে চলে গেছে।

কিছুদিন থেকে সাত নম্বর ওয়ার্ডের মহান নেতা বিল্টুকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ খবর করে জানা গেল—একজন আই. বি. অফিসারের সঙ্গে জেল অফিসে ওর ইণ্টারভিউ হওয়ার পরদিন থেকেই আর তাকে জেলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জেলর বলেছেন—সে নাকি মুক্তি পেয়ে চলে গেছে।

এক নম্বর ওয়ার্ডের বন্দীদের নতুন কর্মসূচী স্থির হল 'মে দিবস' পালন করা হবে। এক নম্বরের চাতালেই মহান মে দিবসের সভা চলেছে। সভার মাঝখানে সংবাদ এলো এক নম্বরের সুভাষ আর কনভিক্ট জহর সাতনম্বরের দ্বারা ফের আক্রান্ত হয়েছে। সুভাষ ডান পা একটু টেনে চলে। ওকে হত্যাকরার উদ্দেশ্যে ছোরা মেরে রেল লাইনে ফেলে দিয়েছিল ওর এক কালের 'বন্ধুরা'ই। ও মরেনি, তবে মারা গেছে মনে করে 'বন্ধু'রা পালিয়ে গেছলো। একটা লোকাল ট্রেন ওকে ঐ অবস্থায় রেললাইনে পড়ে থাকতে দেখে সজোরে ব্রেক কষে থেমে গেছলো। গাড়ীর প্যাসেঞ্জাররাই ওকে সেদিন হাসপাতালে নিয়ে গেছলো। এ সেই সুভাষ। সুভাষ সাতনম্বরের আক্রমণ ঠেকিয়ে কোনরকমে একনম্বরে ঢুকে পড়েছে। ওর সঙ্গে কে ইণ্টারভিউ করতে এসেছিল। অপেক্ষা করে

করে সে হয়তো ফিরে গেল। গেটেই সুভাষকে বিল্টু আঘাত করেছিল মারবার উদ্দেশ্যে। জহর কনভিক্ট। তার রাজনীতি কখনই প্রকাশ হয়নি। কিন্তু সে সাতনম্বরে গেলেই যেন আক্রান্ত হয়। এদিনও হল।

ফের উত্তেজনা। ভাঙ্গা ইটের টুকরো। একটা ডাব ফেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। খানখান ইট খোলা জানলার ভিতর দিয়ে এক নম্বরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে। ছাদ ডিঙ্গিয়ে চাতালে ছড়িয়ে পড়ে। একনম্বর থেকেও ছুটে গেলো সাতনম্বরের দিকে অনুরূপ বস্তুগুলো। ডেপুটি জেলর প্রধান ফটকের ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরে ঢুকে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। হঠাৎ সাত নম্বরের দিক থেকে তাঁর সামনে একটা আস্ত মাটির কলসী পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ডেপুটিবাবু তাড়াতাড়ি আবার ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তখনও অবিরাম ভাঙ্গা টুকরোর বৃষ্টি চলেছে।

অবস্থা ধীরে ধীরে শান্ত হলে অফিসে ডাক পড়লো এক নম্বর ও সাতনম্বর থেকে একজন করে। জেলরবাবুর তলব। দেখা গেল সাত নম্বরের বিল্টু হন হন করে জেল গেটের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রধান ফটকের ফোকর দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। এক নম্বর রাজী হ'ল না তাদের কোন প্রতিনিধি পাঠাতে। পরিবর্তে তারা জমাদারের মাধ্যমে অফিসকে জানালো জেলরবাবু যেন একবার স্বচক্ষে সবকিছু দেখার জন্য এক নম্বরে আসেন, যাকে বলে ঘটনার সরেজমিন তদন্ত।

জেলরবাবু এলেন আধঘণ্টা বাদে। এক নম্বরের গেট পার হয়েই তিনি ইটের ভাঙ্গা টুকরোগুলো একজন সেপাইকে তুলে নিতে আদেশ করলেন। —এগুলো সব অফিসে নিয়ে জড়ো করুন। 'এক্সিহিবিট' করার জন্য লাগবে।

জেলরবাবু ক্রমে আরও এগিয়ে এলেন। চাতালে এসে যখন উপস্থিত হলেন তখন এক নম্বরের সকলে তাঁকে প্রায় ঘিরে ধরেছে। তাঁর প্রথম উক্তি— কি শ্যামলবাবু, আপনাকে আজকের ঘটনা বলার জন্য অফিসে ডেকে পাঠালাম। কিন্তু গেলেন না। কি ব্যাপার ?

—যাইনি। আমাদের সমবেত সিদ্ধান্তের জন্য। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না।

—আপনারা জেলের আইন ভেঙ্গেছেন, মারামারি করেছেন, যথেচ্ছভাবে ইট পাটকেল ছুঁড়েছেন।

—"মোটেই না। আমরাই তো আক্রান্ত। আচমকা ওরা সুভাষকে মেরে বসলো। আপনি দয়া করে একবার ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকুন। দেখুন, কি ঘটনা।

ভেতরটা দেখলেই প্রকৃত ঘটনা অনুমান করতে পারবেন।" জেলরবাবু ঢুকলেন এক নম্বরে। ঘরের চারিধারে ইটের টুকরো, জানলার রডে আঘাত খাওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে ছোঁড়া হয়েছে। সবকিছু প্রত্যক্ষ করে জেলরবাবু সদলবলে আবার ফিরে গেলেন। সঙ্গে গেলো একগাদা ইটের টুকরো।

পরদিন সুপারের চেম্বারে এক নম্বর থেকে কয়েকজন উপস্থিত হয়ে গতকালের ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার ও তদন্তের দাবী জানাল। ওরা আরও বলল—আপনার অধীনস্থ কর্মচারী ওয়ার্ডারদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই নিজেদের ওভারকোট খুলে দিয়েছিল। তা নাহলে ওরা ওসব পায় কি করে? সিপাইদের সামনে জেলরবাবুর অফিস ঘরের খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ওরা শ্লোগান দেয়—পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কাড, সেই অস্ত্রে লড়াই কর। এসব শ্লোগান ওরা দেয় কোন্ সাহসে? এত সাহস পাচ্ছে নিশ্চয়ই কারুর মদতে। সবশুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটা তদন্তের আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—আপনারা ধৈর্য ধরুন, আপনারা তো অনেক দায়িত্বশীল দলের কর্মী। কথাবার্তা সেরে ওরা সব চলে গেল।

জেলরবাবুকে দেখা গেল সেলের সামনে এক নকশালপন্থী নেতার সামনে দাঁড়িয়ে। নেতা খুব জোর দিয়ে কথা বলছে আর জেলরবাবু তা ধীরস্থিরভাবে মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছেন। জেলরবাবু ওর হাত থেকে একটা লম্বা কাগজ নিলেন। তারপর অফিসে ফিরে গেলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে আবার নতুন ধরনের সংঘর্ষ শুরু হল। সাতনম্বর থেকে থান থান ইট সেলের দিকে পড়ছে। মুহুর্মুহু ইটের ভাঙ্গা টুকরোগুলো সেল থেকে সাতনম্বরে আবার সাতনম্বর থেকে সেলে ছোঁড়াছুঁড়ি চলতে থাকে। ভাঙ্গা ইটের টুকরোর সাঁই সাঁই আওয়াজ শুনে এক নম্বরের বাসিন্দারা হতচকিত ঘটনার স্রোত যেভাবে বইছিল তা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছু একটা হয়েছে এটা অনুমান করা কঠিন নয়। তবে সাতনম্বর আর সেলের বাসিন্দারা কেউ এবার শ্লোগান দেয়নি।

পাগলা ঘন্টি বাজতে পারে এই আশঙ্কায় ওয়ার্ডের বাইরে যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা ছেড়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। ওয়ার্ডের বড় বড় দরজাগুলো বন্ধ হতে থাকলো, পাহারারা সব তালা মেরে অন্যত্র সরে পড়লো। সিপাইগুলোর টিকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। নিশ্চয়ই কোথাও সরে পড়েনি বা আশ্রয় নেয়নি। ডিউটি দিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা মিনিট কুড়ি চলারপর ইট ছোঁড়াছুঁড়ি থামল বলে মনে হল।

কিন্তু এতো সত্ত্বেও পাগলাঘণ্টি বাজলো না। অন্যদিন এর থেকেও অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ঘণ্টি বেজেছে। একজন কয়েদী বিকালের খাবার নিতে গিয়ে পোড়ারুটী নিয়ে মেটের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। সেই ঝগড়া শেষপর্যন্ত হাতাহাতিতে পর্যবসিত হয়। 'খানা'র সঙ্গে সঙ্গে আগত সিপাই তার হাতের লাঠির দুচার ঘা কয়েদীর ঘাড়ে বসিয়ে দিলে চারদিকে বন্দীদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। এমন সময় জেলের ফটকের মাথা থেকে পাগলা ঘণ্টি বেজেছিল।

সাতনম্বরের বিন্টুর চীৎকার ভেসে আসছিল। বিন্টু চীৎকার করে যাচ্ছে শালা, পল্টুর নিশ্চয়ই একাজ। নাহলে কারা মহাননেতা কাকার দলের লোক তার তালিকা জেলরের হাতে ঘোরে কি করে? ওকে একদিন সাবাড় করবো। বিশ্বাসঘাতক ট্রেটরকে আগে নিকেশ করা দরকার।

ঠিক এই সময়েই পল্টু চীৎকার করছে সেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একাজ পল্টুদের দলের কাজ। ওঃ, পল্টুটাকে, বাইরে যাই, তারপর খুন করবো। শালা নেতাগিরি ফলাচ্ছে। শালা, জেলরকে আমাদের দলের লোকদের নামগুলো ওই নিশ্চয়ই দিয়ে দিয়েছে।

এতকালের মধ্যে জেলরবাবু অন্যান্যবারের মতো এবার জানলা দিয়ে মুখ বার করে প্রহরারত সেপাইকে ডাকেননি। বড জমাদারের ডাক পড়েনি। অথচ সবাই অফিসে যে যার কাজ করে চলেছেন।

অনেকদিন পর সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাত করতে জেল গেটে কেউ এসেছে। সাতনম্বরের পাহারা সুভাষকে ডেকে নিয়ে গেল। সুভাষ ভাবতেও পারেনি তার সঙ্গে জেল গেটে কেউ দেখা করতে আসতে পারে।

জেলগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সুভাষের মা। সুভাষকে আসতে দেখে চুপচাপ ধীরভাবে ইণ্টারভিউর জানলার কাছে সরে গেলেন। সুভাষ তার মার মুখোমুখি হল। মা ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কেমন্ আছিস। সুভাষ উত্তর দেয়—ভালোই আছি। তা তুমি এখানে কেন? পাশে চোখ পডতেই সুভাষ লক্ষ্য করে—ডেপুটি জেলর তার ঠিক ডান পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। সুভাষের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ডেপুটি বলে—তাড়াতাড়ি নাও। সময় মাত্র তিন মিনিট। —কিন্তু আপনি এতো কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উনি তো আমার মা, দলের কেউ নন। ডেপুটি একথায় সরে গিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে লক্ষ্য রাখতে লাগল।

—মা, দেরী করো না, জেল গেটের অবস্থা ভালো নয়। বিন্টুদের দলের

বাইরে যারা আছে তারা এখানে পুলিশের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে।

মায়ের সঙ্গে কথাবলার মাঝে জেল ফটকেব সামনে এসে দাঁড়াল বিন্টু। লোহার ফটকের রডগুলো দু'হাতে ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক সুবেশা লাবণ্যময়ী অষ্টাদশী। বিন্টুকে দেখে খুশীতে ভরে উঠল। বিন্টু কিছু ফিসফিস করে গেটের সেন্ট্রিকে বলতে আর হাতে কিছু গুঁজে দিতে সেন্ট্রি গেটটা সামান্য ফাঁক করে দিল। মেয়েটি একটা বড রেশন ব্যাগ ভর্তি কিছু বিন্টুর হাতে তুলে দিয়ে আবার সরে গেল। সরে যাবার সময় দু'জনেই একবার দু'হাত এক হাত কবে মোচড দিয়ে নিল।

ডেপুটিবাবু অফিস থেকে একবার বেরিয়ে গেটের দিকে গেছলেন। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে সুভাষকে বললেন—কি সুভাষ আর নয়। সুভাষ জানলা থেকে সরে এসে বলে—ডেপুটিবাবু, মা একটা ফাউন্টেন পেন উপহার দিচ্ছেন। আজ ‍ামার জন্মদিন। ‍িতে পাববো কি?

—কৈ, পেনটা দেখি। বলে সুভাষের মায়ের দিকে তাকালেন।

সুভাষেব মা বাইরে থেকেই পেনটা দেখালেন। ডেপুটিবাবু ভিতর থেকেই একবাব পেনটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সম্মতি দিয়ে বল্লেন—"গেট দিয়ে নয়, অসুবিধে আছে। আপনি এই তাবজালের ফাঁক দিযে পেনটা গলিয়ে দিন।" সুভাষের মা তাই করলেন। ডেপুটিবাবু পেনটা নিয়ে একবার দেখে নিলেন। বল্লেন—বাঃ ভালো পেন। জেলখানায় এর থেকে আব বেশীদামের পেন কেউ রাখে না। চোর ছ্যাঁচোড়ের জাযগা। তাহলে আপনি এখন যেতে পারেন। সুভাষ পেন নিয়ে ভিতরে চলে যাও। তোমার সময় পেরিয়ে গেছে। সুভাষেব মা চলে গেলেন। সুভাষও ফটকের ফোকরের কাছে চলে এল। তখনও কিন্তু বিন্টু সমানে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে চলেছে। পেন হাতে করে সুভাষ সোজা ওয়ার্ডে চলে আসে। খুব পছন্দ পেনটা, সত্যি সে ভুলেই গেছলো যে আজ তার জন্মদিন। বাড়ীতে থাকলে তো কখনও জন্মদিন পালন করেনি। মনে থাকবে কি করে? হঠাৎ মা জেলগেটে এসেই মনে করিয়ে দিলেন যে, আজ তার জন্মদিন।

পেনটা শ্যামলের হাতে দিয়ে সুভাষ অনুরোধ করলো—শ্যামলদা, একটু কালি জোগাড করে দিতে হবে যে। আমাকে তো কালি দেয়নি মা, শ্যামল একজনের কাছ হতে চেয়ে আনলো তার দোয়াত। পেনের মুখটা খুলে মধ্যে কালি ঢালতে গিয়ে লক্ষ্য পডল ভিতরে যেন সাদা কাগজ গোঁজা রয়েছে। সেকি

নতুন পেন! কাগজ গোঁজা। শ্যামল সুভাষের উদ্দেশ্যে বলে—দ্যাখো। সুভাষ, তোমার মাকে নিশ্চয়ই দোকানদার ঠকিয়ে দিয়েছে। ভিতরে ঐ দ্যাখো, সাদা কাগজ গোঁজা। 'তাই নাকি' বলে সুভাষ পেনটা শ্যামলের হাত থেকে নিয়ে মুখ উল্টিয়ে কাগজটা বার করার উদ্দেশ্যে ঠক ঠক করে ঠুকতে লাগল। কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর কাগজটাকে টেনে বার করা সম্ভব হল। খুলে ফেলল কাগজটা। আরে, এতো একটা চিঠি। ছোট্ট চিঠি। শ্যামলের হাতে চিঠিটা দেয় তুলে। চিঠিতে লেখা ছিল—তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি গতকাল সদরে কমিশনার ভবন থেকে ধরা পড়েছেন। তাঁরা এখন পুলিশ হাজতে। আজ কালের মধ্যে আপনাদের ওখানে পৌছাবেন। একসঙ্গেই থাকবেন। বিস্তারিত পরিচয় তাঁদের যেন কেউ জানতে না চায় দেখবেন। ঐ তিনজনে পৃথক একটা কমিউন বানিয়ে থাকবেন।

সূর্যকরোজ্বল বিকাল। এক নম্বর থেকে সকলে বেরিয়ে এসে চাঁপাগাছের তলায় বসেছে। উগ্রপন্থীদের হামলা হতে পারে জেনেও বসেছে। সবাই একমত হয়েই ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে। সাহস না করলে জেলের মধ্যে হামলা ঠেকানো যাবে না। পুলিশভ্যানে একসঙ্গে জেল থেকে কোর্ট যাবার পথে ভ্যানের মধ্যে হামলা চালাচ্ছে। সবারই কেমন যেন একটা ক্ষোভ, কেন প্রতিরোধ করা হচ্ছে না। আবার এ উত্তরও এসেছে এটা যে জেলখানা। এখানে কি বাইরের মত কাজ করা চলে?

চাঁপাগাছটার নিচে একটা দৈনিক সংবাদপত্রের ওপর দু'জনে চোখ বোলাচ্ছিল। সুভাষ একটা খবর পড়ে লাফিয়ে উঠে বলে—শ্যামলদা, দেখেছেন এই খবরটা 'মিশা'র ১৭ (ক) ধারা সুপ্রীমকোর্ট বাতিল করে দিয়েছেন।

—তাই নাকি, কৈ দেখি। বলে কাগজটা টেনে নিল শ্যামল।

সাতনম্বরের দিক থেকে একটা মিশকালো রঙের লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে চাঁপাগাছটার কাছে ততক্ষণে চলে এসেছে। কাছে এসেই তার গম্ভীর আওয়াজ শুনেই সুভাষ সভয়ে পিছিয়ে যায়। লোকটি নামকরা ওয়াগন ব্রেকার। পা টেনে টেনে চলে। ওয়াগন ভাঙ্গতে গিয়ে পুলিশের লাঠির ঘায়ের চিহ্ন। শেওড়াফুলিতে চারুবাবুর পার্টি করে। নাম বীরেন দত্ত। সুভাষের সঙ্গে খুব ভালোই পরিচয়। অর্ধমৃত অবস্থায় সুভাষকে ওই-ই রেল লাইনে ফেলে দিয়ে গেছলো। মনে করছিল সুভাষকে নিকেশ করে দিয়েছে। লোকটি আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলে—এই সুভাষ শোন্।

সুভাষ ততক্ষণে এক নম্বরের সীমানায়। শ্যামল বীরেন দত্তের দিকে মুখ ঘুরিয়ে

বলল—স্থভাষকে আপনার কি দরকার ?

—যাই দরকার থাক না কেন ? বলেই সজোরে শ্যামলের পিঠে একটা আঘাত করে।

ঘুরে দাঁড়ায় শ্যামল। তেজী মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে—আপনি জেলের মধ্যে মারামারি করতে চান।

একনম্বরে প্রবল উত্তেজনা। সাতনম্বরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার উপক্রম। মিনিটের মধ্যে একনম্বর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। সবারই মুখে এক কথা। আজ ওদের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। জেলের মধ্যেও ওরা শাসকশ্রেণীর দালালের কাজ করে চলেছে। প্রতিরোধ না করলে বুঝি এ জিনিস থামবে না।

শান্ত হতে হলো সকলকে। এই সামান্য ঘটনায় জেলখানার মধ্যে কোনো সংঘর্ষের সৃষ্টি করা ঠিক নয় এই চিন্তাই তাদেরকে শান্ত করলো।

কয়েদী স্থলেমান পাঁচ বছর জেল খাটছে। ও ছাড়া পেতে মাস-দুই বাকী। গুণ্ডা, ডাকাত নয় সে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বাড়ীর সীমানা নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি আর তাই থেকে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। রাগের মাথায় প্রতিবেশীর রক্ত ঝরিয়েছিল। মারা যায়নি। রক্ত ঝরানোর শাস্তি সে ভোগ করছে এখানে।

স্থলেমানের বয়স চল্লিশের সামান্য দু'একবছর বেশী হবে হয়তো। বিরাট দশাসই চেহারা। ওর একশ সাতচল্লিশ গ্রাম চালে আদৌ পেট ভরে না। ইদানীং পরিমাণে তাও কম হচ্ছে। প্রতিদিন দুপুরবেলায় সাড়ে তিনশ থেকে চারশ গ্রাম ভাত দেবার কথা। শোনাযাচ্ছে তিনশর বেশী কোনোদিনই থাকছে না। স্থলেমানও কিছুদিন আগে পর্যন্ত আগুনের ওখানে বসতো। ছুটি কাছাকাছি এসে গেছে বলে আর মেয়াদ খাটতে হয় না। এখন মেটের ডিউটি।

একদিন দুপুরে স্থলেমান ডাব্বুর মাপ দেখে প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে। স্থলেমান রাগতস্বরে বলে—অ্যাই, ডাবু ভর্তি করো।

ওয়ার্ডার খিস্তি করে বলে ওঠে—উঃ, লাটের পো, যা পাচ্ছিস্ খা।

—অ্যাই, খবরদার তুই তোকারি করলে রক্ষে রাখবো না। বলে স্থলেমান সিপাইয়ের দিকে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে গেল। তারপর চেঁচিয়ে বলে—উঃ, উনি কম দেবেন, আর আমি বলবো না। আমি মাপবো কত ভাত দেওয়া হচ্ছে। সিপাইও বেশ উত্তেজিত। সেও গলা চড়িয়ে বলে—শালা, ফের কথা তো এই দেখছিস্ ? বলে হাতের ডাণ্ডাটা উঁচিয়ে তোলে।

খুন চেপে গেছলো স্থলেমানের মাথায়। কিন্তু সে যে পোড়খাওয়া লোক।

কে মনে করে থালা হাতে করে সোজা জেলরের অফিসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

জেলরবাবু কি লিখছিলেন। কলম গুটিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—স্থলেমান, কি খবর? হঠাৎ থালা হাতে?

—হুজুর, সেপাই আমাকে ভাত কম দিচ্ছে। আমি মাপতে চাই।

—ভাত কম হয়েছে? কি করে বুঝলে?

—হ্যাঁ হুজুর। পাঁচবছর এই জেলে কেটে গেল। আগুনে তো কতদিন কাটিয়েচি, হুজুর, এক বেলা ভাত দেওয়া হয়। তাও আবার হাত ধরে মুঠো তিনেক।

বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন জেলরবাবু—গ্যাখো, আমি এখন অফিসের কাজে ব্যস্ত। তুমি বরং বড় জমাদারের কাছে যাও।

—কিন্তু হুজুর, বড জমাদার কি আপনার ওপরে? তাঁকে তো বহুবার বলেছি। কিন্তু কিছু হয়নি। আর বোধহয় হবেও না।

চটে উঠলেন জেলরবাবু। মুখ চোখ ভারী করে বল্লেন—এভাবে তুমি এসেছো কেন? তোমার সঙ্গে 'মেট' 'পাহারা' কৈ? কে তোমাকে আসতে দিয়েছে। কাকে জিজ্ঞেস করে এসেছো আমার কাছে। বলেই হাঁক পাড়লেন—সেণ্ট্রি, গেটের সেণ্ট্রি এসে সেলাম ঠুকতেই বল্লেন—বড় জমাদারকে বোলাও। বড জমাদার এসে সেলাম ঠুকতেই জেলরবাবু ধমক দিয়ে বল্লেন—স্থলেমান সোজা আমার কাছে এলো কি করে। ওকে আর ছ'নম্বরের সেপাই এই দুজনকে কাল কেশ টেবিলে হাজির করাবেন। আর স্থলেমানকে আজকের মতো সেলে ঢুকিয়ে দিন। ওখানেই ওর ভাত পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিন নম্বর সেলে দেবেন। ওখানে জীবন আছে। একটা রাত। দুজন রাখতে পারেন। যান্।

এক রাতেই স্থলেমানের সঙ্গে জীবনের স্বভাব বন্ধুত্ব হয়ে গেল, জীবনেরও পাঁচ বছরের কয়েদ। দু'বছর পার করে দিয়েছে। স্থলেমানকে জীবন বলেছিল তার জীবনের সব কথা। বাড়ী ওর মলয়পুর। খুব দুর্দান্ত মনে করে জেলরের আদেশে প্রথম একবছর ওকে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে রাখা হয়। এখন ও সেলে থাকে। কেবল ডাণ্ডাবেড়ী পা থেকে নেমেছে।

পাড়ার এক সুদখোর মহাজনের কাছে ওর ভিটেটুকু বন্ধকী ছিল। ঐ ভিটে টুকুই কেবল ওর সম্বল। বাবা মারা যাওয়ার সময় ওর বয়স এতো কম ছিল যে,

মাঠের কাজেরও বয়স তখন ওর হয়নি। খুবই তখন নাবালক। বাবা মারা গেছেন বহুদিন আগে। মৃত্যুর আগে দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে জমি-জিরেত থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত ভিটেটুকুও বাঁধা পড়ে। বন্ধকী নিয়েছিল গাঁয়ের সেরা সুদের কারবারী। প্রচুর জমির মালিক শ্রীমন্ত চাটুজ্জে। শ্রীমন্ত চাটুজ্জের কাছে ঋণী হওয়া বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

জীবনের বিধবা মা পরের বাড়ী মুড়ি ভাজতো। ঘন ঘন অসুখের জন্য শেষ পর্যন্ত সে কাজও বন্ধ হয়ে যায়। কোনোদিন খেয়ে কোনোদিন বা না খেয়েই বিধবা মাকে নিয়ে জীবনের দিন যায়। এদিকে সুদেব টাকার জন্য শ্রীমন্ত চাটুজ্জের তাগাদার আর শেষ নেই। ঘন ঘন তাগাদার ঠেলায় মাতা পুত্রের বহু রাত অনিদ্রায় কাটে। টাকা আদায়ের জন্য শ্রীমন্ত জীবন আর তার মায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা জুড়েদিল।

জীবনের মা চাটুজ্জেমশাইয়ের বাড়ীতে ভিক্ষুকীনীর মতো উপস্থিত হয়ে জোড় হস্তে কাতর প্রার্থনা জানায়—বাবু, ধার আপনার কাছে যা করেছি তা ঠিক সব শোধ দেবো। জীবন এখন আমার বড় হয়েছে। কাজকম্ম নিশ্চয়ই পাবে এখনই কিছু কিছু মিলছে। এমনিতেই আমাদের সংসার চলে না বাবু। তবু প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কাছে ধারি আমি থাকবো না। পাই পয়সা মিটিয়ে দেবো। গত দু-তিন মাস জীবন আমার মাঠে কোন কাজ পায়নি। এতো খরা। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে। তোমার ধার ঠিক শোধ করে দেবো বাবু। তুমি কোর্টে যেও না।

—'এ জন্মে তোর সাধ্যি হবে না সে আমার জানা আছে'—শ্রীমন্ত বিধবা মহিলাকে উপেক্ষা করে চলে যায়। যাবার সময় বলে যায় হাকিমের আদেশ হয়ে গেছে। শুধু সে আদেশ জারী করতে বাকী। ধার করার সময় মনে ছিল না হতভাগী মাগী। যাও বেরিয়ে যাও বলছি আমার বাড়ীর উঠোন থেকে। এ বাড়ীর ছায়া মাড়াবে না। এখন থেকে যা হবে কোর্ট কাছারী দিয়েই হবে। তোদের দল আছে। আমাদের কোর্ট আছে। দেখা যাক্, কাদের কত মুরোদ।

সত্যই একদিন কোর্ট থেকে পেয়াদা এল ডিক্রীজারীর আদেশ নিয়ে। জীবনদের ভিটের দখল শ্রীমন্ত চাটুজ্জেদের হাতে কোর্টে তুলে দিয়েছে, এখন সেই আদেশ জারী হবে। জীবন বাড়ী নেই। বিধবা মা একা। দাঁড়াবে কোথায় এখন! কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমন্ত চাটুজ্জেও হাজির হলো একটা তালা নিয়ে, ওটা সে জীবনদের ঘরের দরজায় ঝোলাবে। শেষবারের মতো হাতজোড় করে জীবনের মা, কাতর প্রার্থনা করে আমায় দুটো দিন সময় দিন বাবু, জীবন কাজের সন্ধানে ভিন্

ায়ে গেছে। সে অন্ততঃ ফিরে আসুক। সে না এলে আমি কার সঙ্গে পথে বেরোবো।

গর্জে উঠল শ্রীমন্ত। চোখ মুখ পাকিয়ে চীৎকার করে বলে—না, না ওসব আর হু হবে না। শীগগীর ঘর থেকে যা আছে নিয়ে না বের হয়ে এলে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বের করে আনবো।

—বাবু, কথা দিচ্ছি, জীবন এলেই বেরিয়ে যাবো। যা করার তাকে বুঝিয়ে বলবো। অস্থির হয়ে ওঠে শ্রীমন্ত। ক্ষিপ্ত-প্রায় অবস্থায় মহিলার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে থেকে বার করে আনে। ঘাড়ে প্রবল এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলা দিতেই বৃদ্ধা হুমড়ী খেয়ে আছড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঘরের মধ্যে পোড়া মাটির হাঁড়ি, কলসী, থালা, কাঁথা যা ছিল সব টেনে হিঁচড়ে বার করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল। পেয়াদা কোর্টের ডিক্রী দরজায় সেঁটে দিল। শ্রীমন্ত লাগালো তার ওপর এক বিরাট তালা। অজ্ঞান অবস্থায় জীবনের মা মাটিতে পড়ে রইলো।

ঘরের চতুর্দিকে পড়েছিল মাটির কলসী, তোবড়ানো থালা, বাটী, ভাঙ্গা আয়না, ময়লা ভর্তি ছোট চিরুণী, ছেঁড়া কাঁথা, বালিশ, একটা মশারী, কিছু আউস চাল। একটা কুকুর কাঁথা-বালিশগুলো নিয়ে টানাটানি করছে। ছেঁড়া বস্তার ওপর একটা বিড়াল চুপ করে বসে আছে। জীবনের মায়ের জ্ঞান ফিরে এলে ঘাড়টা সামান্য তুলে দু-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি দেখল। আবার মাথাটা মাটিতে পড়ে গেল। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রইলো।

জীবন বাড়ী ফেরার পথে দূর থেকেই ঘরের জানলা বন্ধ দেখে কোনো কিছুর আশঙ্কা করে 'মা' 'মা' 'মাগো' বলে চীৎকার করতে করতে ঢুকেই এই ভয়াবহ মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে পাগল হয়ে ওঠে। মায়ের মুখে চোখে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে।

—মা, মা, মাগো বলো কে এমন দশা করলো তোমার? বলে জোরে জোরে মায়ের দেহটা ধরে নাড়তে থাকে।

ভিজে চোখে অবসন্ন দেহে মা তার উত্তর দেয়—শ্রীমন্ত চাটুজ্জে এসেছিল, কোর্টের লোক নিয়ে। ঘর, ভিটে সব এখন থেকে নাকি চাটুজ্জেদের। ঐ ত্থাখ— বলে আঙ্গুল তুলে ঘরের দরজায় লাগানো নতুন তালাটা দেখায়।

—ক্রোক!

—হ্যাঁ, তোর বাবার ঋণের দায়।

—তুমি কিছু বলোনি।

—বল্লাম, শুনলে তো নাইই, বরং এই দশা করলো।

—কিন্তু আমরা এখন দাঁড়াবো কোথায়?

—গাছতলায়।

—বাপের ভিটে ছেড়ে শেষ পর্যন্ত গাছতলায়! হায় ভগবান!

জীবন চেয়ে চেয়ে দেখছে ঘরের দরজার শেকলে আর তালাটা কেমন জোড় বেঁধেছে। ঐ সেকল না ভাঙ্গলে তো সে তার মাকে নিয়ে ঐ ঘরে ঢুকতে পারবে না। সারারাত মাতা-পুত্র একভাবে 'সম্পত্তি' আগলে পড়ে রইলো। রাত্রে জীবন মাকে বলল—মাগো, ত্রিবেণীর কাছে কেশোরাম রেয়ন বলে একটা কারখানা আছে। আমি সেখানকার ইউনিয়নকে ধরে একটা পিয়নের কাজ জুটিয়েছি। তোমাকে নিয়ে যাবো মা। একসঙ্গে থাকবো। একটা বড়সড় গোছের মাটির ঘর দেখেছি। ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে। ঘরের মালিক আমায় দশ টাকায় ভাড়া দেবে বলেছে।

পরদিন ভোর না হতেই পৌটলা গুছিয়ে নিয়ে জীবন তার বিধবা মাকে নিয়ে ত্রিবেণীর দিকে রওনা দিল। মাঝে মাঝে মমতাভরা চোখে সাতপুরুষের ভিটেটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

গ্রামটা পেরোতেই পথিমধ্যে দেখা হল শ্রীমন্ত চাটুজ্জের সঙ্গে। মাঠ ঘাট দেখে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে আল থেকে রাস্তায় উঠছিল। মুখোমুখি সাক্ষাৎ শ্রীমন্তকে দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল জীবনের। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন—কেন আমাদের ভিটে ছাড়া করলে? বল, কেন আমাদের ভিটে ছাড়া করা হল?

শ্রীমন্ত কিছুটা থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বলে—হাকিমের আদেশ, পথ ছাড় জীবন।

—আগে বল কোর্টে গেলে কেন?

এবার চীৎকার করে ওঠে শ্রীমন্ত—আমার খুশী।

—তোমার খুশী? টাকা শোধ দেবো না বলেছি যে কোর্টে গেলে?

—হ্যাঁ আমার ইচ্ছা, তাই গেছি। তোর বাপ কত টাকা ধার নিয়েছিল জানিস্?

—রোজগার যা করেছে সবতো মাগীর পিছনেই ঢেলেছে। আমার টাকা সুদে আসলে যা হয়েছে তার শোধ চাই। তারপর ঘর পাবে। তবে অঙ্কটা এদ্দিনে বেড়ে বেড়ে যা দাঁড়িয়েছে তা শোধ দেবার মুরোদ তোমার জন্মে আর হচ্ছে না।

কথাগুলো জীবনের পক্ষে কান করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। মা-বাবাকে

জড়িয়ে গালিগালাজ !

—দেখুন, চাটুজ্জেমশাই, আমার বাবা-মাকে জড়িয়ে যদি কোন গালাগাল দেবেন তো জীব টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

গলা ফাটানো স্বরে শ্রীমন্ত লাল চোখে বলে—কি এতবড়ো কথা।

বাপটা যেমন গুণ্ডা ছিল। ছেলেও তেমন। গুণ্ডামী ডাকাতি করা তো তোদের পেশা। একটা দলও তো আছে সঙ্গে !

মাথা গরম হয়ে গেল জীবনের। খুন চেপেছিল। হাতের কাছে একটা মোটা লাঠি পড়েছিল। সেটা কুড়িয়ে সোপাট মেরে বসল শ্রীমন্ত চাটুজ্জের মাথায়। বাবা বলে রক্তাপ্লুত মাথাটা দুহাতে ধরে শ্রীমন্ত মাটিতে পড়ে গেল। জীবনের মা জড়িয়ে ধরেছিল জীবনকে দুহাতে। নিষেধ করেছিল—জীবন, খুনোখুনি করিস্ না বাবা। যা হবার তা হয়েছে, ভাগ্যে আমাদের যা আছে হবে। জীবন চীৎকার করে উঠেছিল—ভাগ্যটাগ্য মানি না, শালা বাবা-মাকে গালাগাল দিচ্ছ, মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে না। আবার দলকে গুণ্ডা ডাকাতদের দল বলা, শালা, তোকে মেরেই শেষ করবো। বলেই এক ঘা। শ্রীমন্ত ঐভাবেই গোটা একটা বেলা রাস্তায় পড়েছিল।

হাসপাতালে শ্রীমন্তর দেওয়া বিবৃতি ধরে পুলিশ রেয়ন কারখানা গেট থেকে জীবনকে গ্রেপ্তার করে। মামলা চলাকালীন শ্রীমন্ত প্রায় রোজদিনই কোর্টে পড়ে থাকতো। সাক্ষীও ভাল জুটিয়েছিল। সেকশান ৩৪২ মতে হাকিমের কাছে জীবন বলে—শ্রীমন্ত চাটুজ্জেই অপরাধী। সে নয়। রায় বেরুলো। সেকশানের হাকিম জীবনকে পাঁচবছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন।

সুলেমানের চোখেও জল। জীবনের জীবনকাহিনী শেষ হলে সুলেমান তার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে—তোমার মায়ের কোন খবর ?

মায়ের কথা শুনে জীবনের দুঃখের ভাবখানাই পাল্টে গেল।

—মায়ের কোন খবর আমাকে কেউ দেয়নি। জানি না বেঁচে আছে কিনা। একনম্বর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ দুজনে নীরব। কে যেন গাইছে—

"আমারা এই বিশ্বের বুকে গড়বো রঙমহল।
সৃষ্টির নবমন্ত্রে আমরা করবো দিনবদল।"

পরেরদিন সুলেমান আবার নিজের ওয়ার্ডে ফিরে গেল। সুপার আর জেলরের আদেশ হয়েছে সুলেমান তাঁর ওয়ার্ডে ফিরে যাবে। কিন্তু জীবনের

পায়ে আবার ডাণ্ডাবেড়ী পরাতে হবে। খাবার সময় খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ল স্থলেমান। জীবনের পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরানোর আদেশের কারণ কী তাকে জানাতেই হবে। শ্যামলদের বলে দেখবে যদি কোন প্রতিকার করা যায়।

ডেপুটি জেলরের কোয়ার্টারে একজোড়া জার্সি দুধেলা বড় গাভী আছে। গাভীজোড়া কিন্তু জেলের সম্পত্তি! ওদের দুধ জেল হাসপাতালে পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট আছে। জেল হাসপাতালে যারা অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয় তাদের দুধ সরবরাহ করার জন্য এ এক সরকারী ব্যবস্থাপনা। কিচেন থেকে প্রত্যহ প্রচুর ফ্যান আর ভাত যায় গোখাদ্যের জন্য ডেপুটি জেলরের বাড়ীতে। বহুদিন থেকেই ঘটনাটা সকলে লক্ষ্য করছে। কিন্তু কেউ মুখ দিয়ে কিছু প্রকাশ করার সাহস করছে না।

একদিন জীবন তার এক বন্ধুকে বলেছিল—ডিপ্‌টির বাড়ীতে গাইগরুর জন্য রোজই রাশিরাশি ভাত যায়। আসামীর সংখ্যার হিসেবে কারচুপি করে রোজই গুদামীবাবু একাজ করেন। এদিকে আমরা ভাত একটু কম হয়েছে বল্লেই আর রক্ষে থাকে না। একশ বিয়াল্লিশ গ্রাম চাল নাকি একজন আসামীর জন্য বরাদ্দ। দেখা গেছে ঐ পরিমাণ চালে সাড়ে তিনশ' থেকে চারশ' গ্রাম ভাত হওয়ার কথা। কোনদিনই তিনশ' গ্রামের বেশী ভাত দেয় না। হপ্তায় দুদিন প্রত্যেকদিন সাতাশী গ্রাম চিঁড়ে, দেওয়ার কথা। চিঁড়েও ষাট পঁয়ষট্টি গ্রামের বেশী হয় না। কথাগুলো যেভাবেই হ'ক দেওয়ালেরও কানে গেছলো। পাঁচ কান হয়ে সে কথার ঢেউ গিয়ে আছাড় খেয়েছে ডেপুটি জেলরের কানে, তারপর যথারীতি জেলরবাবু, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

স্থপার জীবনকে ডেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই সেল আর ডাণ্ডাবেড়ীর শাস্তি দিলেন। কর্তাদের কানে গেছে জীবন নাকি নিয়মিত একনম্বরে যাতায়াত করে থাকে। ওখানেই আলোচনা হয় সরকারী বিধিমতে বন্দীরা স্থযোগ পাচ্ছে না। মাপে সব কম দেওয়া হয়। ডেপুটির কোয়ার্টারে জেল হাসপাতালের দুটো গাইগরু রয়েছে। তার দুধ ডেপুটি, জেলর আর স্থপারই খান। বড় জমাদার হেডক্লার্ক মাঝে মাঝে আঁটি কুড়িয়ে খান।

জীবন জেলরের কাছে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে। কিন্তু দেশের সর্বত্র যেখানে কাজীর বিচার চলছে—"হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।" সেখানে এই একটা ডিস্ট্রিক্ট জেলের স্থপার তার আদেশ পাল্টাতে সাহস করে কোন সাহসে?

সকাল আটটা। প্রভাতী সংবাদপত্রের ওপর সকলেই হুমড়ী খেয়ে পড়েছে তার ওপর। খবর এই জেলের পোড়া রুটি বিধানসভার স্পীকারের টেবিলে জমা পড়েছে হৈ-চৈ গোটা জেলখানা জুড়ে। শোনা যায় সবকিছুর আগাপাস্তলা তদন্ত হবে। জেল কতৃপক্ষ চটে লাল। তদন্তে প্রমাণিত হল রুটির মধ্যে গমের পাত্তা নেই, পঁচানব্বুই ভাগই জোয়ার আর বজরা। ডেপুটি জেলর বল্লেন—এ একনম্বরের কাজ।

সকাল নটার সময় সাহেব-সুবোরা আসেন কেশ টেবিলে, শুরু হল এক-নম্বরের হাওদাখানা থেকে দলবদ্ধ শ্লোগান দেওয়া।

—'কাচ্চা রোটী নেই চলেগা, আচ্ছা রোটী দেনা পড়েগা।'

—গমের রুটি দিতে হবে, জোয়ার বজরা রুটি দেওয়া বন্ধ কর।

—রাজনৈতিক কর্মীদের রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।

—বিনাবিচারে আটক রাখা চলবে না। আধাফ্যাসাবাদী সন্ত্রাস রুখতে হবে।

—প্রত্যেক বন্দীকে থালা, বাটি, কম্বল দিতে হবে।

—জেলকোডের পরিবর্তন চাই।

—সমস্ত অসুস্থ বন্দীদের যথাযথ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

কেশ টেবিলের দিকে মুখ করে উত্থিত মুষ্টি বদ্ধ হাতে বন্দীদের দাবী সজোরে ঘোষণা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিশাল উঁচু প্রাকারের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। বাতাসে উঠলো কম্পন। বন্দীদের হৃদয় আবেগে, উচ্ছ্বাসে, অনাগত ভবিষ্যতের আশঙ্কায়, প্রতিরোধের প্রাকার সৃষ্টির বাসনায় ভরপুর হয়ে উঠে। কনভিক্টরা আসান্বিত হয়। এবার তাহলে একটা পরিবর্তন হয়তো হবে বা। ক্ষুব্ধ ওয়ার্ডাররাও চঞ্চল হয়ে উঠে। ওদেরও বাইরে বুঝি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। জেল অফিসের কর্মচারীরাও বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে শ্লোগান দেওয়ার দৃশ্য দেখে হাতের কাজ করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে বা বসে থাকে নিস্তব্ধ বৃক্ষরাজিও বুঝি কান খাড়া করে দাবীগুলো হজম করছে। ঝড় উঠলে তাদের ডালপালাই তো আগে ভাঙ্গবে।

রোজই একই ঘটনার পুনরাভিনয়। কর্তৃপক্ষ বলছে তারা নাকি অসহায়। উপায়ান্তর না দেখেই কেশ টেবিল করাই বন্ধ করার হুকুম হলো। নকশালপন্থীরা জেলকর্তৃপক্ষের সহায়তায় এগিয়ে এল। জেলকর্তৃপক্ষ জেলবন্দীদের মধ্যে বিভেদ নীতি প্রয়োগের এ উত্তম সুযোগ আর হাত ছাড়া না করতে দেরী করলো না।

রাতে একনম্বর ওয়ার্ড থেকে ধ্বনি উঠলো—"মানুষের মতো থাকার দাবীতে

জেলখানার সমস্ত বন্দী ভাই এক হও।”

—বিভেদ নয়, ঐক্য চাই। এলো রুটি বয়কটের আহ্বান, দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠলো। হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। আকাশে উড়োজাহাজের শব্দ শুনলে বন্দীরা ভাবে জেলের মধ্যে হয়তো বা বোমা পড়বে। ষ্টেশনে ট্রেনের ঘরঘর শব্দে নদীর ব্রীজ কাঁপে, জেলখানা কাঁপে।

একটানা আন্দোলন করেও যখন পোড়া রুটি সাদা হলো না, জোয়ার বজরার জায়গায় গম এলো না, তখন ডাক এলো 'রুটি বয়কট' আন্দোলনের। বড় আমগাছটার তলায় সমস্ত ওয়ার্ডের বন্দীদের সমাবেশ ডাকা হলো। আহ্বায়ক হলো একনম্বর ওয়ার্ড। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকেই সমবেত হয়েছে। কেবল 'কাকাবাবু' আর 'চারুবাবুর' দলের লোকেরা এ ডাকে সাড়া না দিয়ে চোখ খোলা রেখে কর্তাদের খুশী করার ফন্দী আঁটতে থাকলো। ওরা বললো—যারা নির্বাচন বয়কট করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে এসেছে তারা মিছামিছি কেন 'রুটির বয়কট' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গোস্পদে ডুববে? ওরা সমাবেশের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সভার দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। মণি সেনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হলো। ঘোষণা হলো শ্যামল বসু আর মণি সেন এই দুজনায় কেবল বক্তব্য রাখবে। মণি সেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা। তাঁর জ্বালা ধরানো ভাষণ বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের ঢেউ এনে দিল। জেলর কাছে দূরে একটা ফাঁকা ঘাস বিছানো জায়গায় বসে চারুবাবুর মন্ত্র-শিষ্য নিশীথকে একটা কাগজে কি যেন টুকে যেতে দেখা গেল।

মণি সেন ঝাড়া আধঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বল্লেন—বন্ধুগণ, আমরা জেলখানায় স্বেচ্ছায় আসিনি। একথা ঠিক পিকনিক করতে আসিনি। আমরা গ্রামে গঞ্জে ঘুরেঘুরে ঘুমন্ত মানুষদের ডেকে ডেকে তুলেছিলাম। এই একমাত্র অপরাধে আমাদের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। এখন এত মানুষকে জেলবন্দী করা হয়েছে যে, থাকবার খাবার শোবার জায়গা নেই। বহু দিন হয়ে গেল আপনাদের অনেকে চারদেওয়ালের মধ্যে আটক আছেন। এখন যা অবস্থা তাতে প্রতিকার পাবার পথ অবলুপ্ত করা হচ্ছে। মানুষের যেমন ধৈর্য আছে, তেমনি ধৈর্যের বাঁধও আছে, সীমাও আছে। চারদেওয়ালের মধ্যে যে-ভাবে আন্দোলন করা যায় সেইভাবে আন্দোলন করতে হবে। বাইরে যেভাবে আন্দোলন চলে জেলের অভ্যন্তরে একই কায়দা চলে না। এখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুটি যাতে পোড়া রুটি না হয়, যাতে জোয়ার বজরার পরিবর্তে গমের

রুটি হয় সেই দাবীতে আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জনাচ্ছি আপনারা আজ এই মুহূর্তে রাত্রে খাবার জন্য যে ডালা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যাচ্ছে তা বয়কট করুন। আশাকরি আপনারা আমার এই প্রস্তাবে সায়দেবেন। যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে তারাই কেবল হাত তুলুন।

ত্রিশ সেকেণ্ড মতো দেখে যখন কেউ হাত তুলল না, তখন মণি সেন আবার ঘোষণার সুরে বল্লেন—যেহেতু কেউ আমার প্রস্তাবের বিপক্ষে নেই, তখন প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল। ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল করতালি। শতকণ্ঠে আওয়াজ উঠলো—"পোড়া রুটি চলবে না, চলবে না, চলবে না। চারদেওয়ালের মধ্যে আন্দোলন চলছে চলবে।"

যারা অর্থাৎ যে সমস্ত কয়েদী আসামী ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রুটির ডালা, ডালের বালতি নিয়ে গেছলো তারা ওয়ার্ডে ফিরে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দেড়হাজার বন্দী ঐ দিনের বিকালের রুটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। ছয় থেকে সাতহাজার তৈরি করা রুটি জেলের বাইরে কবর দিতে হল। এদিন আবার ছিল 'হাড়কুচোর দিন' প্রায় মাংসহীন হাড়ের কুচো রান্না। তার জন্যও কবর খোঁড়া হল। একনম্বরে চারদিন পর দৈনিক 'গণশক্তি' একখানা একজন পাহারা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। হাতে নিতে দেখা গেল কাগজটার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কাঁচি দিয়ে বহু জায়গা কাটা-ছেঁড়া করা হয়েছে। খবরের মাথামুণ্ডু কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু বাকী দিনের কাগজগুলো কোথায় গেল। জেলরের কাছে ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে, প্রতিকারের দাবী নিয়ে।

অফিস জানলার ওপার থেকে জেলরবাবুর গলা শোনা গেল—সেন্সর করে দেওয়া হবে। এখন যান, ওয়ার্ডে চলে যান। বিকালে পাবেন।

—কিন্তু একটা কাগজ সেন্সর করতে কতদিন কতক্ষণ লাগে বলুন। আমরা পরপর পত্রিকা পাচ্ছি না।

—এখন যান, আমার অনেক কাজ। এই সেণ্ট্রি, ওকে এখান থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাও। বলেই জানলা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

একনম্বর ওয়ার্ডে বিষয়টি নিয়ে জেল কমিটির সভা ডাকা হল। সভায় মণি সেন বল্লেন—জেলরবাবুর ধারণা বন্দীদের সুযোগ-সুবিধার যেটুকু অস্তিত্ব আছে তা কেড়ে নিলে হয়তো বা আমরা পিছিয়ে যাবো। জেলের মধ্যে আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়বে।

শ্যামল যোগ করে—প্রচণ্ড শীতের রাতে বন্দীরা যখন উধম হয়ে মেঝেতে পড়ে

থাকে তখন তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে শুনলে কি মনে হয় বলুন তো!

পরেশ মন্তব্য করে—আমরা রাজনৈতিক কর্মী তারাই যখন মেঝেতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে—

—আমরা সবরকম কষ্ট সহ্য করতে রাজী আছি। কিন্তু রাজনীতিবিষয়ক কাগজপত্র পড়ার অধিকার ছাড়তে পারি না। বাতাসে ফ্যাসীবাদের গন্ধ। জানলার ধারে বসে থাকা শিশিরের কাছে একজন মেট এসে একটা বড় ঠোঙা দিয়ে গেল। শিশিরের কোন বন্ধু পাঠিয়েছে এই উপহার। মেট শিশিরের কানে চুপিসারে বলে গেল সেন্ট্রি সুবোধবাবু মহানাদে গেছলেন বাড়ীর কোন কাজে। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় শিশিরের প্রিয়তম বন্ধু সুনীলের। সুনীল একসময় এই জেলেই এক নম্বর ওয়ার্ডে থেকে গেছে। সুনীলের অনুরোধ সুবোধবাবু রেখেছে। নিজের জিনিসপত্রের মধ্যে ঐ বড় ঠোঙাটাও এনেছে।

জেলকমিটির সভা তখনও চলছিল। বিভিন্ন থানার কমিউনগুলোর আভ্যন্তরীণ সমস্যা, কোন মামলার কেমন তদ্বির হচ্ছে। কারকার দীর্ঘদিন বাড়ী থেকে কেউ আসেনি, কে জেলের মধ্যে বসেই পড়াশুনা করতে চায়, এসব নিয়ে একটার পর একটা সূচী ধবে ধরে আলোচনা চলছিল। মতামত দেবার সময় মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য, উত্তেজনা, হাসির ফোয়ারা, কথাকাটাকাটি সব মিলিয়ে সভাটা বেশ জমে ওঠে।

জমাটি সভার মাঝে শিশির তিনখানা 'গণশক্তি' পাঠিয়ে দিল। সেই বড় ঠোঙার ভিতরে ঐ কাগজ তিনখানা ছিল। তার ওপরে ছিল অন্ততঃ দশবারো বাণ্ডিল বিড়ি। বিড়ির ঠোঙা বলে না বোঝার কোন কারণ ছিল না। কারণ লেবেল-এর ছাপ ঠোঙাতে ছিল।

ঐ কাগজ তিনখানার একখানা ওয়ার্ডে আগে অফিস চ্যানেল দিয়ে সেন্সরের কাঁচির কাটাকুটি হয়ে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এসেছিল। বাকী দুখানা আসেনি। ঐ দুটির একটিতে রয়েছে ফ্যাসীবাদী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান। দীর্ঘ ইশতেহার।

ঠিক হলো জেলকমিটির পক্ষ থেকে আজকের রাতের হাউসে ঐ ইশতেহার যত্ন করে পাঠ করে শোনানো হবে।

জেল কমিটির সভায় সংবাদ এসে পৌছালো। কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন এক নম্বরের বন্দীরা যদি তাদের জেলের মধ্যে সভা করা, পোষ্টার দেওয়া, স্লোগান দেওয়া

বন্ধ না করে তবে তাদের সকলেরই ইণ্টারভিউ বন্ধ করে দেওয়া হবে। আজ সকালে অফিসে এসেই স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলর আর ডেপুটির মধ্যে এক সভা বসে স্থপারের চেম্বারে। একনম্বর নিয়ে আরো আলোচনা হয়েছে। তবে সবকিছু জানা যায়নি। ঐ সময় স্থপাবের ঘরে বড জমাদার পর্যন্ত ঢুকতে পায়নি। প্রায় একঘণ্টা আলোচনা চলেছিল।

জেলকমিটির সভায় প্রসঙ্গটি আলোচনা হলো। মণি সেন প্রস্তাব করলেন—লক্‌আপ রিফিউজ করা হক।

সকলে একবাক্যে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কবে থেকে করা হবে প্রশ্ন উঠলে জবাব এলো আজ রাত্রেই করা হক। ইণ্টারভিউ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করা। দুপুর গড়িয়ে বিকাল এলো। ওয়ার্ডের দরজা, গেট খুলে গেছে। বন্দীদের কেউ আমতলায় কেউ কেউ বা চাঁপাতলায় এদিক-সেদিকে বসে আছে। কখন ইণ্টারভিউ আসবে এই আশায়। কতরকম ইণ্টারভিউ। প্রিয়জনের কাছ হতে সুসংবাদ থেকে নানাপ্রকার দুঃসংবাদ। কেউ বন্দী হওয়ার সময় বাড়ীতে গর্ভবতী স্ত্রীকে রাত্রের বিছানায় ফেলে এসেছিল। সে শুনছে তার হয়তো পুত্র বা কন্যা প্রসব হয়েছে। কেউ জানছে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সহকর্মীকে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের মধ্যে ধারালো দা'য়ের ঘাযে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। তাকে বাঁচাতে সাহস কবে কেউ এগিয়ে আসেনি। সবাই কিন্তু ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছে। কারুর নামে ইণ্টারভিউর জন্য ডাকা হলে প্রথমে সে আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুক্ত মানুষের সাক্ষাত পাওয়া, সে তো দারুণ শিহরণের ব্যাপার।

মেট আর পাহারাদের আজ কিন্তু তেমন দেখা গেল না। খবব দিয়ে গেল একনম্বরে বন্দীদের সঙ্গে আজ থেকে সাক্ষাত নিষিদ্ধ হয়েছে বলে জেল গেটে বিজ্ঞপ্তি লটকে দেওয়া হয়েছে। ঐ বিজ্ঞপ্তির পরে কিছু চেঁচামেচি গেটে হলেও শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সকলে ফিরে গেছে। তবে আজকে এরই মধ্যে দু-তিন হাত হয়ে গেট দিয়েই একটা ছাপানো ইশতেহারের বাণ্ডিল এসে একনম্বরে আছাড খেয়ে পডল। সি. পি. আই. (এম.)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটি প্রচারিত 'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক ইশতেহার। ওটা নিয়েই খানিক কাডাকাডির মধ্যে বিলি হয়ে গেল সকলের মধ্যে।

সন্ধ্যা হতেই একনম্বর ওয়ার্ডের সকলে চাতালে চলে এল। জমাদার, সেপাই, মেট, পাহারা সকলেই ঘুরে গেছে। জমাদার বার দুয়েক তারপরও

এসেছিল। সে অনুরোধ করে আপনারা ভেতরে যান দয়া করে। আমাদের চাকরী নিয়ে ঐ শালারা টানাটানি করবে। আপনাদের তো কিছু বলবে না। জানে আপনারা জেল পালানোর লোক নন। কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময়ে স্লিপ এলো সুপারের ঘরে এক নম্বর থেকে দুজন প্রতিনিধি যাবেন দাবী নিয়ে আলোচনার জন্য। সবাইয়ের খানিক স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে মণি সেন ও শ্যামল বসু ঢুকলো জেল অফিসে আলোচনার জন্য। ওদেরকে সঙ্গে এনেছে বড জমাদার। জেলর, সুপার-এর সামনের চেয়ারে বসে ওরা দুজনে বক্তব্য রাখার পূর্বে প্রশ্ন করে আলোচনা কতক্ষণ হবে? উত্তর—যতক্ষণ চলবে।

আলোচনা ক্রমে পরিণত হলো তর্ক যুদ্ধে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার মুখে জেলর বলে বসলেন—আপনাদের যখন গভর্ণমেণ্ট ছিলো তখনই বা কি পেরেছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত মণি সেনের জবাব—আমাদের সময়ে আমরা আর কিছু পেরে না থাকি কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত আর অবাধ্য অফিসারকে শায়েস্তা করেছিলাম।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা গেল ভেঙ্গে। জেলর ক্রুদ্ধ হয়ে সুপারকে বলে বেরিয়ে চলে গেলেন।

বিশে মস্তান জেল হাসপাতালে থাকে অসুখ সারানোর জন্য নয়, কারণ তার শরীরে অসুখের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। আরাম করে থাকা আর ভালো ভালো ডায়েট পাবার জন্যই তার জেল হাসপাতালের একটা বেড দখল করে থাকা। তার বেডের তলায় যেমন খালি বোতল দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি দেখতে পাওয়া যায় 'থ্রী এক্স রাম' আরও কত কী বিদেশী মদভর্তি বোতল। জেলের ডাক্তারবাবুই তো ওকে পুষে রেখেছেন। ডাক্তারবাবু রোজ দুবেলা ওর বেডে কিছুক্ষণ বসে আড্ডা মেরে যান, হাসি ঠাট্টা মসকরা করতে করতে বটতলার ভাষাও ব্যবহার করা হয়। সুপার-জেলরের চোখ পড়লে তাঁরা ওদের দুজনকে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যান।

বিশে যখন বাইরে ছিল তখন ওর দাপট দেখে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও নাকি ভয় পেতেন। তিনিই সুপারিশ করেছিলেন 'মিশা'য় ওকে আটক করার জন্য। রাইটার্স বিল্ডিংসের মেন গেটের পুলিশরা ওর পরিচয়পত্র কখনও দেখতো না। স্থানীয় থানার দারোগারা পর্যন্ত বিশে উপস্থিত হলে চেয়ার এগিয়ে দেন। শুধু স্যালুটটা করতো না। স্যারও কেউ কেউ বলতো। বিশের নাকি এম. এল. এ. হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাকে টিকিট না দিয়ে দলের পক্ষ থেকে বাজারে ওর তীব্র এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে টিকিট দেওয়া হয়।

বিশে একসময় পড়ে থাকত লরীড্রাইভারদের রাতের আস্তানায় গ্যারেজে। একদিন ওরসঙ্গে ড্রাইভার ক্লিনারদের ছুরী মারামারি হয়ে যায়। আর একদিন গ্যারেজের মধ্যে একটা বাইশ তেইশ বছরের বেশ্যাকে নিয়ে জোর মারামারি করে। ওদের মধ্যে মারামারি দেখে এক ফাঁকে মেয়েটি পলায়ন করে।

বিশে মস্তানকে হাজীপুরের সবাই চেনে। তবে ওর বাড়ী প্রথম থেকেই হাজিপুর নয়। ওর জন্ম হয়েছিল বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে। হাজীপুরে এসেছে বছর দশেক হবে। তখন ওর বয়স বছর কুড়ি। এখনকার ত্রিশ বছরের বিশে মস্তানকে দেখলে পাড়ার শিশুরা আতঙ্কে কাঁপে। নানা লোমহর্ষক কাহিনী প্রচারের জন্যও বোধহয় বিশে কিম্বদন্তীর পুরুষ হয়ে যেতে পারে। কোন শিশু সহজে খেতে বা দুধ খেতে না চাইলে, ঘুমাবার সময় না ঘুমাতে চাইলে মায়েরা শিশুর গায়ে কোমল হাতে এক চড কষিয়ে ভয় দেখায়—বিশে হাজীপুরে রয়েছে। ডাকলেই এসে যাবে। খবরদার দেরী করো না।

দুচারটে নরহত্যা বিশের দ্বারা যে হয়নি, তা মোটেই মিথ্যা নয়। ওর যখন আরও সুদিন ছিল তখন গাছে বেঁধে পাড়ার মধ্যে দুচারটে যুবককে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তার কথা লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে।

বিশে একজন নামকরা ব্যাঙ্ক ডাকাত। ডাকাতি আছে এমন চিত্র সম্বলিত সিনেমার বই এসেছে শুনলে বিশে মস্তান সেটা দেখতে সব কিছু কাজ ফেলে ছুটতো। ডাকাতি ওর পেশা বোধহয় আজও।

বিশে কিছু একটা দামী জিনিসের 'স্মাগলিং' ব্যবসায়ের সঙ্গেও বোধহয় যুক্ত। কারণ এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য খোদ দিল্লী থেকে একদল ঝানু গোয়েন্দা একবার হাজীপুরে এসেছিল। এ হেন বিশেকে ভয় পায় না এমন 'কার ঘাড়ে' মাথা আছে।

মণি সেন এই কারাগারে আসার যথেষ্ট আগে থেকেই জেলখানা নানাপ্রকার ঘটনা ঢেউয়ের মত আছড়ে পডতে থাকে। হাসপাতালের কারবার জেলে অখাদ্য বিতরণ—এসব নিয়ে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। হাসপাতালে লাইন থেকে এক বৃদ্ধ আসামী ক্ষীণকণ্ঠে বার্ধক্যজনিত ম্রিয়মাণ গলায় বলে—ডাক্তারবাবু, আমরা যে সকাল আটটা থেকে লাইন দিয়েছি।

পাশ থেকে একজন আচমকা মন্তব্য ছোঁড়ে—দাঁড়াও, আগে যাদের গায়ে

শক্তি আছে তাদের পূজো করা আগে শেষ হোক।

—আমরা রোগী হয়েও হাসপাতালে সীট পাই না। আর—

—আর ঐ ছাখো, নিশীথও দেখছি বেড়ে রয়েছে। আঙ্গুল দিয়ে বক্তা সঙ্গীকে দেখায়। নিশীথ নামে একজন নামকরা অতিবিপ্লবী। ধনীগৃহের সন্তান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পড়াশুনা করেছে, কিন্তু দেশের শোষকশ্রেণীর প্রকৃত শত্রুদের খতম করার অভিযানে নামে। যে কোন কারণেই হ'ক তাকে জেলখানায় রেখে দিয়েছে। ফিসফিস করে প্রথম বৃদ্ধ বলে—আরে ওদের যতগুলো গোষ্ঠী আছে তাদের কেউই ওকে বিশ্বাস করে না, তাইতো হাসপাতালে এসে স্থান নিয়েছে।

—নিয়েছে না দেওয়া হয়েছে?

—হতেও পারে, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।

একটা বৃদ্ধ হাসপাতালের বারান্দায় ঠায় অনেকক্ষণ বসেছিল। রোগে ভুগে কঙ্কালসার চেহারা। পা দুটো ছড়িয়ে বসে বসে গা থেকে কি খুঁটে খুঁটে ফেলছে। চুলগুলোয় বহুকাল তেল না পড়ায় জট পাকিয়ে গেছে। ঐ বৃদ্ধের দিকে আঙ্গুল তুলে বন্দী একনম্বরের এক যুবক তার সঙ্গের সহবন্দীকে বলে—ঐ দিকে তাকাও, ঐ যে বুড়ো লোকটা বারান্দায় পা গুটিয়ে বসে আছে, এ লোকটাকেতো দেখছি আমি এসে পর্যন্ত হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে রয়েছে। শুনি ও নাকি এমনি কতকাল যে হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে আছে তার কোন সময়ের হিসেব নেই।

বন্ধু দুজনে নিজেদের লাইনের জায়গা দেখার ব্যবস্থা করে এসে ঐ বৃদ্ধের কাছে চলে আসে একজন তার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনি কতকাল এই জেলে আছেন?

উত্তর এল—তিন বছর হবে।

দ্বিতীয় জন বলে—আপনি তো সাজা পাননি?

—আজ্ঞে, না।

—জামীন হয়নি? কি কেশ আপনার?

নিশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ উত্তর দেয়—হুঁ, জামীন কে নেবে বলুন বাবু, আমার টাকা নেই। তাই জামীন নেবারও কেউ নেই। উকিল চাই, চাই মুহুরী, আর জামীনদার।

—কি কেশ?

—সন্দেহ, চুরি করেছি। তাই চোর সন্দেহে আজ থেকে তিনবছর আগে ধরে এনেছে।

—বাড়ীতে আপনার কেউ নেই ?

—নেই মানে, সব আছে। বউ আর এক ছেলে আছে ?

—তারা কেউ জেলগেটে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে না ?

—ছেলের বয়স যখন ছিল চার বছর তখন আমি জেলে আসি। বউ আমাকে ভীষণ ভালবাসতো। আমার মনে হচ্ছে, সে আর নেই। থাকলে নিশ্চয়ই একবার দেখা করে যেতো।

—কেন, আপনার বউ নেই বলছেন কেন ? মহামারী তো হয়নি। এমনি অসুখ করেছিল কি ?

—না, বাবু অসুখের ব্যাপার নয়। বড়লোকের বাড়ীর ছেলেদের ভোগের স্পৃহার কথা ভাবি।

—আপনার বাড়ী কোথায় ?

—আপনারা যাকে পশ্চিম বলেন, আমার সেই দেশে বাড়ী।

—কিন্তু সেই জেলাতেও তো জেল আছে। তা এই জেলায় জেলে কেন ঢোকালো ?

—আমি ঠিক কারণ এখনই বলতে পারবো না। তবে আপনাদের বাড়ী যেখানে সেই থানায় বীরপুর বলে কোন গাঁ আছে কী ?

—হ্যাঁ তাতো আছে ? ঐ গাঁয়ে তো শ্যামল বসুর বাড়ী। পাশ থেকে একজন বললো।

—ঐ গাঁয়ে বছর তিনেক আগে গোঁসাই বাড়ীর মেয়ের বিয়ের দুদিন পরে ঐ বাড়ীতে কিছু বাসনপত্র চুরি যায়। সেই চুরির কেশে আমায় ধরেছে।

—সেকি ! বীরপুর আপনার গাঁ নয়, থানা নয়, এমন কি জেলাও তো নয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

—তিনবছর হয়ে গেল। একটা সাধারণ চুরির মামলা। শুনেছি রায় বের হতে নাকি দেরী হবে না। দেখুন না, আমাকে পুলিশ থেকে অনবরত চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমি হাকিমের কাছে দোষ স্বীকার করি। কিন্তু আমি যখন জানি যে আমি চুরি করিনি কোনদিনই ঐ গেরামে যায়নি, তখন কেন মিথ্যা কবুল করবো।

—আসলে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পুলিশ ৩৭৯ ধারায় এনেছে তা প্রমাণ করতে সাক্ষী পাচ্ছে না, তাই বোধহয় চাপ সৃষ্টি করছে। তার দোষ স্বীকার যদি করতেনই তো প্রথমে করলেই ভালো হত। এসব কেশে কতদিন

আর সাজা। বড়জোর কয়েকমাস।

পাশ থেকে একজন মন্তব্য করলো—কয়েকমাস সাজা হতো? সে জায়গায় শুধু বিচারাধীন বন্দী হিসেবেই তিনবছর এই একটা জেলে ডাব্বু গুনে যাচ্ছে। আইনের কি বিচিত্র ব্যবস্থা।

—হ্যাঁ আইনব্যবস্থা আমাদের দেশে এমনই যে রুই-কাতলা গলে যাচ্ছে। অথচ সামান্য সন্দেহ চুরি কেশে বছরের পর বছর হাজত বাস করছে।

—এর পরিবর্তন করা যায় না?

—পরিবর্তন! হুঁ, ছাই হবে। তার আগে গরীবদের প্রতি দরদী একটা সরকার হওয়া চাই।

—সেকি আর পশ্চিমবাংলায় কোন দিন হবে? সংসদী গণতন্ত্র আবার কি চালু হবে?

আমি কি তার উত্তর দেবো? আর কথা নয়, ওষুধ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে—বলেই যুবকটি আবার তাড়াতাড়ি ওষুধ নেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে দেখাদেখি বাকীরাও দৌড়ে লাইনে যে যার পূর্ব স্থানে দাড়িয়ে গেল।

যারা মাঠে-ময়দানে চাষী মজুরের জন্য গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, মিছিল করে, সভা-সমাবেশ বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় জেলের মধ্যে তারা চুপ করে বসে থাকতে পাবে না। এটা অভ্যাসের ফল। জেল কমিটির কনভেনর মণি সেনের পক্ষেও তাই কখনও চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হয়নি। জেল কমিটির সভায় সেদিন সংস্কৃতি বিষয়ে আরও কি কি কর্মসূচী নেওয়া যায় তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়ে মণি সেন বল্লেন—আপনারা কেউ নাটক লিখতে পারেন?

—নাটক কি বিষয়ে লিখবে?

শ্যামল বলে—বেশ, বিষয়বস্তু হ'ক গ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। জোতদার থাকবে তার শোষণ, অত্যাচার থাকবে, মজুর থাকবে, চাষী থাকবে আর তাদের শোষণ আর অত্যাচারেরে বিরুদ্ধে নানা ধরনের লড়াই থাকবে। পুলিশ থাকবে এবং স্বভাব অনুসারে সে যাবে জমিদারের পক্ষে।

মণি সেন বল্লেন—তারপর।

—তারপর, জমিদার পাবে ভাড়াটে একদল লেঠেলকে, চাষীর পক্ষে গ্রামের মধ্যবিত্ত প্রথমে দুভাগ হয়ে থাকবে। একভাগ জমিদারের দিকে, আর একভাগ চাষীর দিকে। দারোগার নির্দেশে পুলিশদল টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাবে, শেলগুলো চাষীদের দিকে পড়বে। পুলিশদল প্রচণ্ড দাপাদাপি করে গাঁ পাড়া মাতিয়ে

তুলবে। ঘন ঘন বুটের আওয়াজ শোনা যাবে রাতের গভীরে মজুর পাড়ার গলির মধ্যে। মজুরদের পাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য আসবে ইস্কুলে এক মাস্টারমশাই আর তিনচারজন মজুরকে। গ্রেপ্তার করার সময় প্রবল প্রতিরোধ হবে, সংঘর্ষ হবে, ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে মজুররা ওদের মাস্টারমশাইকে আর অনান্য নেতাদের। মোটামুটি এই ধরনের একটা প্লট।

মণি সেন প্রস্তাব সমর্থন করে বল্লেন—বেশ, এই প্লটটা আপনারা আজ রাতের হাউসের পর মঞ্চস্থ করুন। কে কি পার্ট করবেন, কথাই বা কি হবে সব স্থির করার দায়িত্ব শংকরবাবু নিন। শংকরবাবু আপত্তি জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করলেন—শ্যামলবাবু যদি আর একটা বা দুটো প্লট শোনাতে পারেন, ভালো হয়, আমরা বেছে নিতে পারি যেটা সহজ হবে। অভিনেতা পাওয়া যাবে, কাস্টিং করা যাবে।

শংকরবাবুর অনুরোধে শ্যামল সভার সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করে বলে—ঠিক আছে, আর একটা বলা যাক। এক উগ্রপন্থী গ্রামে দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকতো। তারকাছে বর্তমানে যা কিছু এস্টাব্লিশমেণ্টের নামে চলছে সব বোগাস। এস্টাব্লিশমেণ্টকে ধ্বংস করা তার জীবনের ব্রত। যুবক চাকরীর জন্য বহুদিন কারখানা আর বিভিন্ন অফিস গেটে ঘুরে বেড়িয়েছে। সর্বত্রই শুধু একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখেছে যাতে লেখা থাকতো 'নো ভ্যাকান্সী চাকরী খালি নাই।' যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তার ধারণা হয়েছিল ঐ কারখানার ভিতরে যারা চাকুরী করে তারা আর এই গোটা কারখানাটাই তার শত্রু। এ-সবের জন্য সে চাকরী পাচ্ছে না। পাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ের জন্য বন্ধুবান্ধবরা প্রচুর মেহনত করছে। কিন্তু চাকরী না থাকায় তরুণীটি বন্ধুদের প্রস্তাবে রাজী হচ্ছে না।

সবাই এ প্লটটা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। একজন মন্তব্য করে উঠল—বাঃ, বেশ বেশ। আমাদের পাড়ার এক যুবকের জীবন কাহিনীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তারপর ?

—তারপর, যুবকটি বর্তমান রাষ্ট্র যন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বলল—পুরানো দিনের মণীষিদের বাণী মানা যায় না। ওসব বুলি, বাণী নয়। ঐ সব মণীষিদের মূর্তি যেখানেই দেখতে পাবো ভেঙ্গে চুরমার করবো। বিদ্যাসাগর, রামমোহন এরা সকলেই সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন। বর্ণপরিচয় পড়া তুলে দাও। মজুরদের বাবু বানাতে হবে। ওদের লড়তে হবে

বাবুদের বাবুয়ানির বিরুদ্ধে। বাবুতন্ত্রকে খতম করার সঙ্গে সঙ্গে বাবুদেরও খতম করবো তারপর ওদের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলোয় ওরা ঢুকবে। বাবু তখন হবে ওরা, শংকর হাঁ করে শুনছিল। সে মন্তব্য করে—মজুররা বাবু হবে?

—অন্ততঃ যুবকটি তাই ভাবে। শেষে সে ভাবল তার এই কাজের যারা বিরোধিতা এমন কি সমলোচনা করবে তারাও তার শত্রু। দরকার হলে তাদেরও খতম করা হবে। শাসকশ্রেণী তাকে বুঝল। উপযুক্ত সৈনিক। একে কাজে লাগাও। কথামতো সে বিদ্যাসাগর মশায়ের মূর্তির মাথার অংশ একদিন ভোররাতে ময়দানে গিয়ে কেটে নামিয়ে দিতে এলো। ব্যাপক প্রচারিত হলো সে কাহিনী, সংবাদপত্রগুলোও বেশ ছবি ছাপালো।

—পুলিশ কিছু করল না?

—পুলিশ কিছু করল না। তবে তাকে শাসক দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাব দেওয়া হয় তাকে থানায় দারোগার সামনে বসিয়ে রেখে। প্রচুর পুলিশ ছিল আর ছিল শাসকশ্রেণীর পক্ষে তাদের দলনেতা, এম. এল. এ. ইত্যাদি। যুবক অস্বীকার করলো। তখন তাকে আঙুল দিয়ে হাজতটা একবার দারোগাবাবু দেখিয়ে দিল। হাজতকে সে ভয় করলো না।

—তাহলে তাকে সেই দিনই হাজতে পুরে দিল?

—না, সেইদিন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে ছাড়া পেয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু যে পাড়ায় সে আত্মগোপন করেছিল সেই পাড়ার মানুষই তাকে ভয় পেতে লাগল। তারা ভাবল, এ আবার কোন্ আপদ এলো। কানা ঘুষো গিয়ে পুলিশের কানে উঠলো। গোপন আস্তানা থেকে পুলিশ যুবককে পাকড়াও করলো।

—ব্যস্, তারপর?

—তারপর কাকে পুলিশ ভ্যানে চালান দেওয়ার নাম করে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে ভ্যান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—সেকি?

—হ্যা, অবশ্য জ্যান্ত নয়, মরা। ভ্যানের ভিতরে তাকে গুলী করা হয়। পরদিন সংবাদপত্রে পুলিশের এস. পি. বিবৃত দেন উগ্রপন্থী যুবকটি পুলিশ ভ্যানের ভিতর তাদেরই রাইফেল কেড়ে নিয়ে লড়াই চালাতে চেষ্টা করেছিল।

ধ্বস্তাধ্বস্তির মুখে সে ভ্যান থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে এবং দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশদল তাকে পুনরায় পাকড়াও করার চেষ্টা করলে সে ঘনঘন পাথর ছুঁড়তে থাকে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলী চালাতে হয় আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। যুবক লাশ হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

—লাশটাকে তো তাদের নিয়ে যাবার কথা।

—না, লাশ তারা নিয়ে না গিয়ে যুবকের বিধবা মায়ের কাছে লাশ নিয়ে যাবার সংবাদ পাঠায়। একটা চিরকুট লিখে দেওয়া হয় এক আই. বি.-র হাতে বিধবা মায়ের অবস্থা তখন কেমন বুঝতেই পারছেন। পরেরদিন বিকালের ডাকে গাঁয়ের পিয়ন একটা সরকারী অফিসের ছাপমারা একটা খাম যাতে যুবকের নাম লেখাছিল। বাড়িতে ছুঁড়ে দিয়ে যায়। যুবকটির বোন খামটি খুলে দেখে বিদ্যুৎ-পর্ষদে তার দাদার এক সপ্তাহের মধ্যে চাকুরীতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ সম্বলিত বোর্ডের পক্ষে সই করা এক নিয়োগ পত্র।

সব শুনে মণি সেন বল্লেন—এ-কাহিনীটা যে ধরনের, প্রথমটার অন্য ধরনের কিন্তু দুটোরই বোঝার প্রয়োজন আছে। দুটো কাহিনী দুদিন হক। আপনারা কি বলেন ? সবাই সম্মতি প্রকাশ করায় এদিন সংস্কৃতি বিষয়ের ওপর আলোচনায় ছেদ পড়ে। মণি সেন বল্লেন—কামটির সভায় স্থির হক এক নম্বর ওয়ার্ডের বন্দীদের মানসিক অবস্থা কিসে আরও শক্ত, কঠিন করে তোলা যায়। প্রথমতঃ, নিয়মিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, গান-বাজনা। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক শিক্ষাক্লাশের ব্যবস্থা করা, তিন নম্বরে যে সমস্ত বন্দী নিরক্ষর তাদের সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করা। আপাততঃ এই তিনটি কাজ ধারাবাহিকভাবে চালাতে পারলে মনোবল বাড়বে।।

—নিরক্ষরতা মুক্ত করতে হলে শ্লেট, পেনসিল, বই দরকার।

—ঠিক আছে তার ব্যবস্থা হবে। বাইরে খবর পাঠাচ্ছি তারজন্য।

—রাজনৈতিক শিক্ষা কোন্ বিষয়ের ওপর হবে। কে কে নেবেন সেই ক্লাশ। কমিউন ভিত্তিতে নেবেন না একসঙ্গে নেবেন ?

—একটা রাজনৈতিক শিক্ষা সাবকমিটি গঠন করা হ'ক। তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে বলা হ'ক।

—কাকে কাকে নিয়ে সাবকমিটি হবে ? সব শুনে মণি সেন পাঁচজনের একটা তালিকা পেশ করে সাবকমিটি তাদের নিয়ে গঠন করতে বল্লেন—ওরাই একটা বৈঠকে বসে বিষয়সূচী স্থির করুন।

—কখন শুরু হবে এই ক্লাশ ?

—কেন? সকাল আটটা থেকে দশটা রোজ।

মণি সেন বল্লেন—এই হাউসটায় সারাদিনের কাজের একটা ছক থাকা দরকার। কি বলেন আপনারা?

—যেমন?

—যেমন ধরুন সকলকে সকাল ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং রাত দশটার থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে। ঘুম থেকে উঠে যে যার কম্বল গুটিয়ে ফেলবে, জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলবে। মুখহাত ধুয়ে পরিষ্কার হতে এক ঘণ্টা। তারপর চানা খাওয়া। আটটা থেকে দশটা রাজনৈতিক শিক্ষা ক্লাশ এইরকম ভাগ ভাগ করে সময়টা স্থির করা।

—কিন্তু নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইটা কখন চলবে? তারজন্য কোন্ সময়?

—খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সামান্য বিশ্রামের পর দুপুর থেকে ইণ্টারভিউর আগে পর্যন্ত।

—ওয়ার্ডে স্যানিটেশনের দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হ'ক। মেডিকেল ইনচার্জ একজনকে করা হ'ক। আর একজকে ওয়ার্ডে সর্বকিছু শৃঙ্খলা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং জেলকর্মিটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করার জন্য ডিসিপ্লিন ইনচার্জ-এর দায়িত্ব দেওয়া হ'ক।

কঠোর শৃঙ্খলাই হচ্ছে এক নম্বর ওয়ার্ডের প্রাণ। কোন কিছুতেই বিশৃঙ্খল একবার মাথা চাড়া যখনই দিয়েছে তখনই প্রবল সমস্যার তোড়ে মানুষ হাঁপিয়ে উঠে। অনেকের কাছেই 'শৃঙ্খলা' 'জেলের মধ্যে জেল' বলে প্রচার করে।

শ্যামল বলল—একনম্বর ওয়ার্ডের বন্দীদের যদিও রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা নেই, তবু জেল কর্তৃপক্ষ তো জানেন এরা রাজনৈতিক দলের কর্মী। রাজনীতি করার জন্যই এই শাস্তি। তাই নিয়মিত সপ্তাহে একদিন আচমকা সার্চ করার রেওয়াজটা আপাততঃ এই ওয়ার্ডে ঘটে না। সিপাইদেরও প্রচণ্ড সহানুভূতি। অনেকেরই অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও করতে পারে না। অন্য ওয়ার্ডে জমাদার বন্দীদের চীৎকার করে শাসাচ্ছে ক্রমাগত অশ্রাব্য খিস্তী করে যাচ্ছে, কিন্তু এই ওয়ার্ডে যখন ঢোকে তখন সে সকলকেই সমীহ করে চলে। লোকটা খারাপ কি ভালো তা বলছি না। কিন্তু ঘটনাগুলোর আমরা যেন গুরুত্ব দিই।

মণি সেন বল্লেন—নিশ্চয়ই, তবে আমরা অনেকেই তো মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এসেছি। আমাদের কাছে ডিসিপ্লিন অনেক সময়েই অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে। তা করলে কিন্তু দু-একজনের জন্য আমাদের এই একনম্বর ওয়ার্ডের

কলেরই দুর্ণাম হয়ে যাবে। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের যে মাঝে মাঝে সমীহ করে তার থেকেও বড় কথা সাধারণ বন্দীরা আমাদের কত ভালবাসে।

—কিন্তু সাত নম্বর?

মণি সেন উত্তর দিলেন—সাতনম্বরের কথা আলাদা। ওদের রাজনীতি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বন্দী বা বিপ্লবী কোন পর্যায়েই ওরা পড়ে না। কাজেই ওদের নিয়ে কোন আলোচনা আজকের সভায় না হওয়াই ভালো। একটা কথা বলি জেলখানাটাও রাজনৈতিক শিক্ষার একটা আখড়া। এখানটাই পরীক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখান থেকে বেরিয়ে যদি কেউ দলত্যাগ করে বা নিজের চিন্তা ও চেতনার মান জেলের মধ্যে থেকে বিশেষ করে একটা ওয়ার্ডের মধ্যে এতো সহকর্মীর সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে যদি উন্নতি না ঘটে তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক হলো না একথা জোর দিয়ে বলতেই হবে। লুম্পেন, দাগী আসামী, অতিবিপ্লবী প্রকৃতপক্ষে এদের অনেকেই জেলখানাতেই শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুনেছেন তো অনেক আগেই নিশীথ, অসিত জেলখানাতেই পুলিশের গোয়েন্দা অফিসারের কাছে উপস্থিত হয়ে শাসকদলের হয়ে কাজ করবে বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে গেছে।

রাত ন'টা। একনম্বর ওয়ার্ডের লৌহকপাট দুফাঁক হয়ে যেতে যেন কারা ঠেলে দিল এক বন্দীকে। বন্দীকে দেখলেই বোঝা যায় যেন অনেকদিন অভুক্ত ছিল। দেহের ওপরও অনেক অত্যাচার হয়েছে। তা সইতে হয়েছে।…ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকছে, সঙ্গে একটা কাপড়ের পুঁটলী। ঘরে বিদ্যুতের আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে মনে হল। চারপাশ থেকে অসংখ্য চক্ষু তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। বন্দীও থানিক থেমে থেমে চারদিক লক্ষ্য করছে, যেন কাকে সে খুঁজছে। শ্যামল আর শ্রীমন্ত ওকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারেনি। পরে বুঝলো এযে তেজপুরের ভাগচাষী সুরেশ। তার শরীর এমন পাল্টে গেছে যেন তাকে চেনাই যায় না।

সুরেশ আর তার পরিবারের স্থানীয় জমিদার-পরিবার সরকার বাড়ির বিরুদ্ধে ভাগচাষের অধিকার নিয়ে, ফসল কাটা, তোলা নিয়ে যে সংগ্রাম চলেছিল আর তাতে গোটা গ্রামের চাষী ভাগচাষী মজুররা যেভাবে কোমর বেঁধে সারারাত লড়েছিল তা অবিস্মরণীয়। সারারাত ধরে ভাগের ধান জমি থেকে কেটে এক গ্রাম থেকে পাশের গ্রামে ঘাড়ে মাথায় লাইন দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ একটা

—ক্যানেল ঐ দুই গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত হলেও কোন বাধা সেইদিন হয়নি। ঐ গ্রামে সরকার-মোল্লা এই দুই পরিবার গোটা গ্রাম জুড়ে বংশানুক্রমিক যে অত্যাচার করে সে তো জ্ঞান হয়ে সুরেশ সেইসব অত্যাচারের প্রত্যেকটি ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। সবচেয়ে বড় লড়াই সরকার-মোল্লাগোষ্ঠীর আদিবাসী পাড়া ফাঁকা করার অভিযানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী টানা লড়াই।

সুরেশের কম্বল, থালা কিছুই জোটেনি। পুঁটলীটা নামিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। শ্যামল ও শ্রীমন্ত আরও অনেকে তাকে ঘিরে ধরল। শ্রীমন্ত সবাইয়ের কাছে অনুরোধ করল—আপনারা একটু হাওয়া আসতে দিন। দয়া করে নিজের নিজের জায়গায় চলে যান। আগে ওর শুশ্রূষা হক,···একটু বিশ্রাম নিক। কাল সব শোনা যাবে।

অন্ধকার মাঝরাতে বাড়ি থেকে ঘুমন্ত সুরেশকে তুলেছিল গ্রামের আর. জি. পার্টির ছেলেরা। ওদের পিছনে ছিল পুলিশ। আর. জি. পার্টির লোকেরা আর পুলিশ দু-দলই তাকে তার বাড়িতেই প্রচণ্ড মারধোর করেছে। সেই রাত্রে তাকে থানা হাজতে পুরে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্নজল দেওয়া হয়নি। ভোর না হতেই জোতদার হারাণ মোল্লা থানায় এসে হাজির। বডবাবু তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—আসুন বসুন মোল্লাসাহেব, আপনার কথা মতো কাজ হয়েছে। তবে আর. জি. পার্টির ছেলেরা ছিল না বলে সুরেশকে ধরা সম্ভব হ'ল। গাঁয়ে মশাই একটা গর্ব করার মতো আর. জি. পার্টি হয়েছে। আমার পুলিশগুলো তো ভয়েই মরে। অবশ্য মেজবাবু খুব পাকা লোক। কাজ হাসিল করে চলে এসেছে। কি বল্লেন—এখন কি হবে? এখন তো ওর ধোলাই হবে। শুনুন সুরেশের বিরুদ্ধে যা সব ধারা প্রয়োগ করলাম তাতে ওকে এখন বাইরে বার করা খুবই শক্ত। যেমন? যেমন ধরুন তিনশ উনআশীর ধারায় একটা কেশ। আর একটা কেশ একশ একান্ন ধারায়। আর তিন নম্বরটা হল গিয়ে চারশ সাতচল্লিশ, দুশ অষ্টাশী, তিনশ তেইশ, চব্বিশ এইসব আর কী? শুনেছেন এইসব ধারার নাম। এক-একটা ধারায় কতবছর জেল হতে পারে জানেন? জানেন না তো? শুধু ঘাড় নাড়লে হবে না। এ সবও জানতে হবে। পাঁচ সাতবছর জেল তো হবেই, বুক ঠুকে বলতে পারি।

—আপনি ওকে কোর্টে পাঠাবেন তো?

—আপনি কি চান বলুন না। আরে আপনি যা চাইবেন, এ কেশে তাই হবে।

—আমি চাই ওকে দু-চারদিন এই হাজতে রেখে দিন। সকালে বিকালে

রোজ দু-চার ঘা পড়ুক।

—কিন্তু মাল আরও ছাড়ুন। যা দিয়েছেন তাতে হবে না।

—সেকি? পাঁচশো দিলাম। তারপরও—শুনে যেন আশ্চর্য হয়ে গেল মোল্লা। দারোগার গলার স্বর এবার একটু কঠোর হল—শুনুন, পাঁচশো টাকায় কিছুই হবে না। পাঁচশ'য় একরাত, আবার পাঁচশো দিলে দু-রাত, আরেক একটা রাত রাখতে হলে আবার পাঁচশো লাগবে।

অবাক বিস্ময়ে দারোগার চোখে চোখ রেখে হারাণ বলে—সে কি, এক-এক রাতের জন্য পাঁচশ টাকা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এক-এক রাতে পাঁচশ টাকা।

—এই নিন আপনি, আরও দু' হাজার দিলাম। এতে ক'রাত রাখতে পারবেন?

—পাঁচশো দিয়েছেন, আর দু'হাজার দিলেন। মোট হ'লো আড়াই হাজার। তাহলে পাঁচ রাত রাখা যাবে।

হাজত থেকে সুরেশ এসবই শুনতে পাচ্ছিল। শুনে সে ভয়ে শিউরে উঠে। দারোগা বলল—তাহলে এখন আসুন মোল্লাসাহেব। হাজতে আমার কাজ করি।

হারাণ অনুরোধ করল। সে যে কতগুলো টাকা দিল, তার তো কিছু সখ আছে। হাজতে কেমন কাজ হয় তার অনেক দিনের দেখার ইচ্ছা।

—দারোগা তাতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। সত্যিই তো এতগুলো নোটের তাড়া দিল। হাজতের কাজ দেখবে, তার বেশী তো ও কিছু চায়নি!

হাজতের তালা খোলার শব্দ শুনে সুরেশ ঝেড়ে মেড়ে উঠে বসে। একজন জমাদার তালাটা খুলে অন্ধকার ভিতরে ঢুকলো। সঙ্গে তার খাবার ঠোঙা। সুরেশ জোড় হাত করে এক গ্লাস জল চাইলো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জমাদার বলে—এইগুলো আগে গেলো। তারপর জল দিচ্ছি। নাও ধরো, গেলো, সুরেশ দুহাতে ধরলো খাবারের ঠোঙাটা। চারটে ঠাণ্ডা ছোট্ট লুচি আর এক হাতা ডাল। একটা লুচি মুখে পুরতে যাবে এমন সময় সজোরে একটা বুট লাথি সুরেশের পিঠে এসে পড়ল। 'মা গো, মরে গেলাম' বলে চীৎকার করে ওঠে সুরেশ। হাত থেকে খাবার ঠোঙা ছিটকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে গেল।

শকুনীর মতো চাউনীশুদ্ধ দারোগাকে হাজতে দেখে সুরেশ দুহাত জোড়ো করে কাতর প্রার্থনা জানায়—দারোগাবাবু, আমি বাঁচতে চাই।

জমাদার তেড়ে গেল সুরেশের দিকে। হাতের ডাণ্ডাটা সুরেশের ওপর উঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে—নে আগে সব কুড়িয়ে নে। খা, খা বলছি। শালা না খেলে মুখে ডাণ্ডা দিয়ে গুঁজে দেবো। এতগুলো লুচি তার দাম লাগেনি। সরকারী পয়সা নষ্ট করা।

দারোগা দুপা এগিয়ে এসে বলে—শালার বাঁচার শখ হয়েছে। এই রাতেই সাবাড় করে দেবো। কাকপক্ষীও টের পাবে না। মোল্লাদের জমি চাষ করা ছেড়ে দিবি বল। রাজী হলে আজই ছেড়ে দেবো।

সুরেশ কাতরোক্তি করে জানায়—আমার যে জমি নিয়ে বিরোধ, তাতে অনেক দিন আগেই সরকারে খাস হয়ে গেছে। ঐ জমিতে আমার তিনপুরু ভাগচাষী ছিল। আমি তো চাষ করার জন্য জে. এল. আর. থেকে লাইসেন পেয়েছি।

—ওসব লাইসেন্সের গপ্প আমার কাছে করে লাভ নেই। ব্যাটা দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি। জমাদার সাব আরম্ভ করুন আবার।

জমাদার ডানপায়ের বুট দিয়ে আবার সজোরে সুরেশের পিঠে আঘাত করে। চীৎকার করে উঠল সুরেশ। আছড়ে দেহটা গিয়ে পড়ল শক্ত দেওয়ালে। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

জমাদার আবার এগিয়ে গেল—সুরেশের দেহ থেকে কাপড়টা একটান মেরে বার করে আনল। উলঙ্গ দেহের ওপর ডাণ্ডার ঘা মারছে আর হো হো করে হাসছে। দারোগাও হাসছে। ক্রমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল সুরেশ।

দারোগা সেন্ট্রিকে ডাকদিল—সেন্ট্রি। সঙ্গে সঙ্গে সেলাম করে সেন্ট্রি এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। দারোগা তাকে একটা মোটা লাঠি আনার হুকুম করল। আরও বলে দিল—দেখিস্, লাটিটায় যেন গাঁট থাকে। যা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। কি চিন্তা করে সেন্ট্রি কিছু দেরী করে ফেলেছিল। জমাদার তার দিকে চোখমুখ পাকিয়ে তেড়ে গেল। জমাদার তাকে ভয় দেখিয়ে বলে—কি দরদ হচ্ছে বুঝি, শালা মজাটা টের পাবে, এখনই লাঠিটা নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটা লাঠি নিয়ে একটা হোমগার্ড ঢুকলো। লাঠিতে বেশ গাঁট আছে। তেল চুকচুকে লাঠি। 'সেন্ট্রি কোথায় গেল। তুই কেন?' দারোগার এই প্রশ্নের উত্তরে হোমগার্ডটি বলল—আপনি এই লাঠিটা নিয়ে যান। আমি ঐ দৃশ্য দেখতে পারবো না। সুরেশকে আমি চিনি। ওর সব কাহিনী জানি। হোমগার্ডের কথায় দারোগা বলল—ঠিক আছে, তুই এখ

কাজ কর। ওর ব্যবস্থা পরে করবো। তাছাড়া ঐ সেন্ট্রির থেকে একাজ তুই আরও ভালো পারবি। পাড়ার গুণ্ডা ছিলি তো।

হ্যাঁ ঠিকই, এই হোমগার্ডটি পাড়ার নামকরা গুণ্ডা ছিল। বেকার থাকার সময় পাড়ার রাজনৈতিক দাদা যাকে সবাই 'ঘোড়ুই দাদা' বলে জানে তার কথায় এই থানায় একশ পাঁচ টাকা মাস মাইনেয় অস্থায়ীভাবে হাজতে 'কাজ' করার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল।

লাঠি হাতে হোমগার্ড দুপা একপা করে এগিয়ে আসে। লাঠির অগ্রভাগ দিয়ে স্বরেশের দেহে একবার খোঁচা মারে। স্বরেশের দেহটা নড়েচড়ে ওঠে। জমাদার হুকুম দেয়—ওকে চিৎ করে শোয়া। হঠাৎ কি হল হোমগার্ডটি আদেশ পালনে ইতঃস্তত করে বসে। জমাদার তেড়ে যায় হোমগার্ডটির দিকে। কষে লাঠির এক ঘা বসিয়ে দেয় তার পিঠে—শালা, তুমিও সেন্ট্রির সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছ। লাফিয়ে ওঠে হোমগার্ড—আজ্ঞে না, দিন আমায় যা বলবেন করবো।

বলে স্বরেশের দেহটা ধরে উল্টে দিয়ে চিৎ করে শোয়াল।

কোথা থেকে মোটা দড়ি খুঁজে পেতে নিয়ে এল জমাদার। হোমগার্ডের হাতে সেটা তুলে দিয়ে হুকুম করলো—নে, এই দড়ি দিয়ে ওর হাত পা বেশ কড়া করে বাঁধ। দড়ি দিয়ে বাঁধা সাঙ্গ হলে মোটা লাঠির ঘা ক্রমাগত পড়তে থাকলো স্বরেশের পিঠে, পায়ের গাঁটে গাঁটে, পাছায় সর্বত্র। যন্ত্রণায় কাতর স্বরেশ। অচৈতন্য দেহটা বুটের ঠোক্কর দিয়ে দেখে সত্যিই ওর জ্ঞান আছে না অজ্ঞান হয়ে গেছে।

হোমগার্ডের হাত থেকে লাঠিটা এবার টেনে নিয়ে স্বরেশের মলদ্বারে অগ্রভাগ ঠেকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে জমাদার। দূরে দাঁড়িয়ে দারোগা হাসি হাসি মুখে সব দেখছে। জমাদার হোমগার্ডটিকে চুপি সারে বলে—অ্যাই, আমার জমাদারটাকে ডাকতো, সে এসব মজা দেখতে খুউউব ভালোবাসে। যা যা ডাক। হোমগার্ড ধীরে ধীরে চলে গেল। জমাদার লাঠিটা সোজা স্বরেশের দেহের অভ্যন্তরে জোর করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালিয়ে দিল। রক্তে ভেসে যায় হাজতখানা।

অচৈতন্য দেহটা ফেলে রেখে হাজত থেকে বেরিয়ে এল জমাদার আর দারোগা। দেখে হারাণ মোল্লা দারোগার সামনের চেয়ারটা দখল করে বসে আছে। দারোগা এসে নিজের চেয়ারে বসে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে তার অগ্রভাগে দেশলাইয়ের আগুন ধরায়। কিছুটা বিশ্রামের ভঙ্গীতে

চুপ করে থাকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। হারাণ মোল্লাকে দারোগা বলে—কি মোল্লা সাহেব, কেমন দেখলেন। দেখুন মশাই, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। কি এখনও টাকার শোক করবেন ?

—আজ্ঞে, না, না। যা দেখলাম আজ, নয়ন জুড়ানো দৃশ্য। ব্যাটা এরপর আর জমি ছাড়বে না বলবে না। নমস্কার, বড়বাবু, আমি এখন চলি। দেখি গাঁয়ে আবার লাল ঝাণ্ডার লোকেরা মিছিল বার করলো কি না।

বন্দীরা শুনছিল সুরেশের মুখ থেকে তার ওপর অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী। বীভৎস কাহিনী শুনে শিউরে উঠল সবাই। এ ধরনের অত্যাচার পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা চালিয়েছে বলেই সবাই জানে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও তার ছেদ পড়েনি। কি বিচিত্র স্বাধীনতা।

কনডেমড্ সেলে জীবনের শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তার হিষ্টরী টিকিট চেয়ে নিয়ে প্রাপ্য রেমিশনের অর্ধেকটাই কেটে নিয়েছেন। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে এক নম্বরে জীবনের প্রবেশ। সবাই তাকে দেখে খুব খুশী। জীবন গান গাইছিল—

"আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়বো রঙমহল।
সৃষ্টির নবমন্ত্রে মোরা গড়বো দিনবদল ॥"

দেবব্রত জিজ্ঞেস করে—জীবনদা, কেমন কাটালে সেলে কটাদিন। এ গান কোথা থেকে শিখলে জীবনদা ? গান থামিয়ে জীবন উত্তর দেয়—কোথা দিয়ে কটা দিন অন্ধকার সেলে যে কেটে গেল তা যেন উপলব্ধির মধ্যেই আসে না। শাস্তি আমাদের বারে বারে পেতে হবে দাদা। সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন বলেই তো আপনারা আজ জেলে। আর এ গান শিখেছি এ গান শিখেছি জেলের বাইরে। জীবন এদের সকলের মধ্যে বসে গানটা বেশ জোরে জোরেই গাইতে থাকে। সুরেশকে ছেড়ে সেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি দেখছিল দেবব্রত। হঠাৎ সেলের দিকে সকলকে দৃষ্টি দিতে বলে—ভাখো, ভাখো তোমরা আবার সেলে কাদের আনছো। একেবারে স্যুটেড্ বুটেড্। কারা ওরা ?

—সত্যিই তো ওরা কারা ? মেঝেয় পাতা খবরের কাগজ থেকে মাথাটা তুলে কাজল বলল—কাজল উঠে—জানলায় গরাদ ধরে বাইরের সবকিছু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখার পর কাজল লাফিয়ে ওঠে। সে অবাক বিস্ময়ে বলল—আরে, ওদের মধ্যে একজনকে তো দেখছি

উত্তরপাড়া থানার ও. সি.। উপস্থিত সকলের মুখে এককথা—তাই নাকি! কই দেখি দেখি। ও. সি.-র 'মিশা', জানলার ধারে ভীড় অনেক। একজন বলল—ব্যাটা জেলে থাকলে যা প্যাঁক যাবে। শালা কম জ্বালিয়েছে? একদিকে দিন-দুপুরে ঘুষ আর অন্যদিকে অত্যাচার। ওঃ, সে কি ভয়ঙ্কর রাজত্ব।

বন্দী চারজন, সকলের পোষাক বেশ ভাল চাকুরের। চারজন বন্দীকে নিয়ে জমাদার এক নম্বরের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাসপাতালের রাস্তা ধরল। কাজল এবার বুঝেছে বন্দীদের মধ্যে কেউই উত্তরপাড়া থানার ও. সি. নয়। অন্য কেউ হবে অথবা গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন হবেও বা।

শ্যামল প্রশ্ন করে—কিন্তু কাজল তুমি হঠাৎ ও. সি.-কে মিশা করা হয়েছে কি করে চিন্তা করলে? ও. সি.-দের মধ্যে কোন একজনেরও মিশা কোন জেলায় হয়েছে কখনও কি শুনেছো?

কাজল বলল—আরে, শুনিনি তো কতকী। কনষ্টেবল থেকে ও. সি. সরকারী কর্মচারী অফিসার, হেডমাস্টার, ডাক্তার শুনছি তো 'মিশা'র খড়্গের আঘাত থেকে কেউ বাঁচছে না।

—ওসব গুজবও তো হতে পারে। সত্যি কোথাও হয়েছে নির্দিষ্ট করে বলতে পারো?

খানিক থেমে কাজল আরও বলে—একটা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এর মধ্যে এসে পড়ছে। গুজব এভাবেই ছড়ায়। ওরা যে-ভাবে পাইকারী হারে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে গ্রেপ্তার করে জেলে চালান দিচ্ছে তাতে মানুষ গুজবকেও সত্য রটনা বলে মনে করে। দুর্ভাগ্য এই দেশের, দুর্ভাগ্য দেশের বামপন্থীদের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হেডজমাদার ঐ চার বন্দী আর তাদের সঙ্গে একজন ওয়ার্ডারকে দাঁড় করিয়ে রেখে একনম্বরে ঢুকে বড় জমাদার শ্যামলকে জিজ্ঞেস করল—শ্যামলবাবু এই চারজন মিশায় আটক হয়েছেন। পরিচয়ে কিন্তু এঁরা সরাসরি আপনাদের দলের লোক নন। তবে আপনাদের ওয়ার্ডে থাকতে চান। আপনি একটু বাইরে এসে ওদের সঙ্গে আলাপ করুন। শ্যামল বড় জমাদারের সঙ্গে বাইরে এসে চার ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। এই আলোচনার সময় এই চারজন ছাড়া সেখানে কোন ওয়ার্ডার বা দ্বিতীয় কোন বন্দী রইলো না।

সবশুনে শ্যামল তাঁদের একনম্বরে একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবে সায় দিল। তবে এঁদের পৃথকভাবে রাখা হবে স্থির হল। এঁদের জন্য পৃথক একটা কমিউন গড়ে

দিতে হবে। এঁরা রাষ্ট্রের হাউসে যোগদান করবেন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেবেন না। জেলকমিটির সভায় এঁদের কমিউন থেকে একজন প্রতিনিধি দর্শক বা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জেলকমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিল।

এদের মধ্যে শিবুবাবু নামে একজন ছিলেন যিনি তাঁর জেলার প্রশাসনের কেলেঙ্কারীর এক বিচিত্র কাহিনী শোনালেন। কাহিনীটা মোটামুটি সকলের কাছেই বেশ রসগ্রাহী। শিবুবাবু বলে যেতে থাকলেন সেই কাহিনী।

জেলার জেলাসমাহর্তা জেলার মন্ত্রীর সঙ্গে বসে প্রতিদিন রাতে বাংলোয় বসে মদ গিলতেন। আড্ডা দিতেন গভীর রাত পর্যন্ত। মন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভীষণ কাছের লোক। তাই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে কেউ ঘাটাঘাটি করতে সাহস করেনি। হঠাৎ সি. বি. আই. থেকে গোপনে জেলাসমাহর্তার গঙ্গার ধারে নির্মিত বিরাট বাড়ী নিয়ে তদন্ত শুরু হয়ে গেল। বিশেষ কেউ টের পেল না। শিবুবাবুর উপর তদন্তের ভার পড়ে। প্রাসাদ বাড়ীর নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করার ব্যাপারে শিবুবাবুর অভিজ্ঞতা প্রচুর। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্কাতীত। শিবুবাবু সি. বি. আই.-এর নির্দেশমতো চারজনের একটা অ্যাকটিভ টিম গঠন করে প্রাসাদোপম বাড়ীতে সমাহর্তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলেন। শিবুবাবু অত্যন্ত সংযতভাবে সি. বি. আই. এর-নির্দেশনামা এগিয়ে দিলেন। সমাহর্তা অত্যন্ত শান্ত চিত্তে এই টিমকে কাজ করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সমাহর্তা নিজেই বল্লেন—হ্যাঁ, আমিও সি. বি. আই. থেকে একটা নির্দেশ পেয়েছি। আপনাদের ভ্যালুয়েশন কথার কাজে সাহায্য করার জন্য। বলুন, আপনারা কি কি সাহায্য চান? শিবু বল্লেন—আপনি স্যার, প্রথমে আমাদের গোটাবাড়িটা একবার সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দিন।

সমাহর্তা। কাজ শুরুর আগে কিছু জল খাবার খেয়ে নিন। বলেই সুইচ টিপতেই খুব মিষ্টি আওয়াজে বেল বেজে উঠল। বেয়ারা ছুটে এসে সেলাম জানাল।

—'এঁদের প্রত্যেকের জন্য লুচি, মিষ্টি, চা নিয়ে এসো।'

সেলাম ঠুকে বেয়ারা ছুটে গেল আদেশ মাফিক কাজ করতে। কিন্তু শিবু বাবুরাই এ আপ্যায়নের কোন প্রয়োজনীতা নেই বলে দিলেন—না স্যার ওসব কিছু করবেন না। আপনি যে সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ।

সমাহর্তা। না, না, তা কি হয়। আপনারা আমার বাড়িতে অন্য সময়ে তো আসবেন না। এখানে কর্মচারী বসের সম্পর্ক তো নয়।

ইতিমধ্যে বহুমূল্য কারুকার্যখচিত ট্রেতে জল খাবার নিয়ে এলো বেয়ারা।

সামনে এসে প্রবেশ করলেন এক সুবেশা তরুণী। মনে হল, সমাহর্তার কন্যা। কোনো আপত্তি টিকলো না। সকলেই কিছু মুখে দিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠতে হল। শিবুবাবু চিন্তা করলেন, 'এরকম ছোটোখাটো ঘটনা নিয়ে জেদাজেদি করে পরিস্থিতি পাল্টে যেতেই পারে।

সাহেব সঙ্গে করে ওঁদের প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে দেখালেন। প্রাসাদোপম বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে প্রচুর সময় লেগে যায়। কিন্তু পশ্চিমের এক কোণে দেখা যায় ছোট একটা দরজা। দরজা খুললে মাথা হেঁট করে কুঁজো হয়ে ঢুকতে হবে। ঐখানটায় থমকে দাঁড়ায় শিবুবাবু। শ্যেনদৃষ্টি পড়ে। সমাহর্তা ঈষৎ চেঁচিয়েই বল্লেন—কি হল দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?

শিবু। স্যর, এই দরজাটা একবার খুলবেন?

সমাহর্তা রাজী হয়ে তৎক্ষণাৎ শিকল থেকে তালা খুলে দিলেন। দরজা খোলা হল। মাথা হেঁট করে কুঁজো হয়ে ঢুকলো শিবু। ঘন অন্ধকার ঘর। কিছুই দেখা যায় না, বেরিয়ে এসে নিজের থলি থেকে বার করলো এক পাঁচ ব্যাটারী টর্চ। টর্চ জ্বালতেই দেখা গেল খুব ছোট একটা চোরা কুঠরী। কুঠরীর মধ্যে সারি দেওয়া বড় বড় টিন। সবই তেলের টিন। নিজের পকেটে হাত দিল শিবু। একটা চাবি বার করে দেওয়ালের একটা ক্ষুদ্র ছিদ্রে ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। হঠাৎ সকলকে চমকিত করে দেওয়াল দুভাগ হয়ে গেল। নিচটা ঝুঁকে দেখতে হয়। অন্ধকার। বিস্ময়ে সবাই হতবাক। টর্চ জ্বালতেই দেখা গেল নিচে থরে থরে সাজানো প্রচুর দামী বিদেশী মদের বোতল।

কোন কথা না বলে যে অবস্থায় সব ছিল সেই পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দিয়ে শিবু বেরিয়ে এল। মুখে কোন কথা নেই। সকলেই নির্বাক। সমাহর্তাও স্থির। শুধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উদ্বিগ্ন স্ত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কানে কানে কিছু শোনালেন, কিছু ইঙ্গিতও করলেন।

সকলে আবার বাইরের বৈঠকখানায় এসে বসে। আবার চা এল। চা ছাড়া এবার আর অন্য কিছু গ্রহণে শিবুবাবুরা অস্বীকার করে। চায়ের টেবিলে ববচুলো মেমসাহেব এসে উপস্থিত। হাতে একটা দামী ভ্যানিটি ব্যাগ। শরীর বেশ আঁটোসাটো, যত্ন নিয়ে পরিচর্যা করা। সাহেবের হাতে ব্যাগ থেকে একটা খাম

এগিয়ে দিলেন। খামের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভরা আছে লক্ষ্য পড়ে।

সমাহর্তা খামটা শিবুবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—এটা অনুগ্রহ করে নিন, আপনারা কষ্ট করে এসেছেন। এটা নিলে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো। এতে দশ হাজার টাকা আছে। একটা অনুরোধ, আমাকে আপনারা বাঁচান।

ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে শিবুবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে। বিনীতভাবে হাতজোড করে সে বলল—মাপ কববেন স্যর, ঘুষ জীবনে কখনও নিইনি। সবচেয়ে ভালো আপনি জানেন। এখনও নিতে পারবো না। আমাদের আবার তো আসতে হবে। আপনি শুনে নিশ্চিন্ত হবেন যে আমরা অন্যায় কিছু রিপোর্ট তৈরী করবো না। টাকাব তোড়া সাহেব মেমসাহেবের সামনে রেখে দিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব শিবুবাবুর টিম প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল।

শিবুবাবুর প্রাসাদের ভ্যালুয়েশন কষে সি. বি. আই.-এর কাছে রিপোর্ট দিলেন। এর কয়েকমাস পবেই সেই জেলা সমাহর্তাব ভাগ্যে ঘটলো 'ফোবসিব্‌ল্‌ রিটায়ারমেণ্ট' বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ।

তার কয়েকমাস পরেই শিবুবাবুদের পালা শুরু। সেই চারজনেরই হাতে হাতকড়া, 'মিশা'য় আটক, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে চালান। 'ফোরসিব্‌ল্‌ রিটায়ারমেণ্ট' ঘটনার প্রতিশোধ।

কাহিনী বলা শেষ। কাজল বলল—উঃ, মশাই দারুণ ঘটনা। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি উত্তরপাড়া থানার ও. সি.। গল্পের মাঝে রমেশ কয়েকটা কলাইকরা গ্লাসে র'চা এনে সবার সামনে এনে ধরে। তাবপর সেগুলো আবার ভাগ হলো। কারণ আসরে যতজন লোক, গ্লাস তত নয়।

রমেশ বললো—শিবুদা, ধরুন, একনম্বরের একনম্বর চা। বাইরে পাবেন না। এখানে সশরীরে স্বর্গলাভ। একেবারে অমৃতসুধা।

শিবুবাবু বল্লেন—ভালো ভালো। দিন গলাটা ভেজাই আগে। স্বর্গে পড়ে যাওয়া যাবে কিনা চিন্তা করা যাবে।

রমেশ বললো—আমার যখন মুখাগ্নি করার কেউ নেই, বন্ধুদের বলেছি আমি যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো তার আগে যেন আমার মুখ ফাঁক করে খানিক চা ঢেলে দেওয়া হয়। হো হো করে সকলে হেসে উঠলো।

হঠাৎ সবার কানে এলো সেণ্ট্রির হুইসেলের আওয়াজ। বাইরে দৌড়াদৌড়ি। হুইসেল শুনে কোন কিছু বুঝতে গেলে বিপদ আছে। তাই সেলের লোক ওয়ার্ডে,

হাসপাতালের লোক ওয়ার্ডে, ওয়ার্ডের লোক সেলে। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কি যে ঘটেছে কেউ কিন্তু ধরতে পারছে না। মাথাটা তুলে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেবে সে সাহসও কারুর নেই শুধুই ছুটছে। ওদিকে হুইসেল বাজাও থেমে গেছে। হুইসেল বেজেছে অনেকক্ষণ। এবার শুরু হল খানিক পাগলা ঘন্টির আওয়াজ।

প্রধান ফটক উন্মুক্ত হ'ল। বড়, মেজ, সেজ, ছোট সব সাহেবরাই ঢুকলো ভিতরে। সঙ্গে রাইফেলধারী সেন্ট্রি। ওরা চলেছে সাত নম্বরের দিকে। সাত নম্বরে জোর সংঘর্ষ। জ্যেঠাবাবু আর কাকাবাবুর শিষ্যদের মধ্যে মাথা ফাটাফাটির ঘটনা ঘটে গেছে। অবাধ চাকু চালানো। অশ্লীল গালিগালাজ, শ্লোগান আর পাল্টা শ্লোগানে দশদিক মুখরিত। এগারো নম্বরের সঙ্গে সেলের সংঘর্ষ। অনেক দিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল একটা গোলমাল শীগগীরই হতে পারে।

এদিনের সকালে কেশটেবিল হয়ে যাওয়ার পর 'কাকাবাবু'র দলের নেতা ফাটা-ষষ্ঠীকে জেলরবাবু অফিসে ডেকে পাঠিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাকি গল্পসল্প করেছেন। জেলরবাবুর বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে শম্ভু পা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করছিল।

—আচ্ছা, শম্ভুবাবু, আপনাদের দলে অনেক সাচ্চা কর্মী আছেন না?

—অনেক কি বলছেন স্যার, সকলেই তো সাচ্চা। আমাদের দলের চেহারা চারুবাবুর দলের চেহারা থেকে অনেক তফাৎ।

—বেশ, বেশ, দলপতি কি আপনি?

ঘাড় নেড়ে শম্ভু উত্তর করে—আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যর,

শম্ভুর ঘনঘন পা দোলানোর ফলে টেবিলটাও দুলছিল। ডান হাতের কনুই পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন। মাঝে মাঝে সেই কাটা হাতটা এমনভাবে শূন্যে তুলছে যে মনে হবে বুঝি শম্ভু কাউকে মারধোর করতে চায়।

—আচ্ছা, আপনারাও তো বিশ্বের তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন তাই তো?

—নিশ্চয়ই। আমরা বিশ্ব-বিপ্লব ঘটাবো।

—শম্ভুবাবু, কিছু মনে করবেন না। কিছু নামকরা ওয়াগন ব্রেকারও তো আপনাদের দলে রয়েছে। পুলিশ আর গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মিলে যাচ্ছে।

—ঠিকই বলেছেন স্যর। ওদের দিয়েই তো আমরা অ্যাকশন করিয়ে থাকি। কনষ্টেবলগুলোর লাশ পড়ে তাতো আমরা 'ও. বি'দের দিয়েই করিয়ে থাকি।

—'ও. বি' মানে ?

—ও. বি মানে ওটা সংক্ষেপ নাম। ওয়াগন ব্রেকার। সাঙ্কেতিক বুঝলেন স্যর।

কথাবলার ফাঁকে ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কাগজ বার করে তুলে দেন শম্ভুর হাতে। হাতকাটা শম্ভু তালিকাটার ওপর চোখ বোলাতে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে—কিন্তু স্যর, এ তো সব আমাদের দলের কর্মীদের তালিকা। তালিকার সঙ্গে রয়েছে বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা, বয়স, কোন্ কোন্ দেশের আসামী। কোত্থেকে স্যর এতো সব পেলেন ?

—আরে মশাই আপনাদের নেতার কাছ থেকে পেয়েছি। মাসে মাসে মাশোহারা নেন তিনি।

—স্যর, কাগজটা আমাকে দেবেন স্যর এক ঘণ্টার জন্য।

জেলর। এক ঘণ্টার জন্য কেন ? ঐ তালিকাটা আপনি একেবারে নিয়ে যেতে পারেন। আমার কোন কাজে লাগবে না। তাছাড়া এসব আপনাদের দলের ব্যাপার। তার মধ্যে আমি কেন নাক গলাবো বলুন।

শম্ভুর মুখ ততক্ষণে সাদা হয়ে গেছে। কাগজটা হাতে করে চলে গেল শম্ভু জেলরের ঘর থেকে।

এদিন বিকেলবেলায় 'কাকা' গোষ্ঠীর নেতা সুশীল সেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জেলরের জানলার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল—স্যর, আমায় ডেকেছিলেন।

জেলরবাবু একই চুপিস্বরে বল্লেন—হ্যাঁ, এদিকে আসুন।

সুশীল দু-একপা করে এগিয়ে গেল জেলরবাবুর তারের জাল দেওয়া জানলার কাছে। তারের জালের মধ্যে একটা বড ছিদ্র দিয়ে একটা কাগজের টুকরো সুশীলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জেলর বল্লেন—মিলিয়ে নিন। বলে জেলর জানলার সার্শি বন্ধ করে দিলেন।

হাতে করে কুড়িয়ে নিল সুশীল কাগজের টুকরোটা। জেলরবাবুর দিকে তাকাতেই দেখে জানলা বন্ধ হয়ে গেছে। এইবার সুশীল কাগজটা নিয়ে লেখা নামগুলো নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। এ নিশ্চয়ই শম্ভুর কাজ। তা না হলে ঐ নাম ঠিকানা সব বিস্তারিত কাহিনী জেলরবাবু পাবেন কোত্থেকে। 'শম্ভুকে খুন করা হ'ক।' প্রস্তাব উঠলো বৈঠক থেকে।

শম্ভুও ওয়ার্ডে বন্ধুদের নিয়ে শলাপরামর্শ করছিল। নিশ্চয়ই সুশীলের গ্রুপের এই কাজ। যে-সব ও. বি-রা দলে আছে তাদের সকলকার নাম ঠিকানা, কেশের বিবরণ তুলে দেওয়া হয়েছে। এ তো বিশ্বাসঘাতকতা! একসময় তো কাকা জ্যেঠা

সকলেই ছিল একপরিবারের মানুষ। আজ না হয় ভিন্ন। তাই বলে পুলিশ গোয়েন্দাদের কাছে নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দিতে হবে?

সাতনম্বরের সঙ্গে সেলের সংঘর্ষ যখন থামলো তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আসামীদের গুনতী শুরু হয়ে গেছে। সবশেষে মিললো দরজায় তালা লাগানোর শব্দ।

একদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। বন্দীরা একটু পা ছড়িয়ে বিভিন্ন সীমানার মধ্যে বসে গল্প গুজব করতে পারছে। সাতের সীমানা, ছয়-এর সীমানা। এই রকম এক-এর সীমানা সেলে কমডেম্‌ড সেল সবারই সীমানা নির্দিষ্ট। বিকাল চারটে বাজার পর খানা এল। যার যার থালা ভাঙ্গা ফুটো গোটা যা আছে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে রতন জমাদার। দশাসই চেহারা। রতন জমাদার-এর দায়িত্ব রয়েছে শৃঙ্খলা বজায় রাখায়। খেয়াল হলেই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দেয় দুমদাম করে। মুখে অশ্লীল খিস্তি। বিচারাধীন বন্দী হলে কি হবে মা বোনের ইজ্জত নিয়ে রতন জমাদার গালিগালাজ পূর্ণ শব্দ অবিরাম উচ্চারণ করে যাবে। দু-একটা দাঁত পড়ে গেছে তাতেও কমতি নেই।

থালা হাতে পনের বছরের শশী দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। ডাল রুটি ওকে এখনই খেয়ে নিতে হবে। ওর খাওয়ার পর সেটা আবার নেবে পঞ্চাশবর্ষীয় সোম। ওরা দুজনে একসঙ্গে একই ওয়ার্ডে। রুটি গুণে গুণে তুলে দিচ্ছে জীবন। একজন হাতা দিয়ে ঢালছে ডাল, আর সুলেমান দিচ্ছে কুমড়োর তরকারী। শশীর থালায় একটু বেশী পড়ে গেছলো ডাল। ডাল যে দিচ্ছিল তার পিঠে পড়ল সজোরে এক লাঠির ঘা। বিচিত্র মুখভঙ্গী করে ওঠে জমাদার—শালা বাড়ীর খানা পেয়েছিস। সুলেমানের পিঠেও পড়ল লাঠির ঘা। সেও নাকি ঘ্যাট একজনের থালায় দিয়েছিল একটু বেশী। লাইন থেকে একজন একটু সরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। এক বছর আটেকের কিশোর। কারুর খানা হয়ে গেলে হয়তো তারকাছ থেকে সেটা নেবে। থালাটা পেয়েই সে ছুটে গেল রুটি ডাল আনার জন্য। জমাদার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ দৌড়ে এসে ঐ কিশোরের অঙ্গেবিশ্রী মুখভঙ্গী করে এমন লাঠির আঘাত করে বসল যে, সে মাগো বলে আছড়ে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল। তার হাতের সেই থালা ছিটকে বেরিয়ে গেল। এদিক সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রইলো ডাল, রুটি। এইরকম নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যেন সকলের কেমন হয়ে গেছে গা-সওয়া।

একনম্বর থেকে দেবব্রত দৌড়ে এসে চেপে ধরে রতন জমাদারকে। রতন

জমাদারেব মুখোমুখি হয়ে জানতে চায় ঐ একটা সাত-আট বছরের কিশোর কি এমন অপরাধ করেছে যে তার এমন চরম শাস্তি হবে। সাজা হয়েছে এমন কয়েদীদের সঙ্গে আপনারা তো পশুর মতো ব্যবহার করেন। আর যাদের এখনও সাজা হয়নি তাদেরও কি একইভাবে পেতে হবে অবমাননা, শাস্তি।

রতন জমাদার গলা স্বাভাবিকের তুলনায় গলাটা একটু বেশী গম্ভীর করে তুলে বলল—আমি যা করেছি বা করি, তারজন্য আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো না।

—বেশ, আমরাও তাহলে আপনার বিরুদ্ধে জেলেব বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আনবো। দেখি আপনার চৈতন্যোদয় হয় কি না। দেবব্রতর পাশে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে কাজল, সুখেন্দু, শ্যামল, অনেকেই।

ভাবলেশহীন মুখে জমাদার বলে—আপনারা রাজনীতিঞ লোক, রাজনীতি করুন। আমরা চোরচোট্টা নিয়ে থাকি। চোরচোট্টাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসবেন না। সেটা মোটেই ভাল হবে না, আপনারা যে যার নিজের নিজের সম্মান নিয়ে চলে যান।

দেবব্রত এক হাতের তালু অন্য হাতে চাপড় মেরে বলল—না, আমরা এসেছি আপনার কাজের প্রতিবাদ করতে। আপনি প্রায়ই বন্দীদের সঙ্গে একরকম দুর্ব্যবহার করে থাকেন কারণে-অকারণে। রাজনীতি করলেও এখানে আমাদের কোন পৃথক সত্বা নেই। ওরা যা আমরাও তাই। একই ধরনের বাড়ি, নিয়ম-কানুন সকলের জন্য একই। একই ধরনের কংক্রিটের ছাদের তলায় আমরা বাস করি। ঐ যে, যে ছেলেটাকে প্রহার করলেন ওকে আমি চিনি। ওর নাম জিয়ার। বাবা মা নেই। হানড্রেড নাইন কেশে ওকে ধরা হয়েছে। এখানে চারমাস হল পড়ে আছে। ওতো সমাজবিরোধী নয়। কিন্তু আমাদের দেশে জেলখানায় কেউ যদি বাচ্চাবয়স থেকে থাকে সেতো সমাজবিরোধী হয়েই যাবে। জিয়ার তো কোন অন্যায় করেনি। তবু তাকে মারধোর করা হল। মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমরাও চুপ করে থাকবো না। কোনকিছু হয়ে গেলে দায়ী হবেন আপনি।

রতন জমাদারের চোখমুখ রাগে ভারী হয়ে ওঠে। মুখখানা ভারী। অপমানিত বোধ করে উল্টোদিকে মুখ করে গট গট করে জেল অফিসের দিকে চললো। সব্বাই বুঝলো রতন জমাদার চললো কর্তাদের কাছে নালিশ জানাতে। ততক্ষণে জমে উঠেছে বেশ ছোট খাটো ভীড। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে—শালা জেলখানাটা যেন ওঁর জমিদারী। পশুর মতো খাঁচার মধ্যে পুরে

বিক্রম দেখানো বার হয়ে যাবে।

আরেকজন তার স্বরে স্বরে মিলিয়ে বলে—শালা আমরা চোরচোট্টা, আর উনি পীর। মেয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে কি করেছিলে, কর্তারা তো কেড়ে নিয়েছে কোমরের বেল্টটা। একজন. মহিলা কয়েদীকে গুণতীর সময় জাপটে ধরেছিলে। মনে নেই শালা। আজ তোমার হয়েছে কি, এরপর আমরা সবাই মিলে তোমাকে এই জেলখানায় এমন করবো যে টিকতে পারবে না।

—আমরা ওর পিণ্ডি চটকাবো। চীৎকার করে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো আর এক কয়েদী।

—ঐ দ্যাখো, জেলরবাবু ঢুকছেন ভিতরে। পিছনে চামচা রতন জমাদার। জেলরকে যেন আমরা ভয় পাই।

—আসুক জেলর। আমরা সবাই মিলে রুখে দাঁড়াবো।

জেলরকে আসতে দেখে স্থান ত্যাগ করলো না ভয়ে একজনও। আগে আগে এই দুজনকে একসঙ্গে দেখলে সাধারণ বন্দীরা ভয়ে কাঠ হয়ে যেতো। এমনদিন গেছে যখন এই জেলের মধ্যে কয়েদীরা এই জেলরেরই নির্দেশে আর জমাদারের লাঠির গুঁতোয় মাটিতে পড়ে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকেই তো জেলের নিয়মকানুন আদৌ জানে না। শীতের ভোরবেলায় ওয়ার্ডে গুণতির সময় কেউ ভুল করে হয়তো প্রবল প্রকৃতির টানে প্রস্রাবে বসে পড়েছে। ঘুরে আসতেই রতন জমাদারের লাঠির ঘায়ে সে শুয়ে পড়লো। অথচ সামনেই জেলর দাঁড়িয়ে। শীতের কোন পোষাকও হয়তো বা তার নেই। প্রতিবাদ করেছিল জীবন, সুলেমান। এই রকম আরও অনেকের নতুন সাজা হয়েছে। সব কিছু জানে না। এরকম করে মারবেন না হুজুর। ব্যস, সেদিন সত্যি ওয়ার্ডে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। জেলরবাবুর হুকুম আছড়ে যেন পড়ল মাটিতে।—"চাব্‌কে সোজা করে দাও। বেয়াদপী সহ্য করা হবে না। এটা জেলখানা না মজা মারার জায়গা।" সেদিনের ঘটনা সকলের আজও মনে আছে স্পষ্ট। জীবন, সুলেমান, আর সেই নয়া আমদানীকে হাতকড়া পরা অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়ার্ডের বাইরে কাটাতে হয়েছে। আদেশ হয়েছিল সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটে। প্রকাশ্যে আমগাছটার ডালের সঙ্গে হাতকড়া পরানো হাতদুটো চেন দিয়ে বাঁধা থাকবে। সার দিয়ে তিনজন পরপর দাঁড়িয়ে গেছল। সাহেবদের দলবল এসে দেখে গেছেন এদের শাস্তি। এমনভাবে বাঁধা ছিল কেউ সামান্য ঘাড় ফেরাতে পারেনি। তবে চোখগুলো পড়েছিল সেল, কনডেম্‌ড সেল আর পুরানো ফাঁসীর মঞ্চটার দিকে।

ওরা তাকিয়েছিল সারাদিন মানুষের দিকে নয়, ফাঁসীর মঞ্চের দিকে। ওদের সামনে আসামী কেউ আসেনি। লাঠিধারী দুই সেন্ট্রি বরাবর ঠাঁয় প্রহরারত ছিল। যন্ত্রণায় কাতরোক্তি হলেই লাঠির আঘাত। ওরা কেউ চীৎকার করেনি। বিকৃত হয়ে গেছলো ওদের মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে কান্না চেপেছিল।

উঁকিঝুঁকি মেরেছে সারাদিন সহবন্দীরা, সহমর্মীতার বেদনার্ত মুখে যেদিনের ঘটনা সেদিন তখনও কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারায় বিশ্বাসী মানুষের ভীড়ে জেলখানা জমজমাট হয়ে ওঠেনি। জেলের মধ্যে তখনও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলার কেউ ছিল না। আজ পাল্টে গেছে জেলের ভিতরটা। মাঠে-ময়দানে সোচ্চার হতো যে মানুষগুলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেই মানুষগুলো কারাগারের মধ্যে চুপ করে থাকে না।

জেলরবাবু গম্ভীরমুখে প্রশ্ন রাখলেন—আপনারা এত ভীড় করেছেন কেন? যাদের কোন দরকার নেই তারা সোজা যে যার নিজের নিজের ওয়ার্ডে চলে যান। জেলরের বজ্র নির্ঘোষ আদেশ শুনে সুখেন্দু আদৌ চুপ করে থাকতে না পেরে বলে—জমাদার সাব এই অল্পবয়সী ছেলেটিকে এমন মারধোর করেছেন যা চোখে দেখা যায় না। আমাদের সকলের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে। আমরা দেখি ওর হাতের থালা একদিকে আর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে রুটিগুলো, সকলের সামনে ও মুখ থুবড়ে পড়ে।

রতন জমাদার জেলরের পাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছিল। অস্বাভাবিক মুখ চোখ করে সে সুখেন্দুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সোজাসুজি বলে—আমার কাজে বাধা দেবার অধিকার আপনাদের নেই।

একই সুরে জেলর হুমকী দিয়ে বলে—আপনারা যদি প্রতিদিনই এভাবে জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজে বাধা দেন তাহলে আমাদেরও আইনমাফিক চলতে হবে। আপনাদের অডাসিটি দেখে আমি অবাক হচ্ছি। সব সময় মনে রাখবেন যে আপনারা প্রত্যেকে বন্দী।

একথায় কাজলই উত্তর দেয়—পাশে শ্যামল দাঁড়িয়ে। কাজল বলল—আমরা বন্দী নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের অপরাধের বিচার করার সাহস সরকারের হয়নি। তাই আমরা বিনাবিচারে আটক আছি। আর ঐ ছেলেটিও একই গোত্রের। আইনমাফিক আমরা সবাই চলতে চাই। আইনটা একপক্ষের জন্য, অন্যপক্ষ স্বাধীন যা ইচ্ছা খুশী করতে পারবে এটা আইন নয়। আইনকে রেপ করা বলে। আইনকে যারা রেপ করে তাদের কি শাস্তি হতে পারে বলুন।

শ্যামল এগিয়ে আসে। তার কথার মধ্যে কঠিন দৃঢ়তা। সে বলে—ঐ ছেলেটি এমন কিছু অপরাধ করেনি যে তার ওপর প্রহার চলবে। কথায় কথায় মারধোরের অধিকার জেলরের, জমাদারের কারুরই নেই। আপনারা চার দেওয়ালের মধ্যে পেয়ে যদি এভাবে অত্যাচার করেন তবে তা বন্ধ করতে আমাদের সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে। জেলরবাবু উত্তর দেন—আপনারা তো রাজনৈতিক দলের কর্মী। এসব চোর বাটপাড়দের সঙ্গে আপনারা মিশছেন কেন? জেলকোডে এ ধরনের মেলামেশা সম্পূর্ণ বে আইনী।

শ্যামল বলে—আমাদের চারদেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখার পর আর কোন ভেদাভেদ নেই। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও সেই পরিচয় কারাগারে নেই। কাজেই আপনিও সে-সব কথা বলতে পারেন না।

পাশ থেকে সরব কণ্ঠ ভেসে ওঠে—"আমরা চাই প্রত্যেকে এখানে মানুষের মর্যাদা পাক। আমাদের বহু কমরেড জেলখানার বাইরে প্রাণ দিচ্ছে। মরতে আমরা ভয় পাই না।" জেলরবাবু চুপ করে কথাগুলো হজম করে যান।

আর একজন বলে উঠে—এরপর থেকে আমরা ভাত থেকে চিড়া-গুড়-দানা সব কিছু মেপে নেবো। তারপরই হঠাৎ সমস্বরে চীৎকার—বন্দীদের খাদ্যের পরিমাণ কম করে দেওয়া চলবে না, চলবে না। জেলের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার বন্ধে সমস্ত বন্দীরা এক হও। প্রত্যেককে থালা, বাটি, কম্বল দিতে হবে, দিতে হবে। এই রকম অজস্র উক্তি, অজস্র শ্লোগান, আর প্রত্যেকের মুষ্টিবদ্ধ হাত। জেলরবাবু মুখ গম্ভীর করে আর বাক্য না বাড়িয়ে সোজা অফিসের দিকে চলে গেলেন। পিছু পিছু চলল লাঠিহাতে রতন জমাদার।

জেলর আর রতন জমাদার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ পড়ে গেল। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চীৎকার। কেবল সাতনম্বর আর সেল থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

দীর্ঘকাল শ্যামলের কোন ইণ্টারভিউ আসেনি। রাজনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র পরিবারের লোকজনই দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে। হঠাৎ শ্যামলের নামে সত্যি একটা ইণ্টারভিউ এলো। মণিকাদি ফিরেই যাচ্ছিলেন। একনম্বরের বন্দী সঞ্জিতই লক্ষ্য করেছিল। ওর ছিল ইণ্টারভিউ। কে একজন মহিলা শ্যামলের বৌদি বলে পরিচয় দিচ্ছেন আর ডেপুটি জেলর বলে চলেছেন শ্যামলবাবুর পরিবারে কেউ নেই বলেই আমরা জানি। কাজেই মঞ্জুর হলো না সাক্ষাৎকার। শ্যামল সঞ্জিতের কাছ থেকে শুনে ছুটলো গেটের দিকে। বড়

ফুটোটা দিয়ে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়। তখনও মণিকা লড়ে যাচ্ছে—হ্যাঁ আমি শ্যামলের বৌদি। আপনি ডেকে আমুন। কি বলে তিনি দেখুন। ডেপুটি শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছে না। এমনভাব দেখাচ্ছে। শ্যামল বড ছিদ্রের কাছে একবার চোখ আর একবার মুখটা এগিয়ে নিয়ে কখনও দেখে কখনও বা চীৎকার করে বউদি, দাঁড়ান। আমি এসেছি। মণিকার কানে সে আওয়াজ গেছলো। সেও তখন ডেপুটিকে ছেড়ে জেলরকে ধরেছে। যেন গেটের বাইরে নাছোড়বান্দা। মণিকার সঙ্গে শেষে সাক্ষাৎকার ঘটেছিলো শ্যামলের।

শ্যামল জেল অফিসে জাল দেওয়া জানলার ধারে আর বিপরীত দিকে বহুদিনের সংগ্রামের সাথীর স্ত্রী মণিকা বৌদি, সঙ্গে মাধুরী। মাধুরীর সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। স্বাস্থ্য আগের থেকে একটু বেশী উজ্জ্বল।

জানলার ওপাশে তখনও ভীড় কমেনি। অধিকাংশই মহিলা। কেউ তার সন্তানের সঙ্গে, কেউ পিতা আবার কেউ বা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষমান। এরই মধ্যে একটু ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে মণিকাবৌদি ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলো—শ্যামলদা আপনার কিছু দরকার আছে কি?

শ্যামল ভীড় দেখে কিছুটা চিন্তা করে। উত্তর দিলে ঐ ভীড়ের মধ্যে বৌদির কানে পৌছবে কি না। মণিকাদি জোর করে আরও একটু এগিয়ে এসে বলে—কি বলুন, কিছু লাগবে। কিছু বিড়ির বাণ্ডিল এনেছি। এগুলো লাগবে কি?

শ্যামল উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই, বিড়ির তাড়া এনেছেন এতো ভীষণ প্রয়োজনীয় জিনিস।

—তাহলে গেটের কাছে আসুন। দিয়ে দিচ্ছি। আর মাধুরী এসেছে। তাকে কিছু বলবেন না।

—মাধুরীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসিমুখে শ্যামল বলে—কি খবর মাধুরী কেমন আছো? বাঃ বেশ মানিয়েছে।

মাধুরীর মুখের ভাব কেমন যেন হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—আমরা তো বেশ ভালোই আছি শ্যামলদা। আপনাকে তো বেশ রোগা দেখাচ্ছে।

—অনেককাল পরে দেখছো বলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। সংগঠনের কাজ কেমন চলছে?

—সংগঠনের কাজে একদম মন দিতে পারছি না। আপনি জেলে বসে থাকুন না। ব্যাস্ তাহলে সবকিছু ঠিক থাকবে।

—জেলেও আমরা চুপ করে বসে নেই। সেসব খবর কি তোমরা বাইরে
াও না।

এতক্ষণে পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই ডেপুটি এগিয়ে এসে শ্যামলের
াধে হাত দিয়ে বলে—শ্যামলবাবু, আপনার তো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, এবার
ান। শ্যামল চলে গেল প্রধান লৌহ ফটকের দিকে।

ডেপুটির সঙ্গে জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন মহিলার তর্ক শুরু হয়ে
গল। মহিলা দুজনের মধ্যে একজন বলছে—আমার ছেলে মাত্র সতেরো বছর
য়স। সে কোথায় গেল ডেপুটিবাবু একটু খোঁজ দিন দয়া করে। বাছা আমার
ত না বেঁচে আছে তা কেন কেউ বলছে না। পনেরো দিন হয়ে গেল। রাত
খন দুটো। "থানা থেকে এসেছি, আপনার ছেলেকে ঘুম থেকে তুলুন।" বলে
রজার সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার। ছেলে আমার কাছেই শুয়ে থাকতো। জোর
রে ওরা ঘুম থেকে টেনে তুলে জীপে তুলে নিল। বাড়ির কাছে থানায়
াছলাম ডেপুটিবাবু। থানার দারোগা বল্লেন—না ঐ নামে এই থানা থেকে
াউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পনেরো দিন কোন খোঁজ পাচ্ছি না।

কি ভেবে ডেপুটি জেলর মহিলাদের আশ্বস্ত করে আসামী এণ্ট্রি খাতা খুলে
ন্ন তন্ন করে দেখে ব্যর্থ হয়ে বল্লেন—জেলে ঐ নামে কেউ এখনো আসেনি। তবে
ানা হাজতে থাকাই স্বাভাবিক।

—আমি মা। কদিন ধরে ছেলের সন্ধানে ক্লান্ত। আপনি বলছেন
লহাজতে নেই। থানা বলছে পুলিশহাজতে নেই। ডেপুটিবাবু, আপনিই
লুন আমার পুত্র কোথায়? কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পুত্র-সন্ধানী মা।

দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো ডেপুটিবাবু বলে ওঠেন—দেখুন, আপনার ছেলেকে
ম করে ফেলে দিয়েছে হয়তো। পার্টি করতো নিশ্চয়ই সে। দুহাতে মুখ ঢেকে
হিলা চীৎকার করে ওঠে—'না না ওকথা বলবেন না ডেপুটিবাবু।' মহিলা প্রায়
াজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে কিছুক্ষণ পড়ে থাকে। তারপর তাকে জল দিয়ে হাওয়া
য়ে সুস্থ করে তোলে। হাত ধরে সঙ্গিনী রাস্তায় নিয়ে তোলে।

এই ঘটনার অর্ধেকটা শ্যামল গেটে মণিকাদি মাধুরীর সঙ্গে কথা বলার সময়েই
নে যায়। ওয়ার্ডে ঢুকে নিজের সিটটায় বসে মাথার মধ্যে নিজের দুহাতের
াঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে ঘন চুল টানতে আরম্ভ করে। দেবব্রত এসে তার কাছে বসে।
ামলকে চিন্তিতমুখে দেখে জিজ্ঞেস করে—শ্যামল কি ব্যাপার। ইণ্টারভিউ
গছলে, বাহিরে কোন খারাপ সংবাদ আছে নাকি?

শ্যামল পুত্রসন্ধানী মায়ের কাহিনী শুনিয়ে বলে—দেবব্রতবাবু, দেশে এ কোন রাজত্ব শুরু হল। দেশের ভবিষ্যতই বা কি? দেবব্রত উত্তর দেয়—আমরা জঙ্গলের রাজার রাজত্বে বাস করছি। বিড়ির বাণ্ডিলগুলো টেনে খুলতে গিয়ে একটা সাদা কাগজের চিরকুট বের হল। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা জন্মভূমির বাল্যকালের সঙ্গী গণ-আন্দোলনের সংগঠক গ্রামের সর্বহারাদের প্রিয়নেতা সন্দীপের ছোট চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল—"তোমার অনুপস্থিতি আজ আমাকে ভীষণ নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। মা, বোন, দাদা শীঘ্রই জেল গেটে তোমার সঙ্গে দেখা করে। আমার জেলগেটে যাওয়া বারণ, তাই যেতে পারছি না। তোমার কি কি খেতে ভালো লাগে জানাবে। অভিনন্দনসহ সন্দীপ।" বারকতক চিঠিটা পড়ল শ্যামল। কত ভালো লাগছে চিঠিটা পড়তে। বন্ধু সন্দীপ সে যে প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু, সহযোদ্ধা। সযত্নে রেখে দিল শ্যামল চিঠিটা। যাতে কখনই হারিয়ে না যায়।

মণি সেন এক নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হয়ে যখন জেলগেট থেকে ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন তখন এক নম্বরে একদিকে আনন্দ অন্যদিকে দুশ্চিন্তা। দেশের প্রকৃত অবস্থার বা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে গোটা হলে বিষাদের ছাপ। সকলে ঐক্যমত হয়ে জেলকমিটির নতুন আহ্বায়ক নির্বাচিত করেছিলেন মণি সেনকে। মণি সেন দু-চারদিনের মধ্যে বুঝে নিলেন ভিতরের পরিস্থিতি।

আহ্বায়ক জেল কমিটির কর্মসূচী জানিয়ে দিলেন রাতের হাউসে। ঘোষণা করা হল—"আজ একটা নাটক করা হবে।" নাটকের সবাই পাত্র, কেউ পাত্রী নেই, কাহিনী প্রস্তুত। এরপর ঘোষণা হবে ননীগোপাল দত্ত সম্পর্কে জেলকমিটির সিদ্ধান্ত। ননীগোপাল দত্ত একজন তাত্ত্বিক। কিন্তু পুলিশের চোখ বা জেলখানার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শোনা গেল উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে পুলিশের কাছে মাপ চেয়ে বসেছেন। দৈনিক মুখপত্র 'সান্ধ্যদৈনিক' থেকে বাইরে গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করে শোনানো হবে। সারা রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাসের প্রকৃত চেহারা সকলকে বোঝানো হবে।

'সান্ধ্যদৈনিক' থেকে বাইরের শ্রমিক কৃষককুল কি প্রচণ্ড সংগ্রাম করছেন, অত্যাচার প্রতিরোধ করছেন সংগ্রামের উজ্জ্বল দিক শুনে মন সবাইয়ের ভরে ওঠে খুশীতে। আবার হত্যার রাজনীতি কি প্রচণ্ডগতিতে বেড়েছে তা প্রতিদিনের সংবাদপত্রে চোখ বোলালেই ধরা পড়ে। প্রতিদিনই খুন সংবাদপত্রের পাতায় গণহত্যার সংবাদ। একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা নির্মম কাহিনী। গঙ্গার জলে বিসর্জিত লাশ, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা লাশ

রেল লাইনের ওভারব্রীজের তলায় পড়ে থাকা লাশ, রেল লাইনের ধারে, জঙ্গলে, খেতের মধ্যে পড়ে ওয়ারিশ বেওয়ারিশ লাশ। সকালে যে মানুষ বাজার করার ব্যাগ স্ত্রীর হাত থেকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছিল এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরার পথে সেও হয়ে গেল লাশ। উকিল বের হচ্ছিলেন কোর্টের উদ্দেশ্যে, কোর্টে পৌঁছানোর আগেই তিনি হয়ে গেলেন লাশ, পুলিশ কনষ্টেবল স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রাফিকের ডিউটি করে আর ঘরে না ফিরে লাশ হয়ে গেলেন। মাস্টার-মশাই পড়াচ্ছিলেন ক্লাশে। পড়ানো শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে লাশ হয়ে গেলেন। জজ সাহেব কোর্টে যাবার জন্য প্রস্তুত। কোর্ট বারান্দায় পৌঁছানোর পূর্বেই লাশ হয়ে গেলেন। কৃষক সংগঠনের নেতা সভা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মাঠে লাশ হয়ে পড়ে রইলেন। সমাজের কেউই বাদ যাচ্ছেন না। বেকার যুবক প্রাইভেট টিউশানী করে রাত আটটায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল। মা বলে দিয়েছিলেন—খোকা, সময় খুব খারাপ। সকাল সকাল বাড়ি ফিরিস। বাড়ি ফেরা খোকার আর হল না। রাস্তার ওপর পাইপগানের গুলীর আঘাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাশ হয়ে পড়ে রইলো। ভয়ে কেউ তাকে তুলে মায়ের কাছে দিতে সাহস করছে না। পাছে সেও লাশ হয়ে যায়। এতো রক্ত এক জায়গায় করা সম্ভব হলে রক্ত দিয়েই একটা নদী তৈরী হয়ে যেতো। দু'দিনের ব্যবধানে শতাধিক মানুষ খুন হয়েছে। রাজ্যের মুখমন্ত্রী ইন্দ্র প্রস্থে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন—এসব হত্যাকাণ্ডের কোন তদন্ত করা হবে না। রাজ্যের জনগণ তদন্ত চায় না। তদন্ত-চায় শুধু একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল।

কারাগারে বন্দীরা এ-সংবাদে ভয়ানক চঞ্চল। কিন্তু হাত-পা যে কঠিন রজ্জুতে বাঁধা। সভার অনুরোধে সুখেন্দু তার স্বরচিত কবিতা 'চ্যালেঞ্জ, এ ওপেন্ চ্যালেঞ্জ' পাঠ করে শোনাল। বেঁটে খাটো সুখেন্দুর নম্র অথচ বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠের আওয়াজ রাত্রিবেলার এক নম্বরের বিশাল কংক্রিটের দেওয়ালগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে অসহায় বন্দীদের আরও চঞ্চল করে তোলে। নিস্তব্ধ ওয়ার্ডে শতাধিক বন্দী একনিবিষ্ট মনে শুনছে সঞ্জয়ের কণ্ঠে প্রাণমাতানো উদাত্ত সেই গান—"মাটি কান্দেরে, কান্দে আমার প্রিয়া, আমার রোয়া ধান রে ভাই জোদ্দার নিল কাইড়্যা।" খানিক দূরে সেদিনের পুলিশের অত্যাচারে আহত সুরেশ শুনছিল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, গানের প্রতিটি কথা। কি তার প্রচণ্ড আবেগ। গান শেষ হলে লাফিয়ে উঠে সে অনুরোধ জানায় সঞ্জয়দা আরেকটা হক।

উঠলেন মণি সেন। জেলকমিটির সিদ্ধান্ত মতো ননীগোপাল দত্তের রিলিজ

অর্ডার এই জেলে এলে তাকে এই ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হবে না। নিয়ম অনুযায়ী তাকে এই জেলে ওরা একবার পাঠাবে তারপর এখান থেকে রিলিজড্ হবে।

ননীগোপাল শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। মোটামুটি ভালো চাকুরে। অফিস কলকাতায়। শহরে নিজেদের বাড়ি আছে। দীর্ঘকাল গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শেষ পর্যন্ত জেলখানায় পা সরে গেল। লাইনচ্যুত হয়ে গেলেন। এটাও যে পরীক্ষিত হওয়ার জায়গা তা তো তাঁর জানা ছিল। তবু বিচ্যুতি কেন ঘটলো তাতো বোঝা দরকার —কথাটা উঠলো সভা থেকে।

মণি সেন উত্তর দিলেন—তাঁর বাড়ির লোকজন পুলিশের হেড কোয়ার্টারে যাতায়াত করছিলেন এ-সংবাদ আমাদের কারুর কারুর জানা ছিল। ওঁর মধ্যেও পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কেমন যেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন।

আজকের সভার সভাপতি সুখেন্দু দাঁড়িয়ে উঠে বলে—কনভেনর কমিটির সিদ্ধান্ত জানালেন। এ-নিয়ে আর কোন আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা এখন অন্য প্রসঙ্গে যাবো।

—কিন্তু ননীগোপালবাবুকে আমবা যে সবাই ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম। কথাগুলো ভীড়ের মধ্যে একজন বলে উঠলো।

কাজল দাঁড়িয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ। নিজের বক্তব্য বলার অভিপ্রায় জানিয়ে বলল—বলশেভিক শৃঙ্খলা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হক। তাত্ত্বিক বা সাংগঠনিক তিনি যে ধরনেরই নেতাই হ'ন না কেন তাঁকে শৃঙ্খলা অন্যান্যদের মতোই মেনে চলতে হবে।

সুখেন্দু আলোচনার যবনিকাপাত কবে বলে—আপনারা জেলকমিটির সিদ্ধান্তের মর্মার্থ নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন। তারজন্য সকলকে ধন্যবাদ, আমার নিজের মনে হয় তিনি এই জেল থেকে মুক্তি না নিয়ে অন্যত্র থেকে মুক্তি নেবেন। সে যাই হোক। এখন সভার একটা দিক সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। এবার সবাই অভিনয় দেখবেন। ঠিকঠাক হয়ে বসুন।

"নাটকের শুরু। বিকালে প্রস্তুত করা প্লট সন্ধ্যায় অভিনীত হচ্ছে। ভারী আকর্ষণীর ব্যাপার। প্রথমে নবীন যুবক বীরেন সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এল মঞ্চে। মঞ্চ বলতে ঘরের মেঝের ওপর ফাঁকা করে নেওয়া একটা অংশ। শুরু হল বীরেনের উদাত্তকণ্ঠের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা—দেশটা হচ্ছে ভারতবর্ষ, সালটা হচ্ছে বাঁহাত্তর।"...

বাঃ, বাঃ, চমৎকার গান। সঙ্গীত শেষে সবাই প্রাণপণে হাততালি দিয়ে উঠল।

এবার অভিনয় শুরুর পালা। পুলিশের দারোগার হাতে তুলে দেবার জন্য জোগাড় করা হয়েছে মোটালাঠি। গোলগাল মুখ দারোগাবাবুর। বিরাট দশাসই চেহারা। মেদবহুল চেহারা কিন্তু আঁটোসাটো ভাব, চোখেমুখে রুক্ষ। বর্বরতার ছাপ, ভাগচাষী বুদিন টুডু। তাকে কায়দায় ফেলে থানায় ডেকে এনে হাজতে পুরে দেওয়া হয়েছে। মিশকালো গায়ের রঙ হাজতের অন্ধকারে গেছে মিশে পরনের কাপড়টা ময়লা। কতদিন জলকাচা হয়নি। মাঠ থেকে ছুটে এসেছিল। এখনও তাই গায়ে কাদার ছাপ। চোখের কোণে কালি। জোতদার তিনকড়ি মুখুজ্জে ও তার ছেলে বিমান। বিমানের চেহারায় কেমন যেন বেপরোয়া ভাব। এক মাথা চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। কানের দুপাশে জুলপী নেমেছে। শ'দুই বিঘে জমির মালিক। বাপের এক ছেলে। জামায় নানা রঙের ছাপ ছোপ, প্যান্টের সর্বনিম্ন ভাগের ঘের দিয়ে তিনটে বড় বড় বোতল গলে যাবে। নাকি ল' পাশ করেছে। তবে ওকেনাকি পরীক্ষায় বসতে হয়নি। তাইতেই ওঁর গর্বে বুক ফুলে দশহাত।

তিনকড়ি মুখুজ্জের কাছে অভাবের সময় টাকা ধার নেয়নি, গ্রামে এমন কাউকে পাবেন না। সবাই 'দাঠাকুর' বলে। টাকা ধার যখন কাউকে দেবে তখন ভারী হিসেব করে দেয়। ধার নিয়ে লোকটা ভোগাবে কিনা। যারা হিসেব করতে জানে না, দয়ালু তিনকড়ি মুখুজ্জে তাদের হিসেব করতে সাহায্য করতে সবদাই এগিয়ে আসেন।

মহাজন তিনকড়ি ভট্টচাজ কর্জকারীদের কাছে বড় দয়ালু লোক। কখনও খালি হাতে গাঁয়ের কর্জকারী ফেরৎ যায় না। সুদ একটু বেশী। আসলের ওপর চল্লিশ ভাগ। তাতে কি হল? চাইলে অভাবের সময় আর তো কেউ এগিয়ে আসে না। শর্তটা একটু অবশ্য কঠোর। অভাবের তাড়নায় বন্ধকী রেজিষ্ট্রি হয় না বলে সাফ কোবলা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে জমি ফেরৎ হবে যদি সুদ আসল সব শোধ হয়। এক একজনের হিসেব কিছুতেই মেলে না। কিছুতেই সুদ পরিশোধ হয় না। আসলে পৌছানো তো স্বপ্নের ব্যাপার। আনরেজিষ্টার্ড দলিল কেউ করে কেউ করে না। ঠিক দিনের দিন মেটাতে না পারার জন্য জমি খণ্ডটি তিনকড়িবাবুর হয়ে গেল। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সুখেশান্তিতে সেইজমি তিনকড়ি ভোগদখল করবে। ভট্টচাজ জীবনের শুরুতে একটা তিনকুড়োর মালিক

ছিল। আর ঐ জমিটার ভাগচাষী ছিল বুধন টুডুর বাবা। এখন সেই তিনকড়ি অন্ততঃ তিনশ বিঘে জমির মালিক আর বুধন সেই পুরোনো তিনকুড়োটার ওপর ভাগচাষের অধিকার বজায় রাখতে লড়ে যাচ্ছে। এইভাবে ওয়ার্ডের থামের আড়াল থেকে 'সূত্রধর' কর্তৃক নাটকের ভূমিকা শোনানো শেষ হল।

থানার ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকের একটা গলিমতো জায়গা। সেটাই হাজত। ভিতরে বুধন চুপচাপ একভাবে বসে আছে পা ছড়িয়ে দিয়ে। লোহার গেট খুলে গেল। তালা হাতে একজন কনষ্টেবল। আর একজন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে হাজতে ঢুকলো থানার মেজ দারোগা। তার হাতে মোটা লাঠি। বুধনকে জেরা করছে—আর মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে। কখনও বা মিষ্টি স্বর কথা হচ্ছিল—"সত্যি কথা বল্ বুধন। সত্যি বললে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনকড়ি বাবুর তিনকুড়োর ধান তুই কাল রাতে জোর করে কেটে নিয়ে গেছিস্।"

বুধনের সাফ জবাব—না, ঐ তিনকুড়ো জমিটা আমি ভাগে করি। আমার বাবা ভাগে করতো। বাবার সময় থেকেই বাবার সঙ্গে আমিও রোয়া, কাটা, ঝাড়াই-মাড়াই-এর কাজ করতাম।

—তিনকড়িবাবু মিথ্যা কথা বলেন না। তুই ধান চুরি করেছিস বলে থানায় তিনি বলে গেছেন।

—উঁনার কথাই সত্যি হল? তাহলে আমার কথা কে শুনবে? এবার চাষ আমি নিজেই দিয়েছি। জমি রুয়েছি।

দারোগা বলে—আমি তোর কাছ থেকে আসল কথা শুনতে চাই। একজন কনষ্টেবলকে হুকুম করে—এ্যাই হতভাগা, শালাকে অফিসে নিয়ে আয়। মেজ দারোগা গিয়ে বসলো নিজের চেয়ারে। বুধনকে দুজন কনষ্টেবল দুপাশে গার্ড দিয়ে দারোগার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো।

—বুধন, তিনকুড়োটা ছেড়ে দেবার জন্যে তিনকড়িবাবু তোকে একবার বলেছিলেন?

—না। কোনোদিন ছেড়ে দেবার কথা ওঠেনি। তাছাড়া ছেড়ে দিতে বল্লেই হল।

—জমিতে কত ফসল হয়?

—আজ্ঞে, বিঘে করা সাত আট মণ। সেচের জল পাইনি কখনও বাবু। তাহলে আরও অনেক বেশী ধান ফলতো বাবু।

—প্রতিবার তিনকড়িবাবুকে তাঁর ভাগ দিয়ে দিস্।

—নিশ্চয়ই।

—রসিদ আছে ?

—রসিদ উনি কখনও দেন না। গতবছর রসিদ চাইতে গেছলাম। তারপর থেকেই উনি আমাকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিচ্ছেন।

—চাষ করার খরচ কে দেয় ? মুনিষ লাগাস্‌তো।

—আজ্ঞে না। আমি, আমার তিনছেলে আর বউ নিজেরাই মুনিষ। সার বীজ ওষুধের খরচ আধাআধি হতো। গত বছর থেকে আমার ঘাড়ে সবটাই চেপেছে। উনি দেন না এক পয়সাও।

মেজ দারোগার সঙ্গে বুধনের কথা চলার মাঝে বড দারোগা ঢুকল গম্ভীর মুখে। বুধনের সঙ্গে মেজবাবুর কথা হচ্ছে দেখে উনি চটে লাল। উত্তেজিতভাবে বলে—কি মেজবাবু, বুধনের সঙ্গে আবার কথা কি ? ওকে হাজতে পুরে দিন। মেজবাবু ধীরভাবে বড দারোগার মুখোমুখি হয়ে উত্তর দেয়—স্যর, বুধনের স্টেটমেণ্ট নোট করা দরকার।

বড়বাবু বলে—আপনি আই. ও. যা ভালো মনে করেন করুন। তবে ও তো পাকা চোর। রাতের অন্ধকারে তিনকড়িবাবুর তিনকুডোর ধান কেটে নিয়ে গেছে। বুধন আর চুপ থাকতে না পেরে উত্তর করে বসে—না, আমি চোর নই। আমি ঐ জমির ভাগচাষী।

কথাটা শুনেই বডবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলে—চোপ শালা, শুয়োরের বাচ্চা। মেরে ফেলবো তোকে। তারপর মুখ ভেংচে বলে—উঁ, আমি ভাগচাষী। আবার ততক্ষণে চেয়ারে বসে পড়েছে। চেয়ারে বসে বসেই আপন মুখেই গজরাতে লাগল—শালা, ছোটলোক-গুলো মাথায় উঠে পড়ছে। থানা পুলিশকে ভয় খায় না। মুখের ওপর উত্তর। তারপর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল বড়বাবু। কি হল হঠাৎ মোটা রুল দিয়ে বুধনের মাথায় সজোরে নিজেই মেরে বসে। যন্ত্রণাকাতর মুখে বুধন চীৎকার করে ওঠে। দারোগাও চীৎকার করে বলে—শালা, তোর ভাগচাষ করার চোদ্দপুরুষের সাধ এবার মিটিয়ে দেবো। থানাতেই তোকে খুন করা হবে—বলেই রুল দিয়ে বুধনকে নিজের হাতেই বেপরোয়া পেটাতে লাগল। বুধন ভয়ানক রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। বড দারোগা কনষ্টেবল দুজনকে ভয়ানক ক্রুর মুখে আদেশ করলেন—যা এবার ব্যাটাকে চ্যাংদোলা করে হাজতে ফেলে রেখে দে। জ্ঞান ফিরে এলে বলবি। আবার পেটাই হবে। আদেশমতো

কনষ্টেবল তুজন জ্ঞানহারা আদিবাসী যুবকের শরীরটা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজতে ফেলে দিয়ে ফের তালা লাগিয়ে দিল।

থানার কাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেল। বুধনের অচৈতন্য দেহটাকে যখন টেনে হিঁচডে হাজতের মধ্যে পোরা হচ্ছিল কেবল সেই মুহূর্তে মেজবাবু একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছিল। বাকী সময় কোন কথা সরেনি।

বন্য হিংস্র পশুর মতো মুখখানা করে বড দারোগা একবার নিজের চেয়ারে বসে আর একবার পরক্ষণেই চেয়ার ছেডে উঠে ঘরময় পায়চারী করে যায়। পকেট থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করে তার থেকে একটা সিগারেট নিয়ে দেশলাইয়ে বার কয়েক সিগারেটটা ঠুকে অগ্নিসংযোগ করে টান দিতে থাকে আর আপনমনে ধোঁয়া ছাডতে থাকে। ধোঁয়া মাঝে মাঝে রিং হয়ে উঠে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে আর একদৃষ্টে তার দিকে দারোগা তাকিয়ে থাকে। সিগারেটে তু চারটে টান দিয়েই বেশী অংশ বাকী থাকা সত্ত্বেও সেটা মাটিতে ফেলে বুট দিযে চেপে ধরে দাঁত তুপাটি চেপে মেজ দারোগার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে—কি মেজবাবু, আপনি কিছু বলছেন না যে, কি খুব অন্যায় কাজ করে ফেললাম নাকি?

মেজবাবু ডাযেরী লিখছিল। মাথা পূর্ববৎ নিচু করেই কলম বন্ধ না করেই জবাব করে—না স্যর কোন অন্যায় করেননি। তবে বুধনের যা অবস্থা তাতে ওকে হাজত থেকে তাডাতাডি হয় কোর্টে পাঠানো দরকার। তবে তার আগে ডাক্তারবাবুকে ডাকলে মনে হয় ভালো হবে। ওর তো মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে মনে হল। হাসপাতালে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। মেজবাবুর কথায় খানিক সব চুপচাপ। বড দারোগাও নীরব। কয়েক মুহূর্ত পরে নীরবতা ভেঙ্গে বডবাবু গম্ভীর স্বরে সেন্ট্রিকে ডাক পাডে—সেন্ট্রি। একজন সেন্ট্রি সঙ্গে সঙ্গে সেলাম করে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বডবাবু তার হাতে একটা ফাইল তুলে দিয়ে বলে—এটা মেজবাবুর টেবিলে দিয়ে আয়। মেজবাবু ফাইলটা খুলে ভিতরে দেখে বড়বাবু অর্ডার দিয়েছে—বুধন টুডুর কেশের আই. ও. এখন বড়বাবু স্বয়ং। মেজবাবুর কিছু আর করণীয় নেই। ঐ সংক্রান্ত ফাইলটা এই মুহূর্তে ও. সি.-র টেবিলে পাঠানো হ'ক। মেজবাবু সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে একটা ফাইল টেনে বডবাবুকে দেবার জন্য কনষ্টেবলটির হাতে তুলে দিয়ে বড়বাবুর উদ্দেশ্যে বলে—তাহলে স্যর, এ নিয়ে আমাকে আর কোন কিছু করতে হচ্ছে না। বেশ ভালোই হল।

একটু ধমক দেওয়ার মতো সুরে, বড় দারোগা বলল—মেজবাবু, চাকরী করছেন পুলিশের। মায়া মমতা দেখাবার এটা ক্ষেত্র নয়। তাহলে এ চাকরী ছেড়ে হয় স্কুলে মাস্টারী করুন আর না হয় আশ্রম তৈরী করে বসুন। এ রাজত্বে প্রমোশন পেতে হলে এই ঠিক ট্রিটমেণ্ট।

কলমটা বন্ধ করে মেজবাবু বলল—আমার স্যর প্রমোশনের দরকার নেই।

বড়বাবুর সুরের আবার পরিবর্তন ঘটলো। "মেজবাবু, শুনেছি আপনার মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। ভালো পাত্র পেতে হলে টাকা খরচও হবে বেশ ভালো রকম। সে টাকা আসবে কোত্থেকে। কামনা করে চলুন তিনকড়ি ভট্টচাজেরা যেন সর্বদা আমাদের পাশে পাশে থাকে।" তারপর চুপিচুপি বলল—আর বুধনের ব্যাপারে সে যা দেবে তার ভাগ আপনিও পাবেন। বুঝলেন।

—আমার মেয়ের বিয়ে এখনও ঠিক হয়নি। তাছাড়া আমার স্ত্রীর ইচ্ছা মেয়ের বিয়েতে বাজে খরচ যেন একেবারে না হয়। দরকার হলে কোন ধূমধামও করা হবে না। আর তিনকড়িবাবুর দেওয়া টাকার ভাগ আমি নিতে চাই না।

—আপনার মেয়ে দেখুন হয়তো নিজের মনোমত পাত্র আগেই স্থির করে রেখেছে। রাগে মেজবাবুর রক্তশিরাগুলো ফুলে লাল হয়ে উঠলো। এবার বেশ মেজাজ নিয়েই বড়বাবুর মুখের ওপর বলে—স্যার, ভুলে যাচ্ছেন আপনি একজন ও. সি.।

—হ্যাঁ, আমি খুব ভালোভাবেই তা জানি।

—তাহলেও ওসব কথা আপনার মুখ দিয়ে বার হওয়া সাজে না। যেন লাফিয়ে উঠল বড দারোগা। চোখগুলো বড় বড করে আর মুখ বিকৃত করে বলল—দেখছি, আপনার পক্ষে এ থানায় চাকরী করা সাজে না। তাছাড়া পুলিশের চাকরী আপনাদের মতো লোকেদের জন্য নয়।

—চাকরী যাবার ভয় আমি করি না। মেজবাবুর চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠলো। যোগ্যতার ছাপ থাকা সত্বেও অনেক যুবকইতো একটা চাকরীর জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেডাচ্ছে। আমি শেষ পর্যন্ত না হয় তাদের দলেরই একজন হবো।

বড়বাবু হুমকী আর ভয় যুগপৎ দুটি তীর নিক্ষেপ করে বসলেন।

—আপনি নিশ্চয়ই কম্যুনিষ্ট। পুলিশের মধ্যে যারা গোপনে কম্যুনিষ্টদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, জানেন তাদের কি পরিণাম হচ্ছে।

—মিথ্যা কথা, আমি আদৌ তাদের কেউ নেই। তবে ওপরওলাকে খুশী

রাখতে না পারার অপরাধে শুনেছি অনেককে কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়ে গোপনে খুন করা হচ্ছে।

—মেজবাবু, আপনি বামপন্থীদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা দেখান।

উত্তেজিত মেজবাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন। জোরের সঙ্গে তিনি বলেন—সামান্য মাহিনার চাকরী করি। চাকরী গেলে গতর খাটিয়ে খেতে পারি। রাজনীতি করা আমার পেশা নয়।

—চেঁচিয়ে বাজিমাৎ করার চেষ্টা ত্যাগ করুন মেজবাবু। আপনাকে আমি খুব ভালোভাবেই জানি। বডবাবু কোমরের খাপ থেকে রিভলবারটা বের করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন। মেজবাবুও ততক্ষণে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের রিভলবারটা বার করে ফেলেছেন। উত্তেজনায় সমগ্র থানা বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। সেপাইরা ঘর থেকে ততক্ষণে সকলেই বেরিয়ে গেছেন। হাজতে নিরুপায় বন্দী বুধন টুডু অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিত।

উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে থানায় প্রবেশ তিন কডি ভট্টচাজের। হতভম্ব হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধপ করে বসে পডে মেঝেতে। তারপর আস্তে আস্তে চেয়ারের হাতল ধরে উঠে বসলো একটা চেয়ারে। গোল গোল চোখে বডবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে—স্যর, আমি কি একটু পরে আসবো।

বডবাবু মেজবাবু দুজনেই ততক্ষণে নিজেদের সামলে নিয়েছেন। বডবাবু বলে—পরে আব কখন আসবেন? বসুন। তিনকডি বসে বসে একটা মোটা বিডিতে অগ্নি সংযোগ করল।

বডবাবু বলে—আপনি যা যা ঘটেছে বলে যান। অগে শুনে নি। তারপর সাজিয়ে নেবো।

তিনকড়ি গোটা ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খুব নীচুস্বরে বড়বাবুকে বলল—মেজবাবু।

বড়বাবু গুরু-গম্ভীর গলায় বলে—জানবেন, আপনি থানার ও. সি.-র সঙ্গে কথা বলছেন।

এবার সাহস পেয়ে তিনকড়ি ভট্টাচাজ দারোগার সামনে গল্প ফাঁদতে বসে। বুধন, বুধনের বউ, ছেলে সঙ্গে দুজন কিষাণ নিয়ে ভোরবেলা বেরিয়েছিল তিন-কুড়োটার পাকা ধান কাটতে। একসঙ্গে চলছিল ধানকাটা আর আঁটি বাঁধার কাজ। তারপর তডপা বেঁধে বুধন আর তার ছেলে মাথায় করে ঘরের উঠোনে নিয়ে গিয়ে ফেলছিল। ওদের মুখ থেকে সব সময় কিসের একটা আওয়াজ বের

হচ্ছিল। তবে সাঁওতালি ভাষায় বলে তা বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রতিদিন ভোরের শেষে তিনকড়িবাবুর মস্তান ছেলে বিমান তিনকুড়োটা দেখে যেতো ভালোভাবে। এদিন স্বচক্ষে দেখলো তিনকুড়োর ধান কাটছে আর মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বুধন আর তার ছেলে বউ। ছুটলো বাড়িতে বাবাকে বলতে। দৌড়তে গিয়ে রাস্তায় দুবার হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ গেল উড়ে। ধুলোমাখা দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বাবাকে গিয়ে বলল—বাবা, তিনকুড়ো শেষ।

ঘরের চৌকিতে বসে ফতুয়া পরিহিত তিনকড়ি লাফিয়ে ওঠে—সে কি, তিন কুড়ো শেষ। তার মানে? সব খুলে বল্। তিনকুড়ো শেষ....

—হ্যাঁ, তিনকুড়োর সব ধান এতক্ষণ ঝাড়াই-মাড়াই হয়তো হয়ে গেল।

—তুই নিজের চোখে সব দেখেছিস্।

—হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। ওরা বাপ বেটা বউ সবাই মিলে ধানের গোড়ায় কাস্তে চালাচ্ছে। আঁটি বাঁধছে, তারপর তড়পা করে মাথায় নিয়ে পালাচ্ছে।

—ঠিক আছে, আমার লোকজনকে খবরদে, সবাই লাঠি নিয়ে যেন মাঠে যায়। মাঠ থেকে ওদের মেরে তাড়াতে হবে। খুনখারাপি করতে আমার লেঠেলরা সবসময়ই তৈরী। শুধু খবর দিলেই হল। পুলিশকেও খবর দিতে হবে। দ্যাখ না, ধানচুরি করার মজাটা এবার টের পাবে। আচ্ছা তুই লেঠেলদের জোগাড় করে বরং মাঠের দিকে যা, আমি থানায় বড়বাবুর কাছে যাচ্ছি। তুই তাড়াতাড়ি ছোট্। আমি চল্লাম।

বড় দারোগার মুখোমুখি বসে তিনকড়ি ভট্টচাজ গল্প শেষ করে বলে—স্যার, এইতো শুনলেন। আমি জে. এল. আর. ও.-কে দরখাস্ত দিয়েছি, তাঁর কাছে নালিশ জানিয়ে বলেছি—বিচার চাই, বুধন কেন তার চোদ্দ পুরুষের কেউ কখনও আমাদের জমি ভাগে চাষ করতো না। সবশুনে জে. এল. আর. ও, আর তার বড়বাবু সন্তুষ্ট।

বড় দারোগা বলে—বুধনের বাড়ি থেকে সব ধান তুলে আনার ব্যবস্থা করছি। তিনকড়ি আমতা আমতা করে বলল—আমার ঘরে ঐ ধান রেখে এলে হত না। নেতিবাচকভঙ্গীতে বড় দারোগা বলে—তা হয় না। তবে এস. ডি. ও.-কে বলে আপনাকেই ঐ ধানের জিম্মাদার করে দেওয়া যায়। যাক সে-সব দেখা যাবে। তবে বুধনের পশ্চাতে এমন সব সেকশান জুড়ে দিচ্ছি, যাতে বাছাধন সহজে

আর জামীন পেতে না পারে। হ্যাঁ মশাই, সাক্ষী সাবুদ সব যেন ঠিক থাকে। ঐ তিনকুড়োর চারদিকে যেসব খেত আছে তার মালিকদের সাক্ষী করবেন। তারা যদি যা যা বলে দেব তা ঠিক ঠিক বলতে পারে, ওর নির্ঘাত সাজা হয়ে যাবে। ওদের আমার কাছে পাঠাবেন, আমি তাদের ঠিক প্রয়োজন মতো ট্রেনিং দিয়ে নেবো। আর, হ্যাঁ শুনুন, আমার জন্যে...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে, বড়বাবু আর মেজবাবু আপনাদের দুজনেরই কাল আমার বাড়িতে রাত্রে নেমতন্ন।

হাসতে হাসতে বড়বাবু বল্লেন—কি মুরগীর মাংস?

—মুরগীর মাংস আর মিষ্টি।

—বোতল?

—ঠিক আছে। আমি তো রোজ খাই না। তবে পাবেন নিশ্চয়ই। মেজবাবু ঘরেতে না থাকায় তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। বুধনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ৪৪৭, ৩৭৯, ৩২৩ এবং ৩০৭ ধারায় আসামী করে চালান হয়ে গেল।

এবার শুরু বুধন টুডুর পক্ষে ক্ষেতমজুর ভাগচাষীদের লড়াই। বুধনের জামীন হবে যেদিন সেদিন আদালতে ছুটলো যতো আদিবাসী। মুড়ো, বাউরী, মুচি, বাগ্দী, পণ্ডিত সবাই। জেল গেট থেকে বুধন বেরিয়েই দেখে তাঁর গাঁয়ের কৃষক সমিতির লোকজন। সামনের চত্বরটা ভর্তি। এভাবেই নাটকের একটা অঙ্ক শেষ হল।

অভিনয়ে এবার নতুন দৃশ্যের সংযোজন। জোতদার তিনকড়ি ভট্টচাজ ভরদুপুরে গভীর নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ কানে আওয়াজ এলো কারা যেন বাড়ীর সদরে জমায়েত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে—বুধন টুডুর রোয়া ধান ফেরৎ চাই, বুধন টুডুর কাটা ধান ফেরৎ চাই। ভাগচাষ অধিকার রক্ষার লড়াই চলছে, চলবে।

শুয়ে থাকতে আর না পেরে ওপরতলা থেকে নেমে এলো তিনকড়ি। সদর দরজা খুলে বিশাল জমায়েত দেখে মুখ শুকিয়ে কাঠ। তিনকড়িকে দেখেই এক জোয়ান আদিবাসী লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলল—বুধনের রক্ত জলকরা ধান সব ফেরৎ চাই।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে এসব শোনা অসম্ভব ভেবে তিনকড়িও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—না, এ জমি আমার, ও তিনকুড়ো আমি চষেছি। তিনকুড়োর ধান আমার। ভীড়ের মধ্যে আবার চীৎকার করে উঠলো—মিথ্যাকথা, বুধন রেকর্ডকরা ভাগচাষী। আমি আপনার তিনকুড়োর গায়ে আমার ভাগচাষের রেকর্ড করা জমি দশ বছর ধরে

চাষ করছি। ওর জমির এক ছটাক ধানও আপনি পাবেন না। মামলার খরচ ওর কদিনের থানা হাজতে, জেলহাজতে থাকার সময়ের মজুরী, চিকিৎসার খরচ সব মিটিয়ে দিলে ধানের অর্ধেক পেতে পারেন।

তার সঙ্গে আরেকজন যোগ করল—মামলা যা করেছেন তা তুলে নিতে হবে। একজন বুধনকে ভীড়ের মধ্যে থেকে ঠেলে তিনকড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলল। তিনকড়ির সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুধন বলে—থানা পুলিশ আপনাকে বরাবর রক্ষা করবেতো? আমার ওপর অত্যাচার হলো, তিনকুড়ো জমির কাটা ধান সব লুঠ করা হলো, এবার বুঝি বড়বাবু এসে আপনার বাড়ি পাহারা দিতে আসবে?

কয়েকঘণ্টা বাড়ির সামনে দাবী আর পাল্টাদাবীর শেষে বুধনের পক্ষের কিছুটা জয় হল। কাটা ধানের অর্ধেক ফেরৎ হবে আর ফৌজদারী মামলাটা উঠে যাবে। মামলার খরচ আর ক্ষতিপূরণের দাবী নিয়ে স্থির হলো আরও আলোচনা হবে।

জোতদারের বাড়ির সম্মুখে অবস্থান শেষ, বিজয় মিছিল পতাকা উড়িয়ে চললো পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে, শেষ হল বুধনের ঘরের উঠোনে।

অভিনয় শেষ। এই টুকুই প্লট। ওয়ার্ডের বিশাল মোটা থামটার পাশ থেকে তিনজন বন্দী গান ধরেছে কোরাসকণ্ঠে—

"পথে আজ নামতে হবে, এপথও জানতে হবে,
বাধা আজ ভাঙতে হবে, দুহাত ঐ শক্ত করে।
এপথে কখনও আলোর বন্যা,
কখনও ঝরে কার অশ্রুপান্না—
এ পথ নিশানা জীবনেরও গানে,
পথচলার ডাক ঘরে ঘরে।"

এবার গান শেষ। উঠলো তীব্র করতালির আওয়াজ। গোটা বন্দীশালায় শিহরণের ঢেউ। স্ক্রীপ্টহীন, পূর্বপ্রস্তুতিশূন্য কারাগারের মধ্যে এমন নাটকের অভিনয়ে সবাই কেমন যেন পুলকিত। সহর্ষমুখে শুরু হল বাক্যালাপ, গল্পের অবতারণা। 'রিলিজ' 'রিলিজ' চিন্তা সবসময়, তার থেকে এখন কিছুটা বিরতি।

"ওঃ, এ-যেন জেলের মধ্যে জেল। শৃঙ্খলার নামে নতুন করে শৃঙ্খলিত করা! কেবল মিটিং আর আলোচনা। এসবতো মুক্তি পেলে হবে, এখন কেন? এখানে কেন? এখানে শুধু ভালো লাগে ভাবতে বাড়ির কথা, সংসারের সুখ-দুঃখের স্মৃতি, প্রেয়সীর মুখ। রাত্রে মশার কামড়। গরমের দিনেও আগাপাস্তলা শোবার সময় ঢাকা দিয়ে শুতে হচ্ছে। একদম ঘুম হচ্ছে না। জানলা দিয়ে রাতের

আকাশে তারা গুণতে গুণতে আর জ্যোৎস্নার ঢেউ দেখতে দেখতে রাত শেষ
আচ্ছা, পরিতোষ পালধি হঠাৎ কোন্‌দিন একফাঁকে রিলিজ হয়ে গেল কি করে
পরিতোষও তো 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতো, 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদে'র জয়ধ্ব
দিত, সে কিভাবে মুক্তি পেল! হাইকোর্ট থেকে তো মুক্তি পায়নি। কে
একদিন জেল অফিসে গিয়ে দেখেছিল পরিতোষ-এর সঙ্গে একজন ডি. আই.
অফিসার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কথাবার্তা বলছে। পরিতোষ শ্লোগান দিত 'জোতদার
মুণ্ডুকাটা চলছে, চলবে' 'শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, চলবে।' সে কি তবে মুচলে
দিয়ে বেরিয়ে গেল? আমরা যারা একনম্বর ওয়ার্ডে আছি, আমরা তো এক
চিন্তার মধ্যেই আনতে পারি না। কথাগুলো বলেছিল পান্নালাল একদিন শ্যামলকে
যখন তাকে মধ্যরাত্রিতে পেয়েছিল একেবারে একা জাগা অবস্থায়। পান্না মধ্যবয়
যুবক। জেল-জীবনকে সে আলিঙ্গন করে নিতে পারছে না। দেখা দেয় মাঝে
মাঝে অস্থিরতা। শ্যামল তাকে বুঝিয়ে বলেছিল—"না, পান্নাবাবু, মার্কসবা
চিন্তাধারায় যারা বিশ্বাস করে তাদের অত্যন্ত সংযত হয়ে চলতে হয়। প্ররোচ
আসবে, সতর্ক আর শৃঙ্খলাপরায়ণ না হলে এতগুলো লোক নিয়ে একটা ওয়া
থাকবেন কি করে? একই ওয়ার্ডে থেকে একজন আর একজনকে এখানে সহযোদ্ধা
শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। যে কোন বাইরের জিনিস সকলে মিলে ভাগ ক
নিতে হবে, কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। জেল প্রশাসন যেন আমাদের ওয়ার্ডে
ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে। সরকার সারা রাজ্যজুড়ে আমাদের কাউকে রাজ
বন্দীর মর্যাদা দেয়নি। নানাপ্রকার সত্যমিথ্যা বানানো ফৌজদারী আদাল
বিচারযোগ্য অভিযোগ খাড়া করে আমাদের এতগুলো মানুষকে আটক রা
হয়েছে বিনাবিচারে।"

পান্নালাল আবারও বলে—"কিন্তু আমাদের এখানে পশুর মতো জীবন-যাপ
বাধ্য করানো হচ্ছে। যেখানে চল্লিশজন একসঙ্গে থাকতে পারে, সেখানে দেড়
মানুষকে থালা, বাটী, কম্বল না দিয়েই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।" শ্যামল উত্ত
বলল—তা হতে পারে। তবে আমরা এই ওয়ার্ডে যা ক্যাপাসিটি তার বেশী নি
নাও পারি। তাহলে আমাদের আর একটা পৃথক ওয়ার্ডের জন্য আন্দোলন কর
হবে। শুনছি বহুদিন পূর্বে নির্মিত বড় দুটো গোডাউনকে ওয়ার্ড করার কথ
জেলকর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করছে। ঘটনাটা তলিয়ে দেখতে হবে। জেলকমিটিতে
প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হবে।

পান্নালাল বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আগত বন্দীদের বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা

প্রসঙ্গ তুললে শ্যামল বলে—অন্য ওয়ার্ডের বন্দীদের সঙ্গে একনম্বর ওয়ার্ডের বন্দীদের জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই পৃথক হতে হবে। এই ওয়ার্ডে যারা বাস করে তা আসবে তাদের জীবনযাত্রা হবে বাহুল্য বর্জিত। অন্যান্য ওয়ার্ডের বন্দীদের কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয়। জেলকোড অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সকল শ্রেণীর বন্দীদের নিয়ে আন্দোলন করাই প্রকৃত উপায়। এতে অন্যান্যদের প্রতি প্রকাশ পাবে গভীর সহমর্মীতা। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন জেলকমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সবাই আওয়াজ তুলি—"জেলের সব বন্দীরা বাঁচার দাবীতে এক হও।" আমাদের ওয়ার্ডে যাওয়া আসা ব্যাপারটি জেলর, সুপার কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি—বা দেখছেন না, দেখবেন না। খাবার থালা, বাটী, কম্বল, সাবান, পেটভরা ভাত, অখাদ্য-কুখাদ্য বন্ধ এসবতো সব বন্দীরই দাবী। তাই একনম্বরের চাতালে আমরা বিভিন্ন মিটিংয়ে এতো বন্দীর সমাবেশ ঘটাতে পারি। সেটাও যাতে বন্ধ হয়, তারজন্য কর্তৃপক্ষ বড় জমাদারকে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, শুনলাম। রাতের আলাপ আপনা-আপনি শেষ হল যখন দুজনেই কম্বলে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে।

'হাউসে' দুপুরবেলায় ঘোষিত হ'ল—"আমাদের মধ্যে এক ম্যাজিসিয়ান শ্রীসুকুমার ঘোষ উপস্থিত হয়েছেন, যিনি প্রচুর এবং খুব ভালো ভালো ম্যাজিক দেখিয়ে আমাদের সকলকে প্রচুর আনন্দ দেবেন।" ঘোষণাটি যখন শেষ হল তখন দেখা গেল কাজল, সুখেন্দু, শ্যামল এদিকে-সেদিকে ঘোরাঘুরি করছে। কেউ সংগ্রহ করেছে তাস, কেউবা দড়ি, কারুর বা সংগ্রহ রুমাল। তারপব হাউসে দুপুরবেলা শুরু হ'ল সবাইকে ঘুমোতে না দিয়ে সুকুমারবাবুর ম্যাজিক দেখানোর পালা। একের পর এক হাত সাফাইয়ের খেলা আর ঘনঘন হাততালি। শেষে আবার ঘোষণা করা হ'ল—"কাল বিকালে আমাদের এই ওয়ার্ডের সামনের চাতালে আবার ম্যাজিক খেলা দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দেবেন সুকুমারবাবু। আর অন্যান্য ওয়ার্ডের বন্ধুরাও যদি কোনো উপায়ে একনম্বরে আসতে পারেন তাঁরাও উপভোগ করবেন খেলা।" ঘোষণাটি শেষ হ'ল—তারপর আবার প্রচুর করতালিধ্বনি। সবারই চোখেমুখে আনন্দের ঢেউ। অন্যান্য বিষণ্ণ দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ।

পরদিন বিকালে শুরু হ'ল সুকুমারবাবুর ম্যাজিক দেখানোর পালা। খবর পৌছেচে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। বিকাল তিনটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডগুলোর দরজার তালা খুলে গেল—আর সবাইয়ের দৌড় একনম্বরের দিকে। একে একে

রেলিং টপকে একনম্বরের চাতালে। একনম্বরে ঢোকার গেট যথারীতি তালাবন্ধ
রাতের রুটি বিকালেই যখন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বন্দীদের দেবার জন্য গেল তখন প্রা
কাউকেই পাওয়া গেল না। বড় জমাদার সবশুনে চিন্তিত। কি করে এ অবস্থা
মোকাবিলা করা যায়। তাড়াতাড়ি জেলরের কাছে গিয়ে বলল—জেলে ডিসিপ্লি
যে একেবারে থাকছে না। কম্যুনিষ্টরা জেলের মধ্যেও এমন সব কাণ্ড কারখা
করছে যে, ওরা যেন জেলের মধ্যে প্যারালাল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালু করে দিয়েছে
ওয়ার্ডে আসামীরা কেউ নেই যে খাবার ধরবে। সব একনম্বরে ম্যাজিক দেখছে।

জেলর পরামর্শ দিলেন—আপনি একনম্বরে গিয়ে শ্যামলবাবুদের বলুন, ম্যাজি
দেখানো বন্ধ করতে আর অন্য ওয়ার্ডের আসামীরা যেন এখুনি যে যার ওয়া
চলে যায়। 'এটা আমার আদেশ।'

বড় জমাদার ছুটে এলো এক নম্বরে। মানুষে ভর্তি চাতাল। শ্যামলবাবু
সঙ্গে দেখা করে কিছুটা অনুরোধের সুরে বলে—ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করু
শ্যামলবাবু, জেলরবাবুর আদেশ। ডাল-রুটির গামলা নিয়ে পাহারা আর মেট
গুলো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বসে আছে।

শ্যামল উত্তর করলো—আমাদের ওয়ার্ডের চাতালে খেলা দেখানো হচ্ছে
আমরা কেন বন্ধ করতে যাবো? তাছাড়া আজ তো রুটি আর হাডকুঁচে
আমাদের ওয়ার্ডে যা মোট লাগবে নেওয়া হয়ে গেছে।

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে জমাদার হঠাৎ হাতের বাটিটা উঁচিয়ে বন্দীদে
উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে লাগল—"শালা, শুয়োরকা বাচ্চা, চোরচোট্টা" বলে
এমন সব গালিগালাজ যা শুধু চার দেওয়ালের মধ্যেই চলতে পারে।

এদিন রাতের হাউসে জেলকমিটির নতুন এক সিদ্ধান্ত এলো। কমিটি স্থি
করেছে একনম্বরের যে সমস্ত বন্দী মোটেই লিখতে পড়তে জানে না। তাদে
লেখাপড়া শেখানোর জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কমিউন যে
যে নিরক্ষর তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে। হিসেব করে যা দেখা গেল
আটকবন্দীদের প্রায় অর্ধেক চাষী মজুর, তারা সকলেই নিরক্ষর। মণি সেন খবর
পাঠিয়ে দিলেন বাইরে এক বিরাট কারখানায় সংগঠিত ইউনিয়নের কাছে—শ্লেট
পেনসিল, 'পড়বো লিখবো' দুখণ্ডই জরুরী ভিত্তিতে পাঠানোর জন্য। কয়েক
দিনের মধ্যে এসেও গেল। সকাল আটটার মধ্যে নিরক্ষর সহবন্দীদের নিয়ে বসে
গেল একদল বন্দী শিক্ষক।

চারজন নিরক্ষরকে নিয়ে একটা কোণে বসেছে কাজল। এইভাবে প্রত্যেক

দিন চার-পাঁচ ব্যাচ যাচ্ছে। কাজলের কাছে যারা বসেছে তারা সকলেই গাঁয়ের গরীব মজুর। অসীম ধৈর্য কাজলের। সকলের সামনের দেওয়ালে একটা বড় চার্ট ঝোলানো। একটা পাঞ্জা দিয়ে অন্য অক্ষরগুলোকে ঢাকা দিয়ে অন্য পাঞ্জার তর্জনী দিয়ে চিনিয়ে দিতে গিয়ে বলছে—বলুন তো এটা কি ?

একজন উত্তর করলো—'ব'। হাতছেড়ে কাজল পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে বলে—বলুন সবাই 'ব'। সবাই চেঁচিয়ে একস্বরে বলে উঠল—'ব'। আবার ফিরে এলো চার্টের দিকে 'বলুন তো, এটা কি ?'

সবাই চুপ করে আছে দেখে কাজল একজনকে বলল—আপনি বলুন তো এটা কী ?

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—ওটা 'দন্তন্য'।

—বেশ। এটা কি আপনি বলুন। বলে মুখ তুলে আর একজনকে কাজল তুলল।

সেও চুপ করে যেতে তাকে বসতে বলল। তারপর আরেকজনকে তুললে সে বলল—এটা 'দ এ ঈকার'।

সঙ্গে কাজল সকলের উদ্দেশ্যেই বলে—তাহলে সবকটা মিলিয়ে কি দাঁড়াল ? বলুন তো ? উত্তর এলো—বন্দী। 'তাহলে সবাই একবার বলুন তো কি হল ?' সকলের চীৎকার—'বন্দী'।

কাজল আবার চার্টে ফিরে এসে যথারীতি এক হাতের পাঞ্জা দিয়ে 'বন্দী' শব্দটা দিল ঢেকে আবার পৃথক একটা শব্দের দিকে আঙুল তুলে বলে—বলুন তো শিবুদা এটা কি ? সঙ্গে সঙ্গে শিবুর উত্তর—'আ'। আবার প্রশ্ন—এটা ? উত্তর—'ম'।

প্রশ্ন—এটা কী বলুন তো ? বাকী দুটো শব্দ বাঁ হাতের পাঞ্জা দিয়ে ঢাকা। উত্তর—'র-এ আকার'। 'কি হয় ?' 'রা'। 'বেশ, তাহলে সবকটা মিলে কি হল ? প্রশ্ন শুনে শিবু বাগদী খানিক চুপচাপ। কাজল সাহস দিয়ে বলে—মনে করে বলুন। কি হয় ? শিবু এবার চট্ করে জবাব দেয়—'আমরা'।

শিবুকে নিজের জায়গায় বসতে বলে কাজল আরেকজনকে তুলে বলতে বলল—পড়ুন তো বক্করভাই ! এই লাইনটা।

উত্তর সঙ্গে সঙ্গে—'আমরা বন্দী'। হাসতে হাসতে কাজল বলল—বাঃ, বেশ তো, আপনি অনেকখানি শিখে ফেলেছেন। আগে কিছু পড়াশুনা ছিল বুঝি। বক্কর বিনীতভাবে উত্তর দেয় আজ্ঞে, না। জেলখানাতেই লিখতে পড়তে

প্রথম শিখলাম। সংসার চালাতেই জিভ বেরিয়ে যায়, নেতা পড়াটা কখন শিখবো? আবার শুরু হল নতুন একটা লাইন। কাজলের প্রশ্ন—এটা কি আপনি বলুন। উত্তর এলো—'বর্গীয় জ'। প্রশ্ন—এটা কি? 'বর্গীয় জ একার।' 'কি হয়?' জে এ এ।

—'এটা?'

—'ল একার'।

—কি হয়?

—লে এ এ।

বলুন তো দুইয়ে মিলিয়ে কি হয়? উত্তর এলো—'জেলে'।

—তাহলে এটা এটা এটা। তিনটে মিলিয়ে কি হয় বলুনতো নন্দদা, বলতেই নন্দ বাউরা উঠে দাঁড়ালো। সে অবশ্য উত্তর দিতে দেরী করলো না। চট করে উত্তর দিল—'আমরা জেলে বন্দী' তাহলে আপনারা সবাই এখন বলুন। সবাই একস্বরে বলে গেল—'আমরা জেলে বনদী।'

আবার নতুন এক শব্দের প্রতি অঙ্গুলী নিক্ষেপ করে কাজল বলে—বলুন তো শিবুদা, এটা কি?

উত্তর—'ব'। 'এটা?' 'বহ্রস্বই বি'। 'এটা?'

—এটা 'দন্ত্যন'।

—এটা! 'দন্ত্য ন এ আকার'। না আ আ।

—দুইয়ে মিলিয়ে কি হল? 'আজ্ঞে, বি ই ই না আ আ।

—এটা? বলে আবার বাকী অংশে হাত চাপা দিয়ে দিল।

—এটা? 'বি ই ই'।

—এটা? এটা 'চ এ আকার চা আ আ'॥

আর এটা? 'এটা র একার রে এ এ'।

তাহলে এই যে আপনি বলুন তো? এটা কি? বলে গোটা শব্দটার প্রতি কাজল হাত বুলিয়ে গেল। উত্তর দিল গগন খয়রা। গগন উত্তর দিল—'বিচারে এ'। 'বেশ তাহলে এটা হল বিচারে এ।'

—তাহলে গগনদা আপনিই বলুন এই লাইনটায় কি আছে। বলে একপা সরে এসে বললো—পড়ুন কি লেখা আছে?

গগন খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে শিবুর দিকে মুখ ফেরাতেই হেসে ফেললো। আবার কাজলের গলার আওয়াজ—গগনদা, বলে ফেলুন। চার্টের

ানে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হল গগন শব্দটাই কোন্ জায়গায় সেটাই হারিয়ে ফলেছে। কাজল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে ঠিক জায়গায় তলায় াঙ্গুলটা বুলিয়ে বলে—এই যে, এইটে কি হবে বলুন তো গগনদা। আর আপনারাও গালো করে মন দিয়ে দেখুন এটা কি হয়। কারণ আপনাদের প্রত্যেককে তো ার ডাকা হচ্ছে না।

গগন এতক্ষণ ভালো করে শব্দগুলো বুঝে আর চিনে নিয়েছে। আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে গগন ঠিক উত্তর করলো—"আমরা বিনা বিচারে জেলে বন্দী।" বলতে পরে গগন বেশ খুশী। কাজল সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—সবাই একসঙ্গে লুন তো, কি বলল গগনদা। সকলে একসঙ্গে উত্তর দিল—আমরা বিনা বিচারে জলে বন্দী। মণি সেন এসে দেখে গেলেন কেমন পড়ানো হচ্ছে। পিছন পিছন ামল। মণি সেন যাবার সময় বলে গেলেন—এদিকে কাজলের গ্রুপ দেখছি নেকটা এগিয়ে গেছে। জেলে যেটুকু পারেন লেখাপড়া শিখে নিন। এতো ময় বাইরে পাবেন না। পড়াবারও লোক পাওয়া শক্ত। সমাজটা পাল্টাতে গেলে বাইকে লেখাপড়া শিখতেই হবে এটাও এক ধরনের যুদ্ধ। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

মণি সেনের সঙ্গে জেল গোডাউনের রাস্তায় দেখা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মিয় সেন। অমিয় সেন থামল। তার পুরানো দিনের নেতাকে একা পেয়ে। কটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে—মণিদা, আমাকে সাহায্য করবেন। আমি হাইকোর্ট রবো।

একটু অবাক হলেন মণি সেন। দেখলেন পায়ে ডাণ্ডা-বেড়ী পরানো সামনে াড়ানো অমিয় সেন। জোতদার ব্যবসায়ী খুনের আসামী। এককালে দলে ছিল। খন বহিষ্কৃত।

—কি বলছো অমিয় ?

—আমি আমার 'লাইফ সেন্টেন্সে'র বিরুদ্ধে আপীল করবো একজন উকীল ঠিক রে দিন আপনি।

—তোমরা আদালত চলাকালীন বিচারকে 'বুর্জোয়া আদালত', 'বুর্জোয়া বিচারক' এসব বলে গালিগালাজ করেছিলে। এখন কি অন্য কিছু ভাবছো ?

অমিয় খুব নীচুস্বরে উত্তর দিল—হ্যাঁ, নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে কে না চায়। যারা অর্বাচীন তারাই কেবল আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আমি বুঝেছি আদালতকে 'বুর্জোয়া' বলে গালিগালাজ করে, 'এর বিচার মানি না।'

এসব চীৎকার করলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না। মামলায় আমরা হারতাম না ভীষ্মই খারাপ করে দিল। ওই এসব চীৎকার করতো রোজ। জোতদারদে মুণ্ডুকাটার নামে যে ভুল করেছি তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজ আমাবে সুদামও তাই ভাবছে।

সুদাম মানে সুদাম বাউরী। ভীষ্মদেব, অমিয় আর সুদাম তিনজনে একযোগে ওদের ওখানকার গঞ্জের বিরাট ব্যবসায়ী শ্রীমালি দাসকে গঞ্জের মধ্যে দিন দুপুরে ভোজালির আঘাতে কেটে ফেললো মুণ্ডুটা। ভয়ে সমস্ত ব্যবসায়ীরা সেদিন ঝাঁপ স তাড়াতাড়ি বন্ধ করে পালিয়েছিল। শ্রীমালি দাসের ধড়টা পাওয়া যায়নি।

খুন হওয়ার আগে শ্রীমালিকে চীৎকার করে অনেকে বলতে শুনেছে—ভীষ্ম তুই আমাকে খুন করতে এসেছিস! রোজ রোজ এক কাঁড়ি টাকা দিয়েছি। ত তুই আমায় খুন করবি।

টাকা, আরও টাকা চাই। অর্থের লোভেই ভীষ্ম দুই প্রিয় সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চকচকে ধারালো ভোজালী নিয়ে ঢুকেছিল শ্রীমালি দাসের গদিতে। ওর হত্যাকার্য সমাধাকরে ছুটে পালিয়ে যায়। দৌড়োতে দেখে ভুরুণ্ডী গ্রামের ক্ষেত মজুর যুবকরাও ডাকাত ভেবে ওদের পিছু পিছু দৌড়োতে থাকে। তিনজনে আশ্রয় নেয় এক জোতদারের খড়ের বিরাট পালুইয়ের তলায়। সন্ধানী যুবকর খুঁজতে খুঁজতে সেই মরাইয়ের পাশে এসে দেখে পাড়ার একটা কুকুর প্রবলবিক্রমে চেঁচাচ্ছে। ধরা পড়ে গেল ঐ গ্রামবাসীদের হাতে তিনজনই। গ্রামবাসী ওদে মারধোর না করে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। কুখ্যাত জোতদার, সুদখোর মহাজ ছিলেন এমন দুর্ণাম শ্রীমালি দাসের গঞ্জে ছিল না। তবু প্রাণ হারালো। ভী ভাবে সে যা করেছে তা খুবই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। এটা তার পার্টির নীতি সে হাইকোর্টে আপিল করবে না। ভীষ্ম কড়া পাহারায় 'কনডেম্‌ড সেলে আবদ্ধ। অমিয় আর সুদাম হাইকোর্টে আপীল করলো।

বেলা সাড়ে দশটায় হঠাৎ জেলে পাগলা ঘণ্টার আওয়াজ। সাইরেন বেজে ওঠে। আবার ছুটোছুটির পালা। প্রাণপণে সকলে ছুটছে। যে যেখানে পাচ্ছে আশ্রয় খুঁজছে। মুহূর্তের মধ্যে সব ফাঁকা। বিপদ সঙ্কেত। লক্ষণ ভা নয়। জেলে পিটিয়ে বন্দীহত্যার ঘটনা ঘটার সংবাদ আসছে।

কয়েকমিনিট পরে থামলো সাইরেনের হৃদকম্পসৃষ্টিকারী আওয়াজ। বিশা লৌহকপাট উন্মুক্ত হলে সুপার, জেলর বিশাল এক সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঢুকলেন চললেন সাত্তাম্বরের দিকে।

একনম্বরের দেবব্রত ঘাড় ধরে ধরে সকলকে দু'সারি ফাইলে বসাচ্ছে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিচ্ছে। মাথা নিচু করে সকলকে থাকতে বলছে। ঘাড় কেউ ফিরিয়েছে কি তারদিকে ছুটে যাচ্ছে। নিজেও একটা কম্বল জড়িয়েছে। ওঁর কাণ্ডকারখানা দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে শ্যামল বলে—আরে, কি আরম্ভ করলেন দেবব্রতবাবু? এই প্রচণ্ড গরমে সকলকে কম্বল মুড়ি করাচ্ছেন? মারবেন দেখছি। চটে উঠে দেবব্রত বলে—তুমি কিছু জানো না শ্যামল। আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না। পাগলা ঘন্টি বেজেছে। ওরা এসময় যে কোনো ওয়ার্ডে ঢুকে পড়তে পারে। তুমি দ্যাখো গেটটা তালা মারা থাকে যেন। পাহারা কোথায়?

—গোলমাল হলো সাতনম্বরে। সুপার সদলবলে সেখানে গেছেন আর আমরা কম্বল জড়াবো কেন?

—আরে তুমি কিছু বোঝ না। তোমার থেকে জেলে আমি আগে এসেছি। চুপ করে বোসো ঐখানে। নাও কম্বল নাও। যদি কম্বল ধোলাই হয় তবে—

ক্রুদ্ধ শ্যামল সরে গেল সামনে থেকে। সে কম্বল জড়াতে অস্বীকার করে বলে—"না, আমি কম্বলও জড়াবো না। ফাইলেও বসবো না।"

জেল অফিসের টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র চারজন সেন্ট্রি ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখছিল। সবার হাতেই রাইফেলের ডগা উঁচিয়ে আছে। ওদের একনম্বর থেকে খাসা দেখতে পাওয়া যায়। ওরাও তাকাচ্ছে একনম্বরের দিকে। ওদের মধ্যে একজন টাওয়ার থেকে একনম্বরের বন্দীদের ইঙ্গিত করে কি কিছু বলার চেষ্টা করছিল আর হাসছিল। সেন্ট্রির ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল ওয়ার্ডে কেউ আসবে না। শ্যামল হঠাৎ কি ভেবে টেনে টেনে সবার গা থেকে কম্বল খুলতে আরম্ভ করতেই দেবব্রত ছুটে এসে হৈ হৈ করে উঠল। এরমধ্যে 'অল ক্লিয়ার'-এর সাইরেন বেজে ওঠে। পরে জানা গেল সাত নম্বরে প্রবল অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের মুখে পড়ে একজন সেন্ট্রি গুরুতর আহত হওয়ায় কর্তাদের ছুটে যেতে হয়। কাজল এসে শ্যামলের ঘাড়ে ঈষৎ চাপ দিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলল—দেখো শ্যামল পালে বাঘ পড়ার মতো আমাদের অবস্থা যেন শেষ কালে না হয়।

পালে বাঘ না পড়লেও সত্যি সত্যি জেলখানায় ঘটে গেল ভয়াবহ বন্দীহত্যার কলঙ্ক। শীতের সকাল। কুয়াসা কেটে ধীরে ধীরে গাছের ফাঁক দিয়ে সবে সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছে। বন্দীদের জড়োসড়ো ভাব কাটেনি। রাত্রে ঘুম অনেকেরই যে হয় না। ধীরে ধীরে সকলেই এবার উঠতে শুরু করেছে। সবে কম্বল গোটানো শুরু হয়েছে। জানলার ধারে বসে শ্যামল, বিকাশ, সুখেন্দু, কাজল বসে

বাইরের দৃশ্য উপভোগে মগ্ন। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গেটের সামনে নারকেল গাছটার সামনেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে জনা তিনেক পায়ে বেড়ি পরা কনভিক্ট! পরণে তাদের জেলে তৈরী খদ্দরের জামা আর হাফপ্যাণ্ট। ওরা নীরবে কাজ করে যায় মাথা হেঁট করে। ওরা চমকে ওঠে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওদের সামনে দিয়ে কে যেন একজন দৌড়ে চলে গেল। পিছু পিছু ছুটছে সিপাই। সে ছুটছে আর সমানে হুইসেল বাজিয়ে যাচ্ছে। শ্যামল চেঁচিয়ে ওঠে—আরে ভীষ্মদেব ওভাবে দৌড়াচ্ছে কেন? হঠাৎ পাগলা ঘন্টির উন্মত্ত আওয়াজ। ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটছে চার দেওয়ালের মধ্যে। পাঁচিলের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, ক্রন্দন আর লাঠি দিয়ে পেটানোর আওয়াজ। একনম্বরের পাশ দিয়ে একজন সিপাই দৌড়ে চলে গেল। ডান হাতের একটা আঙ্গুল মুখে তুলে ইসারায় বলে গেল—চুপ করে থাকুন। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। চার-পাঁচজনকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সে দৌড়ে চলে গেল। কয়েকমুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে সিপাইদের ছোটাছুটি। সবার গতি জেল হাসপাতালের দিকে। সুপার, জেলর, ডেপুটি জেলর সবাই হাসপাতালের দিকে যেন দৌড়াচ্ছে।

ধীরে ধীরে থেমে গেল পাগলা ঘন্টি। আর তার বুককাঁপানো আওয়াজ। খবর হলো ভীষ্মদেব পাঁচিলের ধারে সিপাইদের সঙ্গে এক লড়াইয়ে নিহত হয়েছে। ওকে দৌড়োতে দেখে কয়েকজন সিপাই ওর পিছু ধাওয়া করেছিল, বিশেষতঃ কনডেম্ড্ সেলের সেন্ট্রি, সে তো ভয়ঙ্কর বেগে দৌড়োচ্ছিল। কারাগারের শেষ পাঁচিলের আগে ছোট পাঁচিলের সামনে যে সেন্ট্রি পাহারারত ছিল ভীষ্মদেব প্রথমেই লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার খুলি ফেটে চৌচির। মাটিতে পড়ে যাবার আগে সেও লাঠির দু-এক ঘা বসিয়েছিল ভীষ্মের দেহে, আর তারফলে ভীষ্ম গেল মাটিতে পড়ে। মাটি থেকে যা হোক করে উঠে ভীষ্ম আবার দৌড় দেয় বড় পাঁচিলের দিকে। ওদের দলের চারজন যুবক পরস্পরের কাঁধে ভর করে এমনভাবে পাঁচিলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল যাতে সবার ওপরে যে আছে তার কাঁধে পা দিয়ে ভীষ্ম পাঁচিলের গায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা গর্ত ধরতে পারে। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসে যখন একজনের পা ফসকে যায়। সঙ্গে ভীষ্মও মাটিতে আছড়ে পড়ে। ভূপতিত ভীষ্ম দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করে আর সফল হয়নি। ঐ গুরুত্বপূর্ণ আর ভীষণ গোপন স্থানটি কড়া পাহারায় সব সময়েই থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচণ্ড এক বোমার আওয়াজ চতুর্দিকে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। বোঝাই যায় গুরুত্বপূর্ণ এবং পাঁচিলের গোপন জায়গাটি বোমা

মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সহকর্মীর দেহ থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সিপাইরা উন্মত্ত হয় বলে প্রচারিত হল। এ প্রচার পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু এভাবে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দীহত্যার ঘটনাটি কেউ সমর্থন করতে পারলো না।

দুপুরবেলা পর্যন্ত অবস্থা থমথমে। কোনো ওয়ার্ডেই দ্বার সকাল থেকে খুললো না। মাঝখানে দুপুরবেলা দুজন মেয়াদী আসামী ঘাড়ে করে ভাত আর ডালের ড্রাম নিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। একজন সিপাই খুলে দিল দরজার তালা। কনভিক্টরা দরজা ফাঁক করে ভাত, ডালের ড্রাম দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যায়। সঙ্গে আবার তালাবন্ধ। পড়ে রইলো দুপুরের খানা। বন্দী-হত্যার প্রতিবাদে সবাই মুখর। প্রত্যেকেরই চোখে-মুখে গভীর উদ্বিগ্নের ছাপ।

দুপুর গড়িয়ে বিকালের দিকে এলেন জেলাশাসক এস. পি. সহ একদল আই. পি. এস. অফিসার আর সাধারণ অফিসার। তাঁদের উপস্থিতিতেই এক এক করে পাঁচজনের অচৈতন্য শরীর ষ্ট্রেচারে শুইয়ে বাইরে চলে গেল।

রাণী আর তার মা এসেছিল গেটে শ্যামলের সঙ্গে দেখা করতে। রাণী বাইরে টাঙ্গানো নোটিশ পড়ে দেখল। আপাততঃ এক সপ্তাহ সমস্ত রকম সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ। তাদের সামনে ষ্ট্রেচার আর দেহগুলো এক এক করে রাখা হল। ভীত সন্ত্রস্ত রাণী আর রাণীর মা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে আর দেরী করলো না। আর ভিতরে এগারোটা ওয়ার্ড আর বারোটা সেল সবকটির গেট বিরাট বিরাট তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

বন্দী-হত্যার প্রতিবাদসভা শুরু হয়েছে একনম্বরের চাতালে। পরদিন বিকালে আহুত ঐ সভায় সেল আর সাতনম্বর বাদে বাকী ওয়ার্ডগুলো থেকে বন্দীরা সমবেত। সেল আর সাতনম্বরের কাছে একনম্বর প্রকৃতপক্ষে অচ্ছুত। মণি সেন প্রস্তাব আনলেন জেলে জেলে বন্দী-হত্যা বন্ধ করার জন্য বাইরে প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। নচেৎ এখানে বাঁচা সম্ভব নয়। যে কোনদিন যে কোনসময় আবার জেলে খুন করতে পারে।

দিন কয়েকের মধ্যে জেলের বাইরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় একটা ছাপানো ইশতেহার বিলী করা হ'ল। ওতে লেখা হ'ল জেলের মধ্যে ভীষ্ম হত্যার ঘটনায় কম্যুনিষ্টদের নির্ঘাত হাত আছে।

মধ্যরাত্রে কম্বল থেকে ঘুমন্ত কাজল উঠে বসল। মাঝে একবার চীৎকার করে

ওঠে। পাশে শোওয়া মণি সেন তাকে ঠেলে দিয়ে বল্লেন—"কি কাজল, স্বপ্ন দেখছো নাকি! যাও, ঘাড়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসো।" চোখ রগড়াতে রগড়াতে কাজল উঠে পড়ে। সত্যিই সে দেখছিল ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন। আর সে স্বপ্ন বাস্তব হলে বড় ভয়ঙ্কর। তার মুখ থেকে স্বপ্নের কাহিনী শুনতে সকলেরই প্রবল আগ্রহ।

সকাল হতেই সকলে মিলে তাকে ঘিরে ধরে। কাজলের স্বপ্নের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে। এই জেলখানায় বারোজন বন্দীকে অন্যান্য জেল থেকে আনা হয়েছে। সকলেরই মাথার ওপর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত। ভোর চারটের সময় এদের কঠোর পাহারা দিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে আসা হল। প্রচণ্ড শীত হলেও নিরাবরণ দেহ। পরিধানে একটা ছোট প্যাণ্ট মাত্র। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ওরা নির্ভীকভাবে সকলে তাকিয়ে। শেষ ইচ্ছার কথা ওরা প্রকাশ করলো। "বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। এই আমার শেষ ইচ্ছা।" সকলেই একে একে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলো। ওরা উপস্থিত বিচারকের সামনে প্রত্যেকে বলল—"আমরা নির্দোষ। আমরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আমরা কেউ ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।" একজন একজন করে ফাঁসীর ঝুলন্ত দড়ির কাছে নিয়ে আসা হ'ল। ভগবানের নাম নিতে বলা হ'ল। রাজী হ'ল না কেউ। প্রত্যেকের একই উত্তর 'আমি ধর্মনিরপেক্ষ।' মুখমণ্ডল কাল কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হ'ল। সকলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। ভয়লেশহীন এক একজন যুবকের ফাঁসী দেওয়ার কাজ শেষ। শ্লিটটা কূপের মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা ঝুলে পড়ে। কয়েক মিনিট ঝুলন্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। জল্লাদ সরিয়ে আনল দেহটা। পুলি থেকে কেটে দিল দড়ি। মৃতদেহ যাতে বেঁচে না ওঠে তারজন্য পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দেওয়া হ'ল। স্বপ্ন দেখা শেষ। চীৎকার করে উঠেছিল কাজল—না, না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। জেগে উঠে যখন দেখে সে কম্বলে শায়িত আর পাশে মণি সেন তখন একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

রাত্রে যখন হাউস বসলো সকলের কাছ থেকে এলো অনুরোধ কাজল তার স্বপ্নের কাহিনী বলুক।' কাজলের গল্পকথা শেষ হলে মণি সেন দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচনভঙ্গীতে বল্লেন—বাইরে আমাদের সহযোদ্ধারা প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত ইন্দিরা কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন। পাইপগান, বোমা, রিভলবার, ছোরার আঘাতে প্রতিদিনই মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের এই মরণপণ লড়াই আমাদের জেলবন্ধুদের হতাশা থেকে মুক্ত করুক। ওদেরতো সংসার আছে। মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আছে। এদের জীবন বিসর্জন হ'ক আমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রেরণা, জীবনকাহিনী হ'ক ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল। আমাদের এক মহাননেতা দেশের স্বার্থে জীবনের উনত্রিশ বৎসরই জেলে কাটিয়েছেন। দেশের মজুর-কৃষকরাজ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে আমাদের সকলকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। মণি সেনের পর উঠলো সুখেন্দু। সুখেন্দু ধর্মের প্রশ্ন তোলে—"ফর্ম না পাল্টালে আক্রমণের মোকাবিলা করা যাবে না।" পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। যেমন, এখন ঘটছে। সংবাদপত্রে রোজই 'নিহত' হবার সংবাদ। আর সকলেই প্রায় সি. পি. আই. (এম.) কর্মী। তাহলে আমরা কি শুধু 'শহীদ' হবার জন্য পার্টি গড়ে তুলছি। আমরা তো বাঁচতে চাই নাকি? নেতৃত্বের কাছে আমি ফর্মের প্রশ্ন রাখছি। স্পষ্ট করে ঘোষণা করার সময় এসেছে। ভুল হলে শুধু ভুল স্বীকার করলেই কি দায়িত্ব শেষ? আবার দেখা যাবে ভুলের পুনরাবৃত্তি।

শ্যামল প্রস্তাব সমর্থন করলো—বিষয়টি যা সুখেন্দু তুলেছে তা পার্টিতেই কেবল আলোচনা হতে পারে। অনেকে এমন সব আলোচনায় প্রস্তাব করেন যার মধ্যে শুধু হতাশার ভাব ফুটে ওঠে। হতাশার তো কোন কারণ দেখি না। একজন পূর্বসূরী জীবনের উনত্রিশ বৎসর জেল খেটেও যদি মার্কসবাদের প্রতি গভীর আস্থা থেকে থাকে তবে আমাদের এই সামান্য জেল জীবনেই অনেকে উল্টোপাল্টা বলছেন। যাহোক, 'ফর্ম'-এর প্রশ্ন আলোচনা করা হ'ক। আমারও এ প্রস্তাবের প্রতি গভীর সমর্থন আছে। পরিশেষে সে নতুন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলে—মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার নিজের থেকে একটি প্রস্তাব আছে, যা আমি অনেকদিন ধরেই তুলবো ভাবছিলাম। এই চার দেওয়ালের মধ্যে গত বেশ কিছুকাল ধরে এখন সব ঘটনা ঘটেছে যার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। আমি জেল-কমিটির সভায় সেই মূল্যায়নের প্রস্তাব রাখছি। জেলের শাসকশ্রেণীর আক্রমণ আছে, আছে নানা দুঃখকষ্ট, কিন্তু তাতে আমরা মুষড়ে পড়বো কেন? আমার মনে হয় শ্রদ্ধেয় প্রয়াত-মহান নেতা কাকাবাবুর বাণী আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণে রাখা উচিত। তিনি বলেছিলেন—যত দুঃখ হ'ক, যত কষ্ট হ'ক, যত কাঁটা বিছানোই হ'ক না কেন, আমাদের পথ আমরা বিপ্লবের পথ ধরেই চলবো। আমি আর এর বেশী কিছু বলে আপনাদের ক্লান্তির কারণ হতে চাই না।

সুখেন্দু পুনরায় আবার কিছু বলতে ওঠে। সভাপতির অনুমতি মিললে

সে বললো—আমি হতাশার কথা বলছি না। আমার প্রস্তাবের মধ্যে যেন কেউ হতাশা ছড়ানো আঁচ না পান। তবে আমরা সংগঠনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর কতটা রূপায়িত করতে পারছি আবার না পারলে কেন পারছি না, না পারলে কি উপায় গ্রহণ করা উচিত এসব কি কোনদিনই আলোচনা হবে না? যেমন প্রকৃত ভূমি-সংস্কার করতে হলে এর স-পক্ষে প্রচার কতটাই বা করা হয়েছে তা আমাদের চিন্তা করা দরকার।

সুখেন্দুর কথায় বিপুল সমর্থন মিললো। কিন্তু সভাপতি মণি সেন নির্দেশ দিলেন—"আজ আর এ আলোচনা নয়, অন্যদিন আলোচনা হবে। তাছাড়া চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা এসব বিষয়ের সবটা আলোচনাও করতে পারি না। বাইরের পার্টির কাজ ও জেলের পার্টিকমিটি করতে পারে না। যাক্, আজ এখন সভা শেষ করবো। কেউ যদি গান গাইতে চাও, গান ধরো।"

গণসঙ্গীতের স্কোয়াড গান ধরলো—

"বেজে উঠলো যে সময়ের ঘড়ি,
এসো সবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী উঠুক ঝড়।"

গান শেষহলে দাবী উঠলো—'এবার আবৃত্তি হ'ক।' মণি সেন সম্মতি জানালেন ঠিক আছে। বিকাশ আর কাজল তোমরা একটা করে আবৃত্তি করো। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন' কবিতা ওরা কম্পিটিশনে আবৃত্তি বহে। একপা একপা করে এগিয়ে এলো দেবব্রত। 'আরে দেবব্রতবাবু, আবৃত্তি করবেন নাকি?' ফোড়ন কাটলো কে যেন। সুগঠিত দেহ দেবব্রত মাথাটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উত্তর দিল নিশ্চয়ই। কি সভাপতি মশাই, 'পারমিশন আছে তো।' 'নিশ্চয়ই', তার আগে বলুন আপনার কবিতার নামটা কি? 'আফ্রিকা'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতার নাম শুনেছেন কি? দেবব্রত চলে গেল মহান কবিগুরুর 'আফ্রিকা' ঝরঝরে আবৃত্তি করে। দেবব্রতর পরেই তার জায়গা ঝট করে দখল করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে অবাক করে স্বরচিত কবিতা পাঠ শুরু হ'ল। 'চ্যালেঞ্জ'এ ওপেন্ চ্যালেঞ্জ।' নিজের লেখা কবিতা সকলকে আবৃত্তি করে শোনাল সুখেন্দু। শ্রেণী শত্রুকে চ্যালেঞ্জ করে কতজন আর কবিতা লিখতে পারে? এওতো এক ধরনের ধারালো হাতিয়ারে শান দেওয়া। কবিতা চ্যালেঞ্জের সুরে তৈরী হলে শ্রেণীশত্রুরাও তা শুনে ভীত হয়ে পড়ে। যদিও প্রতিক্রিয়া হতে বেশী বিলম্ব হয়ে যায়। সভা শেষ, ঘোষণার সাথে সাথে সবাই 'সাবধান'

পজিশনে দাঁড়িয়ে যায়। শুরু হল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত—

"জাগো জাগো জাগো সর্বহারা, অনশনবন্দী ক্রীতদাস।
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া, উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস॥"

সকলে ডান হাত কাঁধের কাছে রেখে অভিবাদন জানায়।

"শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড, এস মোরা মিলি একসাথ,
গাও ইণ্টার ন্যাশনাল, মিলাবে মানবজাত।"

সঙ্গীতের মূর্ছনা শেষ হলে উঠলো বজ্রকণ্ঠের নির্ঘোষ 'লাল সেলাম'। সেদিন সমস্ত হলঘরটা সমবেত আওয়াজে যেন সেসময় চৌচির হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

সুখেন্দুর স্ত্রী সুখেন্দুকে পত্র লেখে না। এতেও বড় দুঃখ পায় কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু চিত্ত আজ একটা স্ত্রীর পত্র পেয়েছে। মোটামুটি বেশ বড়সড়ো আকারে লেখা। ইণ্টারভিউর সময় হাত সাফাই হয়ে এখন চিত্তর হাতে। অনেক নিবিষ্ট মনে পড়ে ফেলল। শ্যামল বলে—কি চিত্তদা, গোপন পত্র? সহাস্য মুখে চিত্ত চিঠিটা প্রায় শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিয়েই বলে—একটুও আপত্তি নেই। এই নাও, তোমারাই পড়। না না আমাদের দরকার নেই। আপনি বরং পড়ে শোনান। শ্যামলের অনুরোধে চিত্ত চিঠিটা ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল। স্ত্রী লিখেছে বেশ টানা অক্ষরে।

"তুমি হয়তো ভাবছো, তুমি নেই তাই তোমার অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া হয়তো ছেড়ে দিয়েছে। নয়তো পড়াশুনা ভালো করছে না। আমরা কি খাচ্ছি, আদৌ দুবেলা দুমুঠো পেটে পড়ছে কিনা এইসব ভেবে নিজের শরীর নষ্ট করছো। তোমার আদরের টুসু আর মণির পড়াশুনা বন্ধ হয়নি। ওদের আমি নিজে নিয়ে দুবেলা বসি। আমি সারাদিন ঠোঙা তৈরী করে যাচ্ছি। সংসার চালানোর মতো আয় হচ্ছে। আমাদের জন্য চিন্তা কোরো না লক্ষ্মীটি। তোমার টুসু আর মণি যেন জীবনে তোমার মতো আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। বারবার দূরে থেকে সেই আশীর্বাদ করো। আমি ওদের সেইমতো গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

টুসু আর মণি সারাদিনই বেশ হাসী খুশী থাকে। তবে আমাকে তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। টুসুই আবার গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে একদিন বলে—"মা, বাবা দেশের জন্য জেলে গেছে। আমরা দুঃখ পাবো কেন বলো।" এবার শীতে তোমার জন্য একটা সোয়েটার কিনে, পাড়ার তোমার বন্ধুরা পাঠাবে শুনলাম। কিছু চিনি, চা পাঠালাম। সামনের সপ্তায় মঙ্গলবারে টুসু আর মণিকে নিয়ে তোমায় দেখতে যাবো। আগের মঙ্গলবারে জেলগেট থেকে ফিরে এলাম।

তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিল না। সেদিন তোমাদের জেলের মধ্যে নাকি গুলী চলেছিল। পিটিয়ে নাকি একজনকে মেরে ফেলেছে। কারুর সঙ্গেই কারুর দেখা হ'ল না। তবে আমার সামনেই ষ্ট্রেচারে করে কতজনকে আগাগোড়া চাদর চাপা দিয়ে গেটের বাইরে আনা হ'ল। শুনলাম ওরা হাসপাতালে যাচ্ছে। গেটের পুলিশ আর সি. আর. পি. থিক থিক করছিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। পুরুষদের উপস্থিতি প্রায় নেই। বিস্তর সাদা পোষাকের পুলিশ। গেটের কাছে কাউকে ঘেঁসতে দিচ্ছিল না। জেলের মধ্যে যা ঘটেছে যার যা খুশীমতো বলে যাচ্ছে গুজবে কান দিও না। কিন্তু গুজব চারদিক ভরে ফেলেছে দেখলাম।

শুনলাম সেদিন সকালেই ঐ ঘটনা ঘটে। কাগজে দেখলাম তোমরা জেলের মধ্যে সভা করে এর প্রতিবাদ করেছো। আমার কাছে খবরটা দারুণ খুশীর। জেলে বন্দী হত্যার বিরুদ্ধে সভা করে বন্দীরাই প্রতিবাদ করেছে। সেদিন রাত্রে কিছু খেতে পারিনি। তোমার ছেলেমেয়েকে বলতে পারিনি ঘটনাটা। যদি ওরা ভয় পায়। আগে লোকে পুরী, কাশী তীর্থযাত্রায় বের হবার আগে বাড়ির সবায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতো। পথে জন্তু-জানোয়ার, চোর-ডাকাত, খুনে কত কি ভয় থাকত। বাড়ির লোকে তার ফেরার আশা ত্যাগ করতো। এখন দেখছি স্বাধীন দেশের কাজে কেউ জেলে গেলে তারও কোনদিন বাড়ি ফেরার আশা আপনজনদের ত্যাগ করতে হবে।

তুমি চিঠি দিও। তোমার হাতের লেখা চিঠি পেলে টুম্পু মণি দারুণ আনন্দ পায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আমার চোখের জল ওরা সহ্য করতে পারে না। তাই নিজেকে আরও শক্ত করে তুলছি। আমার চুম্বন গ্রহণ করো, টুম্পু মণির চুম্বন গ্রহণ করো। ইতি তোমার চিরদিনের সুলেখা।"

চিঠিটা চিত্ত বার করেছিল একটা বড়সাইজের বিড়ির মধ্যে থেকে। বিড়ির মধ্যে তামাক ছিল না। তামাকের পরিবর্তে চিঠি। বিড়ির বাণ্ডিলের মধ্যে একটা পৃথক রঙের সুতোয় বাঁধা ছিল ঐ বিড়িটি। সব বিড়িই ছিল লাল সুতোয় বাঁধা, ঐটি ছিল নীল সুতোয়। যে প্যাকেটটা এনেছিল সে এ-ব্যাপারটি বলে দিয়েছিল।

শ্যামল চিত্তর গুণমুগ্ধ। চিত্তকে অনুরোধ করে—চিত্তদা, আজ আপনি রাতের হাউসে বৌদির এই মারাত্মক চিঠিটা পড়ে শোনান। সবাই শুনুক। হতাশা-চ্ছন্নরা প্রেরণা পাবে।

চিত্তও কিছুটা আচ্ছন্ন। মুখেচোখে আচ্ছন্নের ভাব স্পষ্ট। শ্যামলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—শ্যামল, আমার স্ত্রী কিন্তু আগে এতোটা এগিয়ে আসেনি। আমাকে বন্দীকরার পর এই উন্নতি।

পিছিয়ে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে শ্যামল বিরূপ মন্তব্য করে বলে—আমাদের দেশের মেয়েরা শুধু ঘরসংসার সাজাবে, স্বামীকে খুশী রাখবে। ওরা উৎপাদনের উপকরণ, শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, দেশের হালচাল, প্রশাসন চালানো এসব নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামাতে চায় না।

—হ্যাখো শ্যামল, তোমার কথাই ঠিক। তবু এর সব দায়তো মেয়েদের নয়। একাজে পুরুষরাই বা কতটা এগিয়ে এসেছে বলতে পারো। এখন সংসারের জন্য মেয়েরাও উপার্জন করছে। পরিশ্রম করছে। কারখানায়, অফিসে কাজ করছে। তবে বলতে পারো মেয়েরা গণআন্দোলনে কম আসে।

—আসে কজন? অনেক মধ্যবিত্ত মেয়ের মুখ থেকে শুনতে পাবেন একথা—কুম্যনিষ্ট পার্টির বা তার কাছাকাছি কোন যুবককে দূর থেকে শ্রদ্ধা করা চলে, কিন্তু বিয়ে করা চলে না। অনেকে এখনও গায়ে-গতরে খাটা মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। বাড়ির ঝি মাসকাবারী মাইনে চাইতে গেলে কিছু কম দেওয়া বা কাটার চেষ্টা ছাড়ে না। এসবও তো অনেক মেয়েই করে।

—শ্যামল রাতারাতি সব পাল্টে যাবে না। অপেক্ষা কর। দেশটা তো আর ভিয়েতনাম নয়। শুনেছি ভিয়েতনামের তরুণীরা কম্যুনিষ্ট পার্টি না করা তরুণদের বিয়ে করতে চায় না। কম্যুনিষ্ট পার্টির যে যুবক সভ্য নয়, তাকে ওরা পৌরুষহীন ভীতু বলে ভাবে।

জানলার ধারে বসে এতক্ষণ দুজনায় বসে কথা হচ্ছিল। দূরে চার-পাঁচজনে হুমড়ী খেয়ে পড়ে সকালে সেইমাত্র দিয়ে যাওয়া খবরের কাগজ পড়ছে। পড়ছে না যেন গিলছে। একজন শ্যামলের কাছে ছুটে এসে বলল—শ্যামলদা, আপনাদের ওখানে বাড়ি সন্দীপ ব্যানার্জী বলে কাউকে চেনেন নাকি? ঘুরে বসে শ্যামল প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, কেন? কি হয়েছে?

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বিকাশ ইশারায় হাতনেড়ে শ্যামলকে কাছে আসতে বলে। শ্যামল দৌড়ে এগিয়ে যায়। "কি ব্যাপার, কি হয়েছে?" শ্যামলের আকুতিপূর্ণ অনুরোধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েক লাইনের একটি সংবাদে আছাড় খেয়ে পড়ে। খবরে লেখা হয়েছে—"সন্দীপ ব্যানার্জী নামে একজন সি. পি. এম. কর্মী, কৃষক নেতা অজ্ঞাত আততায়ীর ছোরার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। রাস্তার

ধারে ধানের ক্ষেতে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রকাশ, তিনি তাঁর গ্রামের নিকটবর্তী গুগলীগেড়ে গ্রামে দলের সভা করে রাত্রিবেলায় যখন ফিরছিলেন রাত তখন দশটা হবে। ঘন অন্ধকারে পিছন দিক থেকে তিনি আক্রান্ত হন। ছোরার আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষত-বিক্ষত। মাঠের মধ্যে প্রথমে উপুড় হয়ে দেহটা ছিল পড়ে। বয়স তিরিশ। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।"

বাকরুদ্ধ শ্যামল ধীরপদক্ষেপে জানলার ধারে চিত্তর কাছে বসে গল্প করছিল, সেখানে এসে চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কিছু একটা বিরাট অঘটন শ্যামলদের এলাকায় ঘটে গেছে ভেবে সমস্ত ওয়ার্ড নিঃস্তব্ধ। তবে এমন ঘটনা চারদিকে প্রায় সর্বত্র ঘটছে কেমন একটা গা-সওয়া ভাবও আছে। প্রত্যেকেই চিন্তিত। দু-চারজন কর্মী খুন এতো প্রভাতী সংবাদপত্রগুলোর নিত্য নৈমিত্তিক সংবাদ। মনে পড়ে শ্যামলের, সন্দীপের পাঠানো সর্বশেষ চিঠিটার কথা। শ্যামল মাত্র গতকাল সেটা পাঁউরুটির মোড়কের মধ্যে পেয়েছিল। বারবার চিঠিটা বার করে চোখ বোলাতে থাকে। সন্দীপের হাতের লেখা দারুণ সুন্দর। ঝকঝকে মুক্তঝরা অক্ষরে সে শ্যামলকে লিখেছে—"শ্যামল তোমার অভাব আমাকে খুব অসুবিধায় ফেলেছে। প্রয়োজনে তোমার পরামর্শ পাচ্ছি না। পার্টি থেকে জেলগেটে তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা নিষিদ্ধ। কাজের যথেষ্ট ত্রুটি হচ্ছে। ঠিক এইসময়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বকে এখন ত্রিধারায় কাজ করতে হবে। ঠিক এই সময়ে এটা করা ঠিক হ'ল বলে আমার মনে হয় না। আরও ভাবা উচিত ছিল।"

জেলে তোমার কি কি খেতে ইচ্ছে করছে জানাবে। দু-একদিনের মধ্যে মা, দাদা, বোন তোমার সঙ্গে জেলগেটে দেখা করতে যাচ্ছে। দেখা করতে দেবে কিনা অবশ্য জানি না। শ্যামল দেবব্রতকে চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছে আর হাউ হাউ করে কাঁদছে। দেবব্রতকে সে বলে—"দেবব্রতবাবু, সন্দীপ ছিল আমার কৈশোর ও বাল্যের বন্ধু। সহপাঠী। একসঙ্গে রাজনীতি করতে গিয়ে কখনও মতপার্থক্য ঘটেনি। মনোমালিন্য তো দূরের কথা আমি ভাবতেই পারছি না যে, সে বেঁচে নেই। তাকে হত্যা করা হ'ল।"

—কারা এই কাণ্ড করলো বলে তোমার ধারণা।

—জেলে বসে তো সে-কথা বলা সম্ভব নয়। তবে উদাসপুরের তিনজন বড় জোতদারের বন্দুক একবার পুলিশ সীজ করতে বাধ্য হয়েছিল সন্দীপের চাপে। ওরা গ্রামে মিছিলের ওপর গুলী চালিয়েছিল। ওদের ভূমিকা থাকতে পারে।

কথাগুলো শ্যামল বলছে আর অঝোরে কাঁদছে। দেবব্রত ছাড়াও তখন কাজল, চিত্ত, বিকাশ সকলে শ্যামলের চারপাশে এসে সমবেত হয়েছে। কে একজন বলল—শ্যামলবাবু, কেঁদে তো আর কোন ফল হবে না। চুপ করুন। এ শোক তো শুধু আপনার নয়, আপনার আমার সকলের। আমার মাস্টারমশাইকে ওরা দিন-দুপুরে ইস্কুল যাওয়ার পথে পাইপগানের গুলী ছুঁড়ে মেরে ফেলল। ঠিক এই সময়ে ওয়ার্ডে দুপুরের 'খানা' এসে যাওয়ায় ওয়ার্ডে কে আওয়াজ দিল—খানা এসে গেছে। সবাই লাইনে দাঁড়ান।

পাশথেকে অপর একজন শ্যামলকে দুহাত ধরে অনুরোধ করে—শ্যামলদা, লুন ভাত ধরবেন চলুন। শ্যামল চোখ তুলে দেখে সহকারী কর্মী বন্ধুটি। শ্যামল চাখের জল মুছে বলে—"চলুন, যাচ্ছি আপনারা নিন। দেবব্রত সকলকে ভাত নওয়ার জন্য আদেশের সুরে বলে আপনারা আপনাদের নিজের নিজের ভাতটা রুন না, শ্যামল যাচ্ছে একটু পরে। ওকে কাঁদতে দিন। কাঁদলে হাল্কা হয়ে াবে। এরকম সংবাদে কাঁদবে তো এটাই স্বাভাবিক।"

না, শ্যামল সেদিন দুপুরে আর ভাত ধরল না। ওর খানা পড়েই রইলো থাস্থানে। সারাদিন স্নান খাওয়া কিছুই হল না। শুধু মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণা আর কান্না। পিতা নরেন্দ্রের মৃত্যুতেও সে এতো উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। শ্যামল জীবনে আর এক জনের মৃত্যুতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আবেগে। সেটি হচ্ছে নির্মল চ্যাটার্জীর মৃত্যু। নির্মল ছিল তার পিতার একমাত্র সন্তান। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী জুটিয়ে নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে ভলান্টিয়ারী করার পর চাকুরী লাভ। নির্মলের একটা কঠিন রোগ ছিল হিষ্টিরিয়া। প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হবার তার প্রবল ইচ্ছা। একেবারে রেডি হয়ে এসেছে দলের অফিসে সম্মেলনে যাবার জন্য। তার পিছু পিছু এসেছে তার বৃদ্ধ বাবা কমলবাবু। কমলবাবুও সারাজীবন দেশ ও পার্টির কাজে ব্যস্ত। কমলবাবু অফিসে এসে বল্লেন—"দেখিস্ শ্যামল, নির্মলের অসুখটা আছে। সকলকে সাবধান করেদিস্। সম্মেলনে ভলান্টিয়ার হিসেবে পাঠাতে তো আমার কোন আপত্তি নেই। রাত্রে একা যেন না বের হয়। সকলকে একটু বলে দিস্।"

নির্মলের সঙ্গে যারা ছিল তাদের নির্মলের অসুখ সম্পর্কে সকলকে সাবধান করে দিয়েছিল শ্যামল। নির্মলকে বলেছিল—তুমিও একটু সাবধানে থাকবে। যখন রাত্রে বাইরে যাবে কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। একা কখনও বের হবে না। ঘাড় নেড়ে নির্মল সুবোধ বালকের মতো সম্মতি জানিয়েছিল। নির্মলদের

ট্রেনের সময় হয়ে গেছলো। সন্ধ্যার ট্রেন। ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে প্রত্যেকের একটা ছোটো বেডিং। মাথায় সেচ্ছাসেবক ক্যাপ। পরণে সবায়েরই ফুলপ্যাণ্ট আর জামা। বৃষ্টি মাথায় করেই সকলে রওনা দিল ষ্টেশনের দিকে কমলবাবু আর শ্যামল আরও কিছুক্ষণ গল্প পরামর্শ শেষ করে অফিসে তালা দিয়ে চলে গেলো যে যার বাড়ি।

পরের দিন শ্যামল ভোরের ট্রেন ধরে উপস্থিত সম্মেলন স্থানে। তাকে রিক্সায় চেপে আসতে দেখে প্রবীননেতা সন্তোষবাবু এগিয়ে এলেন। গাড়ীটা থামল। রিক্সাটা ধরে জিজ্ঞেস করলেন—শ্যামল, নির্মলের কোন অসুখ ছিল তুমি জানো? হঠাৎ এ-ধরনের প্রশ্নে শ্যামলের সারা দেহে বিদ্যুতের কম্পন ওঠে। রিক্সা থেকে না নেমে তার ওপর বসে বসেই সেও পাল্টা প্রশ্ন করে কেন কেন সন্তোষদা, নির্মলের কি কিছু হয়েছে? নির্মল কেমন আছে।

—ওর কোন অসুখ ছিল? তখনও প্রশ্ন করলেন সন্তোষবাবু।

—হ্যাঁ, ওর মৃগী রোগ আছে বলে ওর বাবা জানিয়েছিলেন। উত্তর শুনে সন্তোষবাবু ওকে রিক্সা থেকে নেমে আসতে ইঙ্গিত করলেন। শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে একটু দূরে সরে গেলেন সন্তোষবাবু। গলারস্বর খুবই নিচু করে সন্তোষবাবু বলে—শ্যামল তোমাদের নির্মল বেঁচে নেই।

নির্মল বেঁচে নেই। কেন? কি হয়েছিল তার? মুহূর্তের মধ্যে শ্যামলের চোখমুখে একটা বিরাট পরিবর্তন।

—হ্যাঁ, বেঁচে নেই। ভোরবেলায় কাউকে না তুলে সে একা পাইখানা করতে বের হয়ে গেছলো। আগের দিন রাত্রে সবাই তাকে বারণ করেছিল যেন একা একেবারে না বেরোয়। জলে নামতে গিয়ে হাঁটু জলে পড়ে যায় তারপরেই অজ্ঞান। সকাল হতেই সকলে খোঁজাখুঁজি করে নীরব হয়ে রইলেন। শ্যামল নিষ্পন্দ, নিথর। চোখদিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে, সন্তোষবাবুকে জড়িয়ে ধরে শ্যামল বলে—সন্তোষদা আমি অপরাধী হয়ে গেলাম।

কমলদাকে সান্ত্বনা দেবার আমার কোন ভাষা নেই। বউদির সামনে দাঁড়াতে পারবো না। সন্তোষবাবুর সঙ্গে কথাবলার সময় ওদের দুজনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সন্দীপ আর মাধুরী। ওদের চোখেও জল। সন্দীপ জড়িয়ে ধরে শ্যামলকে। শ্যামল নিজেকে সন্দীপের বন্ধন থেকে মুক্ত করে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে—সন্দীপ, কমলদা আর বউদির সামনে দাঁড়াবো কিভাবে। সন্দীপ, তুই বরং আগে চলে যা। একটা গাড়ী পাস্‌তো ভালো হয়। তাড়াতাড়ি যেতে

হবে। কমলদাকে বলবি নির্মল স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পে গিয়ে প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সন্দীপ বলল—শ্যামল তুই যদি ভেঙ্গে পড়িস্ তবে সম্মেলনে আমাদের ওখানকার প্রতিনিধিরা খুবই ভেঙ্গে পড়বে। আমি চলে যাচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমি কমলদার বাড়ি সামলাতে পারবো। একটা মোটরসাইকেল জোগাড় করে সন্দীপ গন্তব্যস্থলে চলে গেল। তারপরই বিধায়ক রামলোচনবাবু এলেন। তিনিও সন্দীপের দেহ গাড়ীতে তুলে জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন।

একটা আমগাছের তলায় শ্যামল ঘাসের ওপর বসে। তার পাশে এসে বসে মাধুরী। মাধুরী বলে—শ্যামলদা। সর্বনাস হয়ে গেল। নির্মল নেই, ভাবতেই পারছি না। শ্যামল উদভ্রান্ত। প্রথমে মাধুরীর কথার কোন সাড়া শব্দ দেয় না। মাধুরী আবার বলে—শ্যামলদা, সন্দীপদা এতক্ষণ নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে না? খুব ধরা গলায় শ্যামল বলে—তা হয়তো হবে। মাধুরী আমি এখন ভাবছি কমলবাবুর কথা। কমলদার জীবন ও আদর্শ কত মহান। নিজের পুত্রকে দেশের কাজে, পার্টির কাজে কেউ এভাবে ঠেলে দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

নির্মলের দেহ ধীরে ধীরে তোলা হল লরীতে? কাস্তে হাতুড়ী চিহ্নিত লালপতাকায় শোভিত করা হল মরদেহ। সম্মেলনের সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্নস্তরের প্রতিনিধিরা বিদায় অভিবাদন জানালেন। রামলোচনবাবু, শ্যামল, মাধুরী আরও কয়েকজন লরীর ওপর গিয়ে বসে মাথায় অর্ধনমিত রক্ত পতাকা নিয়ে লরী নির্মলের গ্রামের উদ্দেশ্যে ছুটলো।

সন্দীপ তার অনেক আগেই গ্রামে এসে গেছে। কমলবাবুকে সব কিছু খুলে বলেনি। শুধু জানিয়েছে নির্মলের গুরুতর অসুস্থতার কথা। তাকে বাড়ি নিয়ে আসা হচ্ছে। তখনই কমলবাবু মন্তব্য করেছিলেন—সন্দীপ, বুঝতে পারছি। বোধহয় নির্মল আমার শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছে কি লুকোবে।

ধীরে ধীরে লরী এসে দাঁড়াল কমলবাবুর বাড়ির দ্বারদেশে। লরী থেকে একে একে সকলে নেমে এলো। এলো না কেবল নির্মল। তার চিরশায়িত দেহে পাগলীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন শোকাকুলা জননী। তাঁর বুক ফাটা কান্না সহ্য করতে না পেরে কমলবাবু এগিয়ে এসে জোর করে সরিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলে গেলেন। কমলবাবুর চোখেও জল। তিনিও শোকে আকুল। ভিজা গলায় স্ত্রীকে বল্লেন—তুমি কেঁদো না। তুমি তোমার এক ছেলেকে হারালে। কিন্তু তোমার কত ছেলে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চোখ মেলে শান্ত হয়ে গ্যাখো। ঐ গ্যাখো

রামলোচন, সন্দীপ, মাধুরী, শ্যামল এরা সকলে রয়েছে। কেঁদো না, চলো বাড়ি চলো।

লরী আবার চলতে শুরু করলো। সবাই উঠে পড়ে। কমলবাবু ড্রাইভারের পাশে এক পুত্র আর সন্দীপকে কাছে নিয়ে বসলেন। লালপতাকা আর অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ভরা চিরনিদ্রিত নির্মল। গাড়ী এসে থামলো পার্টি অফিসের সম্মুখে যেখান থেকে গতকাল নির্মল যাত্রা করেছিল। সমবেত সকলের সামনে গীত হল মহান আন্তর্জাতিক সঙ্গীত "শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড।" লরী শেষে এসে থামলো শ্মশানে। কমলবাবু এতোটা পথ অতিক্রম করার সময় একটা কথাও কারুর সঙ্গে বল্লেন না। শুধু একটার পর একটা সিগারেট শেষ হয়ে যায়।

চিরশায়িত নির্মলের একটা ফটো তোলা হল। আর একটা সহযোদ্ধা শ্মশান যাত্রীদের নিয়ে। ফটো বাঁধাইয়ের সময় সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষরে সন্দীপ ফটোর তলায় লিখে দিল—"প্রয়াত কমরেড নির্মল চ্যাটার্জী, প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক।"

শ্যামল দেবব্রতদের উদ্দেশ্য করে বললো—শেষ পর্যন্ত সন্দীপকেও হারালাম, কিন্তু এবার ওর মৃত দেহটাও দেখতে পেলাম না। এখন আমি রামলোচনবাবুর আশ্রয়ে থাকি। সকালবেলার কাগজে পড়লাম কোন্নগরের আমার ও সন্দীপের পরিচিত এক যুবকর্মীর উগ্রপন্থীদের গুলীতে নিহত হবার সংবাদ। ঐ যুবকর্মীটি আমাদের গ্রামে নির্বাচনের সময় এসেছিল। মাস দুয়েক ছিল। তার ব্যবহারে সবাই ছিল মুগ্ধ। রাত্রে টিউশানী সেরে ফেরার পথে খুন হল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে শ্যামলকে একটা মিটিংয়ে পেয়ে বলেছিল—"শ্যামলদা, আমার একটা চাকরী ভীষণ দরকার। দেখুন না চেষ্টা করে আমার জন্যে একটু।" শ্যামল উত্তরে বলেছিল—"তোমার জন্যে তো, নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।" যুবক মিষ্টি স্বরে বলেছিল—শ্যামলদা, আপনাদের ওখানে কোন ইস্কুলে একটা চাকরী দেখে দিন না। আপনাদের ঐদিকে থাকবো। আপনাদের জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে।

সেই যুবকের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে ঘরে ঢুকলো সন্দীপ। সন্দীপ বললো—শ্যামল শুনেছিস, অমল গতকাল খুন হয়ে গেছে।

শ্যামল বলে—এই তো আজকের কাগজে বেরিয়েছে। এই দ্যাখ্। অমল চলে গেল। আমি শুধু ওর শেষ অনুরোধের কথাটা ভাবছি।

সন্দীপ কোন্নগরে গিয়ে অমলের বাড়ি থেকে একটা সর্বশেষ ফটো সংগ্রহ করে এনে সেটা ফ্রেমে সুন্দর করে বাঁধাবার ব্যবস্থা করে। তারপর স্ব-হস্তাক্ষরে ফটোর

উল্লেখ করে শহীদ কমরেড অমল নন্দী। শাসকশ্রেণীর ভাড়াটিয়া উগ্রপন্থীর গুলীতে নিহত। সেই ফটো একটা সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে অফিসের দেওয়ালে সন্দীপ টাঙ্গিয়ে দিল। ফুলের মালার আর ধূপের গন্ধে পবিত্রতায় অনুষ্ঠানটি ভরে ওঠে।

খোদ সেই সন্দীপ নিজেই এবার প্রাণ হারালো। হয়ে গেল শহীদ নম্বর তিনশ' আট। জেলকমিটি জরুরী সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিল—আজকের সভার অন্যান্য সমস্ত কর্মসূচী বাতিল। আজ হবে 'শহীদ সন্দীপ ব্যানার্জী স্মরণসভা' গণসঙ্গীত দিয়ে শুরু হল শহীদ সন্দীপ স্মরণসভা। অলোক খাস্তগীর গান গাইলো—'শহীদ তোমায় ভুলিনি মোরা, ভূলবে না সংগ্রামীজনতা'। সন্দীপের জীবনের কিছু টুকরো টুকরো স্মৃতি সঙ্গীতের মূর্ছনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ বিরাট হলঘর। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান। দেওয়ালের একদিকে পোষ্টার সাঁটা হয়েছে। বিরাট একটা ব্যানার। লাল নীল বিভিন্ন কালির সমন্বয়ে লেখা, "শহীদ সন্দীপ ব্যানার্জী সমেত সমস্ত শহীদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত আমরা করবোই।" আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের ধ্বনি শ্রদ্ধায় প্রকাশ। অলোক শুরু করে প্রথমে, পরে সকলে গলা মেলায়।

"জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।
শেষযুদ্ধ শুরু আজ কমরেড, এসো মোরা মিলি এক সাথ।
গাও ইণ্টার ন্যাশনাল মিলাবে মানবজাত।"

সঙ্গীত শেষে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত তুলে সকলে অভিবাদন জানায়।

চারদিন কেটে গেল। গ্রাম থেকে শ্যামলী এলো শ্যামলের সঙ্গে ইণ্টারভিউ করতে। তার মুখ থেকেই জানা গেল সন্দীপের হত্যাকাণ্ড নিয়ে থানায় এফ. আই. আর. হয়েছিল। কিন্তু যাদের সন্দেহ করা হয় এবং এফ. আই. আর.-এ নাম ছিল তাদের একজনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। সদরের পুলিশ 'পুলিশ ডগ' এনেছিল ঠিকই। কিন্তু তার স্বাভাবিক গতি বারংবার ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সন্দীপ হত্যায় উদাসপুর আর গুগলীগেড়ের জোতদারদের হাত ছিল প্রবল। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে একটা গুপ্ত মিটিং হয়। সেই মিটিংটা ডেকেছিল উদাসপুরের জোতদাররা। ঐ সভায় উপস্থিত ছিল সদরের একজন পুলিশকর্তা ডি. এস. পি. সুধীর মিত্র। জোতদাররা ঐ ডি. এস. পির কাছে দাবী করে—"সন্দীপকে যে করেই হ'ক শায়েস্তা করতেই হবে। ওর নেতৃত্বে গাঁয়ের ছোটোলোকগুলো আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গত

চাইছে। আমাদের ঘেরাও করছে। ওকে পি. ডি. আইনে আটক করা হ'ক।"

সুধীর মিত্তির উত্তরে বলেছিল—"পি. ডি. অ্যাক্ট আটক করলে ওতো আবার বেরিয়ে আসবে। তারচেয়ে আপনারা ওকে একবারে নিকেশ করে দিন। ঐ তো হ্যাংলা চেহারা!"

সত্যি সত্যি সন্দীপ রাত্রের অন্ধকারে নিকেশ হয়ে গেল। পৃথিবী থেকে চলে গেল। দীর্ঘ কয়েকমাইল শোকমিছিল, শবদেহ দাহ, তারপর সবশেষ। শ্যামলী জেলগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কমরেড সন্দীপের উদ্দেশ্যে লেখা একটা কবিতা সে নিজেই লিখেছে সেটা শ্যামলকে পড়িয়ে শোনাল। সন্দীপের কাছ থেকে তারিফ পেয়ে উৎসাহিত শ্যামলী বলে—শ্যামলদা, এই চারদিন আপনার কাছে আসতে কারুর সাহসই হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মাধ্রীদি আমাকে জোর করে পাঠালেন।

—যাক্‌গে, তুমি শ্যামলী মাঝে মাঝে এসে আমাকে তোমার দু-চারটে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে যেও। এখন আসি। অনেকক্ষণ কথা হচ্ছে। এবার সেন্ট্রি কিংবা ডেপুটি নির্ঘাত এগিয়ে আসবে। বলবে—"শ্যামলবাবু, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে এবার চলুন। তার থেকে আগে ভাগেই চলে যাই। গুডবাই।"

সন্ধ্যায় একনম্বর ওয়ার্ডে নতুন খবর এনেছে কোর্ট ফেরতা বন্দীরা। হাই-কোর্টে গতকাল তিন জনের কেশ শুভ হয়েছে। তার মধ্যে দুজন রিলিজ। আর শ্যামলের আটকাদেশ বহাল। শ্যামলকে পুরো মেয়াদ থাকতে হবে। যাক্‌, রিলিজ করে তাকে আর ভাবতে হবে না।

দেবব্রতবাবু কিন্তু আজও কারাগারে। প্রায় বছর ঘুরে যাচ্ছে। প্রতিদিন সকাল দশটার মধ্যে প্রভাতী সংবাদপত্র ওয়ার্ডে আসে। দেবব্রতবাবু ওয়ার্ডের যেখানেই থাকেন কাগজ এসে গেছে শুনতে পেলেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। যদি নতুন কোন খবর থাকে। এদিনের সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন, আকুল। জানাল তাঁর অঞ্চলের জনপ্রিয় সংগঠক, কর্মী। সংসারের চরম দারিদ্র, তবু অক্লান্ত পরিশ্রমী। সেই জয়নালের নিহত হবার সংবাদ বেরিয়েছে। গাঁয়ের পাশে বড খালটার ধারের ধান জমিতে পাওয়া গেছে তার ক্ষত-বিক্ষত লাশ।

গ্রাম থেকে পরদিন এক কৃষক জেল গেটে দেবব্রতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্ণনা দিয়ে গেল জয়নালের নিহত হবার অনুপূর্বিক বিবরণ। বীভৎস লাশটা পুলিশ হেফাজত থেকে হাসপাতালে পোষ্টমর্টমে যায় তারপর নিশ্চিহ্ন কবরে আশ্রয় পায়। পরদিন রাত্রের শোকসভায় মণি সেন মন্তব্য করলেন—শ্যামলদের এলাকায়

যেসব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে তার প্রতিরোধ করার কোন উপায় বের না হলে ওদের বছরে প্রতিদিনই এরপর শোকসভা করতে হবে।

শোকসভায় দেবব্রত বসু বর্ণনা করলেন জয়নাল হত্যার কাহিনী। অবশ্য সবটাই তাঁর শোনা বিশ্বস্ত সূত্রে। জয়নাল ঘটনার এক দিন আগে ফিরছিল নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাড়ি থেকে। নিকটবর্তী ষ্টেশন থেকে জংশনে তাকে অনুসরণ করতে থাকে মান্টি ও মণ্টু ও আরও জন চারেক। ওরা চিনতো জয়নালকে বহু আগে থেকেই। কয়েকটা ষ্টেশন পার হওয়ার পর গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি গাড়ী এলে ওরা তাকে গাড়ীর মধ্যেই প্রায় ঘিরে ফেলে, চুপ করে বসে থাকে।

ওদের আশপাশে দেখেই জয়নাল ভয়ে শুকিয়ে গেছলো। তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। মান্টি তার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে—অ্যাই যে, লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় বেড়ানো হচ্ছে, এদিকে আমরা যে চারদিক তোলপাড় করে ফেল্লাম আপনার জন্যে। দয়া করে আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

জয়নাল কোনক্রমে জানতে চাইলো কোথায়?

—ডাক্তার পুরে।

—কেন? কেন যাবো? আমি নামবো—

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মান্টি বলে—যাবো কেন? না গেলে টের পাবেন?

তাকে বাধা দিয়ে মণ্টু বলে—আপনাকে আমরা আমাদের 'নিউ ফ্যাসান ক্লাব'-এ নিয়ে যাবো।

জয়নালের গা দিয়ে প্রবল ঘাম ঝরছিল। সে যদি একটু চীৎকার করতো ট্রেনের পর বাসের মধ্যেও কেউ না কেউ তার পক্ষে হয়তো এগিয়ে আসতো। কিন্তু তা সে করলোই না, উল্টে ভয়েই কাঠ। ওরা জয়নালকে বাস থেকে ইঙ্গিতে 'নিউ ফ্যাসান ক্লাবে'র সামনে নামতে বাধ্য করলো। বাসেই জয়নালকে দেখতে পায় তার গ্রামবাসী। যে কজন যুবক তাকে প্রায় ঘিরে রেখেছিল তাদেরও লক্ষ্য করে। ওরা প্রত্যেকে মানুষ খুন করে, এও জানা। গ্রামবাসীটি ইসারা করে। তার সঙ্গে নেমে পড়তে বলে। জয়নাল যখন নামতে পারলো না। অথবা সাহস করলো না। তখন সে সমূহ বিপদ বুঝে তার স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বলে। তিন মাসের একটি শিশু সন্তান তখন তার কোলে। মায়ের স্তন নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করছে।

'নিউ ফ্যাসান ক্লাব'-এর সামনে বাস থামলো। মণ্টু, মান্টি দলবলসহ জয়নালের পিছনে পিছনে নামলো। বাস ষ্টপেজ ছেড়ে ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চলে গেল। জয়নালকে

ক্লাবের মেম্বররা ঘিরে ধরলো। ওর চোখদুটো অতি দ্রুত বেঁধে ফেললো কালো ফালি কাপড়ে। বুকের সামনে একজন এসে উঁচিয়ে ধরলো রিভলবার। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় টেনে নিয়ে গেল ক্লাব ঘরে।

বিরাট দোতালা বাড়ি। পুরোটাই 'নিউ ফ্যাসান ক্লাব'-এর দখলে। বাইরে ক্লাবের নাম উল্লেখ করে তিন রঙা একটা সাইনবোর্ড। ছোট বড় মাঝারী ধরনের অনেক কঠা ঘর। জয়নালকে একটা ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা বন্ধ করে দিল। এরপর নিজেরা বসলো মন্ত্রণা সভায়।

মন্ত্রণা সভার অধিপতি বাবুল সভার প্রস্তাব করে—আগে জয়নালের জীবদ্দশায় কত অপরাধ করেছে তার একটা লিষ্টি তৈরী করা হ'ক। গুছিয়ে লিষ্টি তৈরী করতে বসল মান্টি। মান্টি বলল—ওর অপরাধের লিষ্টি আমি লিখছি। তোমরা যে যা জানো ওর সম্বন্ধে বলে যাও। শালাকে……। বলে থেমে গেল, কলম কাগজে মুখ নিচু করে বসলো।

দেখা গেল অপরাধের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। যেমন এক নম্বর পপুলার ফ্রন্ট সরকারের আমলে জয়নালের উস্কানীতে ছোটলোকগুলো মাথায় চড়েছিল। বারে বারে ক্ষেতমজুর ধর্মঘট হয়েছে তার মজুরী বেড়েছে। আগে গাঁয়ে শুধু এক-টাকা মজুরী ছিল। এখন সেটা ধর্মঘট করে করে দাঁড়িয়েছে সাড়ে বারোশ' গ্রাম চাল আর পাঁচসিকা নগদ। এটা দিতে সকলে বাধ্য। না দিলেই তার জনমজুর বয়কট। পপুলার সরকার চলে গেল। কিন্তু ধর্মঘটের ঢেউ থামলো না। বরং জয়নালের নেতৃত্বে কোন কোন গ্রামে আরও গেল বেড়ে।

দুনম্বর—গ্রামে গ্রামে ওরা ধর্মগোলা করেছিল। এ অধিকার একমাত্র গ্রামের ভদ্রলোকেদের। খাস জমির ধান কাটা আর তার একটা অংশ ঐ গোলায় জমা রাখা। অভাবের সময় নাকি গরীবদের দেওয়া হবে। ভণ্ডামী।

তিননম্বর—গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি ওদের কাজ। ছোটোলোক ইতরদের কাঁধে লাঠি, হাতে বর্শা, বল্লম, তীরধনুক। সাঁওতাল ছোটোলোকগুলোকে নিয়ে মিছিল করা। স্লোগান দেয়—জমিদারদের বেনামা জমি ছিনিয়ে নাও, বিলিয়ে দাও। মজুতদারের মজুত ধান ছিনিয়ে নাও। বিলিয়ে দাও। এমন সব হাড়-কাঁপানো কথা। একটা অশ্লীল খিস্তি আউড়ে একজন বলে উঠলো—যেন বাপের সম্পত্তি।

চারনম্বর—ডাকাত আর গুণ্ডাদের দল তৈরী করে নাম দিয়েছিল 'ভলেন্টিয়ার দল' ওরা ডাকাত আর গুণ্ডা। ওদের ভয়ে 'ভদ্রলোকের মেয়েরা' রাত্রে একা বের

হতে পারতো না। শেষে হতো লুটের মাল। একজন পাশ থেকে মন্তব্য করে—এখন অবশ্য সে অবস্থা আর নেই।

পাঁচনম্বর—ওরা ওদের দলের মেয়ে কর্মীদের একসঙ্গে সবাই ভোগ করে। মেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে মিছিল মিটিং করে। মান্টি জিভ কেটে বলে—ইস।

ছয়নম্বর—দেবুমাস্টার এই ইস্কুলের মাস্টার নয়, ডাকাত আর গুণ্ডাদলের সর্দার। তাকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসে তখন জয়নাল বিরাট দলবল নিয়ে বাধা দিয়েছিল। তাতে একজন পুলিশ অফিসার যেমন জখম হয়েছিল তেমনি গ্রামের দুজন জাতীয়তাবাদী কর্মীও ঘায়েল হয়।

সাতনম্বর—জয়নাল গোটা অঞ্চলে 'কৃষক সমিতি' গঠন করার নাম করে চোর-চোট্টাদের নিয়ে মিটিং করে বেড়ায়। ওদের নিয়ে একমাত্র কাজ লুঠতরাজ করা। জোর করে বাড়ি বাড়ি প্রত্যেকের কাছ থেকে পঁচিশ পয়সা তোলা আদায় করা হয়।

আটনম্বর—'কৃষক সমিতি'র জন্যেই আমরা জাতীয়তাবাদী দল গড়ে তুলতে পারছি না সব গরীব-গুরবোরা ওদের দিকে চলে যাচ্ছে। এসব হচ্ছে লোভের বশে। আমরা সারা জীবন স্বার্থত্যাগ করছি, জীবন সর্বস্ব পণ করছি। তবু চোর-চোট্টাদের দিকে ওরা চলে যাচ্ছে। এটা দেশের উন্নতির পরিপন্থী।

নয়নম্বর—আমরা যাদের এতোকাল 'জোতদার' বলতাম, ওরা তাদের 'বর্গাদার' বলতে শুরু করেছে। ভূয়া বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করিয়ে দিচ্ছে। এ অঞ্চলে কোন বর্গাদার ছিল না। অথচ পাঁচশ' বর্গাদারের নাম দেখা যাচ্ছে।

জয়নালের বিরুদ্ধে অভিযোগ এর পরও কেউ কেউ যোগ করতে চায়। অভি-যোগের বন্যায় যে লিখছিল সে কলম ত্যাগ করে। তার হস্তলিপি খুবই খারাপ, দ্রুত লেখাও তারপক্ষে একরকম অসম্ভব। রাগ করে সে উঠে পড়ে। শেষে স্থির হল এই অপরাধের তালিকাই যথেষ্ট। এসবের ওপরই একটা রায় দেওয়া হ'ক। দেরী করা অশুভ হতে পারে। রায় কে দেবে? সর্বসম্মত চীৎকার—'হিরু।' হিরু হচ্ছে বাবুলেরই দাদা। রায় দানকারী 'বিচারকে'র চেয়ারে তিনি উপবেশন করলেন। সবাই বেশ প্রস্তুত। এবার রায়দানের পালা। বিচারকের সামনে টেবিলে রক্ষিত একটি ছোট হাতলাঠি। ওটা 'ন্যায়দণ্ড'। বিচারক 'নিরপেক্ষ'। ন্যায় দণ্ডটি নিয়ে দুবার টেবিলে ঘা মারতেই সান্ত্রী গিয়ে সেলাম ঠুকলো। সান্ত্রী আর কেউ নয় ও 'ইমান'। ষোল সতরো বছরের যুবক। পরনে বেলবটস্ প্যান্ট, গেঞ্জী আর চটি। রোগা চেহারা, গায়ের রঙ কালো।

ঘোঁত ঘোঁত করে বিচারক হুকুম করে—আসামীটাকে আমার সম্মুখে নিয়ে এস।

আমি ওর অপরাধের রায় দেবো। তোমরা সবাই মন দিয়ে শুনবে। বলে সভাস্থ সকলের পাশেই একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ বাঁধা, হাত দুটো পিছমোড়া বাঁধা জয়নালকে ঠেলতে ঠেলতে 'বিচারকে'র সামনে হাজির করা হল। 'বিচারকের' গম্ভীর গলা থেকে ভেসে এলো—অ্যাই, ওর চোখ খুলে দে।

চোখের কাপড় টান করে বাঁধা ছিল। কাপড় খুলেদিতেই জয়নাল মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যায়। হৈ হৈ করে তুলে ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। কে একজন যুবক ছুটে এসে তার পেটে লাথি মেরে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

এবার 'বিচারক' মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে বলতে শুরু করে—ওহে বুকনিবাজ, লম্পট, ডাকাত, খুনী। আমার দিকে তাকাও। বেশ। ঐ ঘরটায় যাঁরা উপবিষ্ট রয়েছেন তাদের সকলের দিকে তাকাও, তোমাব শ্রীমুখ ওঁরা দর্শন করে ধন্য হন। বেশ। এখন হাত জোড করে দাঁড়িয়ে থাকো। জয়নালের দৃষ্টিতে পড়ে ইমান। ওদের সিলিং-এর বাইরে জমি আছে। সেই জমি সরকারে বর্তায়। খাস হলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিলী হয়। ইমান বাধা দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কাজ হয়নি। বসে রয়েছে গোরাচাঁদ। গতবছর সারা গ্রামে যখন মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে মজুর ধর্মঘট হয়েছিল, তখন মিথ্যা লাঙ্গল চুরীর দায়ে ওরই বাড়ির দুজন নাগাড়ে কিষাণকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

এক কোণে বসে রয়েছে গোবিন্দলাল। কলেজে পড়ার সময় খুব সোস্যাল ফাংশান নিয়ে থাকতো গান বাজনা করতো। হঠাৎ 'নকশাল' হয়ে গেল। 'হিরো' 'হিরো' চেহারা। গ্রামের বাগ্‌দীদের একটা মেয়ে নিয়ে কিছু কাল বেপাত্তা। মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবার একাই গ্রাম ছেড়ে পালালো। আরও দু-চারজন এমন ব্যক্তি উপস্থিত যারা খুবই পরিচিত এবং বিপদের সময় ওর সাহায্য চেয়েছিল, উপকারও করেছিল। একজনকে তো একসময় ঘাড়ে ঝাণ্ডা বইতেও দেখেছে। এর মতো অকৃতজ্ঞও। ইচ্ছে হচ্ছিল এদের বেইমানির কথা উচ্চকণ্ঠে একবার সে বলে। কি হবে বলে পরক্ষণেই ভাবে। এখুনি তো তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হবে অথবা বুকে পেটে গুলী ঢুকবে আর না হলে ওব্যর্থ ছোরার আঘাত। চিন্তায় ওর মাথাটা ঘুরে গেল।

ঘরটার এককোণে ঐতো সব তো অস্ত্র সাজানো। ভোজালি, পাইপগান, রিভলবার থেকে লাঠিসোটা সবই আছে। বোমাবারুদ আছে। ষ্টেনগান।

এল. এম. জি. কিছুই বাদ নেই। এসবের নাম জয়নালের জানা নেই। ওর চোখে ওগুলো পড়তেই ঘরে উঠলো হাসির ফোয়ারা। অট্টহাসি। মান্টি জয়নালের গা ঘেঁসে ঘাড কাত করে উপহাসচ্ছলে বললো—দেখছো তো সব। এগুনি তোমার কলজে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। তোমার মতো ডাকাতদের হত্যা করে আমরা এবার সমাজতন্ত্র আনবো। রোসো বাছাধন।

'বিচারক' হিরু এসময় টেবিলে প্রবল জোরে একটা ঘুসি মারলো। ঘরটা যেন কেঁপে উঠলো। 'বিচারক' বলে—"শোন্ ডাকাত, তোর অপরাধগুলোর একটা তালিকা পড়ে শোনাচ্ছি।" নয় দফা অভিযোগ পড়ে শোনানো হল। তারপর চোখ পাকিয়ে বললো—তোর এবার কঠোর সাজা হবে। কিছু বলার আছে।

অবিচলিত জয়নাল একটু না কেঁপে উত্তর দেয়—এসব অভিযোগ মিথ্যা, মজুররা যে সংঘাত করে তাতে চোর গুণ্ডারা আসে না। আমাদের সংগঠনের দ্বারা উপকৃত হয়েছে এমন অনেকেই এখানে আছেন দেখছি। তাঁরাই বলুন। আমার আর এছাড়া কিছু বলে লাভ কি? যা হবার তা হ'ক। জয়নালকে বাধা দিয়ে বাবুল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—যাক্ যাক্ ওসব জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই। দাদা তাড়াতাড়ি রায়টা শুনিয়ে দে। ধানাই পানাই এর কি দরকার?

'বিচারক' হিরু কিন্তু আরও কিছুটা দেরী করতে চায়। জয়নালের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে—এতোদিন বাবু কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে? ধরা দাওনি কেন?

—এমনি।

—মণ্টু। এমনি? আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেডাবো আর উনি লুকিয়ে থাকবেন। এরপর বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—শালা পুলিশ হতচ্ছাড়ারা কিস্সু করে না। খালি টাকা খাওয়ার রাজা। তার থেকে আমরা ওদের থেকে এসব ব্যাপারে, সবদিক দিয়েই 'একসপার্ট'। ইনফরমারের কাজ থেকে জবাই করা পর্যন্ত এসব ব্যাপারে আমাদের যা খাটতে হয় তাতে দেশে পুলিশের দরকারই পড়ে না। ঐ টাকাটা বরং আমাদের দেওয়া হলে কাজ আরও ভালো হতো।

বাধাদিয়ে হিরু বলে—কেন তোমরা তো মাসে মাসে একশ পাঁচটাকা পাও। এরপর জয়নালের দিকে তাকিয়ে বলে—কি জয়নাল, একবার বলো 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আমরা সবাই শুনি। বলো। জয়নাল নিরুত্তর।

এরমধ্যে একজন যুবক ছুটে এসে হঠাৎ জয়নালের গলাটা জোরে টিপে ধরে। জয়নালের জিভ বেরিয়ে পড়ে। হিরু চোখ পাকাতেই যুবকটি আবার স্বস্থানে গিয়ে বসে পড়ে।

এবার রায় দেবার পালা। হিরু চেয়ারে বেশ গুছিয়ে বসে। কণ্ঠস্বরে রায় পাঠ শুরু হয়। রায় হল—খুনী ডাকাত জয়নালের মৃত্যুদণ্ড। এই ঘরের মধ্যেই সকলের সাক্ষাতে রায়দান কার্যকরী হবে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পাঁঠা কাটা করা হ'ক। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালি। থর থর করে কেঁপে উঠলো জয়নালের দেহ। ওর এখন শেষমুহূর্ত।

দুজন উৎসাহী যুবক এগিয়ে এল। ওদের একজনের ডান পাটা আবার খোঁড়া। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে গিয়ে ঘাড় ধরে জয়নালকে ঘরটার মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।

এরপরের আদেশ—ওপর দিকে তাকাও। হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল। হাতদুটো একজন ধরে ওপরে তুলে ধরে বললো—এইভাবে দাঁড়া। একজন তার পরণের পোষাকে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে সব ছিঁড়ে ফালা ফালা করে মাটিতে ফেলে দিল। পরণে ছিল পাজামা। কোমরের দড়ি আর কোমরের ফাঁকে ভোজালির কোণা প্রবেশ করাতেই কেটে গেল। কয়েকজন উল্লাসে নর্তনকুর্দন করতে থাকে। একজন ইমানের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো—"অ্যাই, যেন এক কোপে সাবাড় করবি না।" বলেই পিছিয়ে গিয়ে আবার নাচতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে মণ্টু আর মান্টি প্রত্যেকের হাতে একটা গেলাস আর 'লাল জল' ধরিয়ে দেয়। ঘরময় স্ফূর্তির জোয়ার। একে অপরের গলা জড়াজড়ি করে। কেউ বা কোমর জড়িয়ে ধরে বল-নৃত্যের কায়দা রপ্ত করতে থাকে। একজন একটা গ্লাস হাতে উঠে পড়লো বিচারকের টেবিলে। তার ওপর দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে চলে হিন্দী গান। হঠাৎ সকলেই একবার বিবস্ত্র হয়ে গেল আবার পোষাক তুলে নেয়। মণ্টু দৌড়ে গিয়ে মুক্তিসূর্যের বাঁধানো ফটোয় একবার মাথা ঠুকে আসে। ঘুরে এসেই চীৎকার করে ওঠে—কৃষক তুমি ধ্বনি তোল 'বন্দেমাতরম্'। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে 'বন্দেমাতরম্'। স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় হিরু বলে—হ্যাঁ, সকলে আজ 'মাতাজীকে' বন্দনা কর। তিনিতো আমাদের প্রেরণাদাত্রী। তারপর হাতদুটো জড়ো করে ঊর্ধ্বে তুলে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলে ওঠে—"মা মাগো তুমি যেখানেই থাকো, সে তুমি দিল্লিতেই থাকো আর আসামেই থাকো, মহারাষ্ট্রেই থাকো, আর জামসেদপুরেই থাকো, যেখানেই থাকো, আমাদের গৈরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো মা। আমি যে বিচারক। মা, যদি রায়দানে কোন অপরাধ হয়ে থাকে নিজগুণে ক্ষমা করো। যা করছি আমরা মাগো তাতো তোমার হাত শক্ত করার জন্যই করছি। সমাজতন্ত্র দেশে আমরা আনবোই মা। আমরা তোমার

স্তান।" তারপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে—অ্যাই, কাজ আরম্ভের াগে সবাই শেষবারের মতো বলো—'মাতাজীকি জয়'। মাতাজীর জয় ধ্বনিতে াকা বাড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো।

এবার রায় কার্যকরী করা শুরু হ'ল। জয়নালের মুখের মধ্যে পুনরায় াপড় গুঁজে দেওয়া হ'ল। মাটিতে ফেলে দেওয়ার জন্য পিছন থেকে লাথি মারা 'ল। পড়লো আছড়ে। চীৎকরে দেওয়া হ'ল। হাতদুটো ভোজালির আঘাতে বচ্ছিন্ন হয়ে রক্ত ছুটছে। দু-একজন চেপে ধরলো আবার। একজন ধারালো ছুরি নয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো লিঙ্গটা, অণ্ডকোষ। আর একজন নুন ছিটিয়ে দতে থাকে। একজন এসে পা দুটো কোপ দিয়ে সরে গেল। এতে জয়নাল শষ হয়েছে কিনা দেখার জন্য হিরু নেমে এলো চেয়ার ছেড়ে। নাকের কাছে াতটা এগিয়ে দিয়ে বলে—"না, মনে হচ্ছে শেষ হয়নি। শালা কি প্রাণ রে াবা।"

মাণ্টি আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। একটা চকচকে ভোজালি নিয়ে দৌড়ে এসে জয়নালের পেটে আমূল বসিয়ে দিল। ব্যস্, এবার শেষ। সরশেষে ইমান এসে গর্দানটা কেটে দিল।'

মণ্টু একটা বস্তা নিয়ে এল। তার মধ্যে পুরে ফেলা হলো খণ্ড-বিখণ্ড লাশ। গাছের ধান খেতে পড়ে রইলো সেই বস্তা। রাত্রে কুকুরে শৃগালে টানাটানি করতে থাকে।

জয়নাল সাহেবের স্ত্রী ফিরোজা পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত গভীর হয়ে যায়। কোন সন্ধান নেই। গ্রামে কেউ এমন নেই যে তাকে কিছু পরামর্শ দেয়। নেই মালিনী, নেই সরোজ, কান্তি কেউ নেই। এদিকে দেবব্রতবাবু তো জেলে। অনাহার আর অনিদ্রায় কেটে গেল সারারাত। রাত গড়িয়ে সকাল, সকাল থেকে দুপুর। পাড়ায় এক যুবকের কাছ হতে কিছু খবর শুনে পাগলিনীর মতো ছুটে গেল খালের ধারে। যুবকটিও পিছু ছাড়ে না। সেও হাজির। একটা পুলিশ ভ্যানে তখন খণ্ডিত লাশটা তোলা হচ্ছে। দেখেই চিনতে পারে ফিরোজা। এসে তার বাল্যকালের সাথি, যৌবনে স্বামী জয়নাল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান ফিরোজা।

একজন পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করে আপনারা ?

যুবকটি প্রথমে উত্তর দেয়—"ইনি ওঁর স্ত্রী। আমি একজন আত্মীয়।" শুনে পুলিশ অফিসারটি সম্পূর্ণ নীরব। গাড়ীর চালক গাড়ী ষ্টার্ট দিতে গেলে বাধা দিয়ে

অফিসারটি বলে—দাঁড়াও। এখন ষ্টার্ট দিও না। একটু দেরী করো।

যুবকটি প্রশ্ন করে—আপনারা লাশ কোথায় নিয়ে যাবেন?

—প্রথমে থানায় সেখান থেকে হাসপাতালে। নিয়ম মতো একবার পোষ্টমর্টেম হবে।

—এর আর কী পোষ্টমর্টেম করবেন?

—নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে।

—উনি কখন ওঁর স্বামীকে পাবেন। গোর দিতে হবে তো!

—আপনারা আমাদের সঙ্গে চলুন, যত তাড়াতাড়ি পারি লাশ আপনাদের হাতে তুলে দেবো। আমি আপনাদের সাহায্য করবো।

যুবকটি বলে—ধন্যবাদ। একটু সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করুন। জয়নাল সাহেবের স্ত্রীর জ্ঞান ফেরাতে একটু সাহায্য চাই আপনাদের।

অফিসার—কি সাহায্য করতে পারি বলুন।

—একটা জল আনার পাত্র পেলে ভালো হয়।

একটা জলের পাত্র ভ্যানেই মিললো। পুলিশ অফিসারটি বললো—আপনি দাঁড়ান, আমিই খাল থেকে জল এনে দিচ্ছি। আপনি বরং মহিলাটিকে কোনো-ভাবে হাওয়া করুন।

কিছু পরে ভ্যান সকলকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেইদিনই গভীর রাত্রে চুপিসারে জয়নাল সাহেবের মরদেহ শ্রমিক শ্রেণীর রক্তে রঞ্জিত পতাকা দিয়ে মুড়ে সমাহিত করা হ'ল।

হাউসে এসব কাহিনী শুনে সকলেই বিচলিত, উদ্বিগ্ন। রাত্রী গভীর হলে শ্যামল মণি সেনের কাছে গিয়ে বসে। মণিবাবু বল্লেন—কিছু বলতে চাও শ্যামল?

—হ্যাঁ মণিদা, আপনি আমাদের নেতা আমাদের সক্রিয় কর্মীরা এভাবে একের পর এক খুন হয়ে যাচ্ছে। শুনলেন তো জয়নাল সাহেবের নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী। এর আগে শেষ হয়েছে সন্দীপ। কিছু ভাবছেন এসব নিয়ে।

—কি আর ভাববো। চার দেওয়ালে আটক আছি সংগঠন যেমন করে এনেছো তেমন তো ফল হচ্ছে। কেবলই লোকসভা পালন করতে হবে তোমাদের। এ আমি বলে দিচ্ছি।

—তার জন্য একতলার কর্মী, নিচতলার কর্মীরাই দায়ী?

কোর্টফেরতা বন্দীদের হাত দিয়ে একটা চিরকুট এসেছে দেবব্রতর কাছে। পাঠ শেষ হলে স্তম্ভিত দেবব্রত। মনে হচ্ছে কে যেন তাকে বোবা বানিয়ে দিল।

বালবিধবা সেই কৃষক রমণী মালিনীর সর্বনাশ ঘটে গেছে? রাত্রির অন্ধকারে মালিনী ধর্ষিতা! মালিনী অনূর্ধ্ব তিরিশ, অটুট স্বাস্থ্য, পূর্ণযৌবনা। গুপ্তঘাতের অস্ত্রের আঘাতে ছিনিয়ে নিয়ে গেছলো তার স্বামীকে। সেও এক বীভৎস কাহিনী। গতপরশু রাত্রে গাঁয়ের বড়জোতদার ভুবন পালের মস্তান প্রকৃতির ছেলেটা আর তার তিন সাকরেদের 'গ্যাং রেপ'। বিধবা যুবতী ফুলের মতো নিষ্পাপ মালিনীর ইজ্জত ধূলায় লুণ্ঠিত। লজ্জায় অপমানে গতকালই মালিনী নাকি গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় যে গেছে কেউ তার হদিস দিতে পারছে না।

সেদিন মাঠ থেকে ফিরে মালিনী উঠোনে কাঠের উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে নিচ্ছিল। ঠিক এমনি সময়ে ভুবন পালের ষণ্ডামার্কা ছেলে গুণ্ডা মিহির সঙ্গে তিন ইয়ারকে নিয়ে মুখোশ পরে টলতে টলতে এসে মালিনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। মালিনীকে জড়িয়ে ধরতে যায়। আতঙ্কিত মালিনী ঘরে ঢুকে পড়ে। ওরাও সে ঘরে ঢোকে। মালিনীর মুখের দিকে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে ধরে নিজেকে মালিনী। আত্মরক্ষার কোন উপায় শেষ পর্যন্ত না দেখে মালিনী এক দৌড়ে উঠোনে নেমে হাঁড়ির গরম ভাতে ডোবানো হাতাটা তুলে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ে। রুদ্রমূর্তি মালিনী চোখ পাকিয়ে চীৎকার করে বলে—যদি আর একপা এগিয়েছিস তোরা তাহলে আর রক্ষে পাবি না। শীগগীর পালা। নইলে দেখেছিস্ বলে হাতাটা তুলে ওদের দেখায়, যে এটা তাহলে ছুঁড়ে মারবো। ভুবন পালের ছেলে মিহির সদলে হো হো করে হেসে ওঠে। চব্বিশ বছরের মিহিরকে দেখতে বন্য জন্তুর মতো। যেমন কালো কুচকুচে। তেমনি গালপাট্টা আর বাহারে চুলের রাশি। মদের নেশায় চোখদুটো একেবারে গোলাপের মতো লাল। একপাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওরপক্ষে একেবারে অসম্ভব। টলতে টলতে গলার স্বর বিকৃত করে বলে—"মালিনী যে তেড়ে আসছো। তোমাকে তো আমি মাইরীদিদি। কত ভালবাসি। ওরে বাবা। আবার তেড়ে আসছো। কামড়াবে নাকি।"

মালিনীর চার বছরের শিশু কুসুম ঘুমে অকাতর। মিহির ওকে জোর করে টেনে তুলে মুখোশ দেখে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। ভয়ে প্রবল বেগে হাত পা ছুঁড়তে থাকে। মস্তানদের মধ্যে একজন ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরে কুসুমকে। সে পড়ে যায় মাটিতে, তাড়াতাড়ি ওর মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে শিশুর হাত পা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে। অস্থির মালিনী হাতাটা ফেলে দিয়ে জানলার একটা লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় ওদের ওপর। দেওয়ালে টান টান

করে দাঁড়িয়ে গেছে মিহির। মালিনী রডটা ছুঁড়তে যাবে কি পিছন থেকে আরেক-জন মস্তান জোর করে ওকে ঝাপটে ধরে রডটা নিল কেড়ে। ওরা চারজনে একজায়গায় জড়ো হল। মালিনীও আলু থালু বেশে একজায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। প্রবল বেগে নিঃশ্বাস পড়ছে। সারাশরীর থরথর করে কাঁপছে।

দেহের শিরা উপশিরা উঠেছে ফুলে। চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে পডছে আগুন। আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলোর হাত থেকে নিজেকে কি ভাবে বাঁচানো যায় এই চিন্তায় সে পাগলিনী প্রায়। সামনে বাঁশের খুঁটিতে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় মুখে রুমাল চাপা শিশু সন্তানের বোবা কান্না। কুসুমকে ওরা কি মেরে ফেলবে। কুসুম যে নড়চড়া করতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক। আচমকা মিহির লোহার রডটা মালিনীর দিকে ছুঁড়ে মারে। পায়ের উরুতে প্রবলবেগে আঘাত করতেই মাটিতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল মালিনী। এরপর স্বাভাবিক যা ঘটার তা ঘটলো। মালিনীরও হাত-পা বাঁধা হল, মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হল। তারপর শুরু হল জঘন্য কীর্তি। একে একে তার দেহের প্রত্যেকটি পোষাক টেনে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতে থাকলো। নগ্নদেহের ওপর বসে মিহির দাঁতমুখ পশুর মতো খিঁচিয়ে সমানে বলে চলে—নে, এবার ইন্‌কিলাব বল্‌। দেখি তোর গলার কত জোর। হাত তুলে চেঁচা। অচৈতন্য মালিনী। শুধু বোধহয় মরতে বাকী হাত-পা টান টান করে আছে। মনে হচ্ছে যেন প্রতিরোধ করতে চায়। কিন্তু হায়! তার ক্ষমতা আজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুরু হল একেরপর এক ধর্ষণের পালা। কামনার আগুনে পুড়ে গেল পবিত্র দেহটা। সারা মেঝেটা রক্তে ভেসে যায়। রাত্রের অন্ধকারেই ওরা মিলিয়ে গেলো।

সকাল হয়। কাককোকিল ডাকে। সরোজ এসেছিল মালিনীর কাছে এদিন পার্টি মিটিংয়ের খবর দিতে। আচমকা চোখ পড়ল রক্তাক্ত বিবস্ত্রা অর্ধ অচৈতন্য মালিনী আর রজ্জুবদ্ধ মুখবন্ধ শিশুপুত্রকে। চীৎকার করে ওঠে সরোজ—"একি, কে করল এমন অবস্থা!" একটা কাপড় দিয়ে মালিনীকে ঢাকা দেয়। দড়ি কেটে দেয়, কুসুম ছাড়া পেয়ে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। ধীরে ধীরে মালিনী চোখ খোলে। পাখার হাওয়া ও চোখে মুখে জলের আছাড়ে মালিনী খানিক সুস্থ হলে আরম্ভ করে কাহিনী বলার পালা। সরোজের মনে আগুন জ্বলে। শরীরের রক্ত মানুষ খুন করার জন্যে টগবগিয়ে ফুটে ওঠে। পাখার হাওয়া করতে করতে আপনমনে যেন নিজে নিজেই বলতে থাকে—হায়, স্বাধীনতা! গোটা জাতিটা কি শেষপর্যন্ত পঙ্গু হয়ে গেল! ফ্যাসিষ্টরা কি এর থেকেও নিষ্ঠুর ছিলো? মালিনীকে পরামর্শ দেয়—

তুমি শীগগীরই বীরু ডাক্তারের কাছে গিয়ে সবকথা খুলে বলো। ভালো চিকিৎসা হ'ক। বীরুডাক্তার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। উনি আমাদের বিপদে সর্বদাই এগিয়ে এসেছেন। তোমার এ অবস্থার জন্য যারা দায়ী তারা হয়তো কালই এশিয়ার মুক্তি সূর্যের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সমাজতন্ত্রের দাবী জানিয়ে পথে তিনরঙা ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। নিজেদের অপরাধ ঢাকা দিতে চাইবে এইভাবেই। মস্তানীর যুগে মেয়েরা পশুর লালসা মেটাবে, হয়তো মস্তানের সন্তানও পেটে ধরতে হবে। তোমার এই অবস্থার জন্যে তো আর তুমি দায়ী নও। তুমি হয়তো নিজেকে অপরাধী ভাবছো, তাই এই কথাগুলো বল্লাম। মালিনী, শাসনক্ষমতায় আজ যারা আছে তাদের কাছে তোমার নারীত্বের কোন মূল্য নেই। কেঁদে কোন ফল হবে না। তোমাদের কান্নার আগুনে একদিন ওরা পুড়ে মরবেই। সেদিন আর দেরী নেই মালিনী। তুমি কেঁদো না, চুপ করো। বড়লোকের রাজত্বের অবসান না হলে এমনটি চলতেই থাকবে। জানি না, দেবব্রত এসব জেলে বসে শুনলে কি করবে? যাও, এখন তুমি স্নান করে পরিষ্কার হয়ে এসো।

সরোজের কথায় বাধা দিয়ে মালিনী বলে—না না সরোজদা, এসব ঘটনা ঘুনাক্ষরেও যেন দেবব্রতদার কাছে না পৌঁছায়। উনি তাহলে জেলের মধ্যেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে বসবেন। আমি আর এ গাঁয়ে থাকবো না। আমি যে মস্তানদের উচ্ছিষ্ট।

বাধা দিয়ে সরোজ বলে—এসব কি বলছো মালিনী। নিজেকে নিজে অতো খাটো কোরো না। গাঁয়ের সকলেইতো আর জানোয়ার হয়ে যায়নি। এখনও নিশ্চয়ই কিছু মানুষ রয়েছে যারা এই ঘটনা শুনলে—

—জানি, শুনলে একজনও ওদের কাছে ঘেঁসবে না। ওরা 'বাহাদুর' হয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। বলবে—মালিনীর বারোটা বাজিয়েছি। আর বিধবা মেয়েমানুষ আছে নাকি!

—না, না মালিনী। তোমরা আমরা অর্থাৎ মেয়েরা পুরুষরা সবাই মিলে আমরা এর একদিন প্রতিশোধ নেবো। মেয়েদের এভাবে সর্বনাশ ঘটতে দিলে সত্যিই গোটা সমাজের অগ্রগতি ঘটাতো দূরের কথা, পঙ্গু হয়ে পড়বে। তুমি দলের নেত্রী। তোমাকে আমরা চোখের মণি করে রাখবো। পশুরা তোমায় 'হত্যা' করতে চাইলে মানুষে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। এ আমি বলে গেলাম। মান্নানও এইসময় গাঁয়ে নেই। সে থাকলে এতক্ষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে যেতো।

মালিনী সরোজকে চলে যেতে দেখে পিছু ডেকে বলে—সরোজদা একটা কথা

বলা দরকার। আপনারা মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের দলে টানতে পারছেন না কেন একটু কি তলিয়ে দেখবেন। ঐসব ঘর থেকেই বা কেন মস্তানদের আর্বিভাব ঘটেছে। জন্মেই তো ওরা মস্তান হয় না। কেন ঐসব ঘরের ছেলেরাই আজ ফ্যাসিষ্টদের দোসর। সরোজ বলে—"আজ আর কোন আলোচনা এ সম্পর্কে না করাই ভালো। অন্যদিন করা যাবে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তুমি আগে সুস্থ হয়ে নাও, তারপর বীরু ডাক্তারের কাছে যাও। আমি চলি।" বলে প্রস্থান করলো সরোজ।

সেইদিনই মালিনী পোপনে বীরু ডাক্তারের কাছে যায়। ঘটনা সব খুলে বলে। বীরু ডাক্তার ওষুধ দিলেন যাতে মালিনীর দেহে ধর্ষণের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। সারা শরীরে খামচানো। রক্তাক্ত ছেঁড়া কাটা স্থানগুলোয় পড়ল কড়া ওষুধ। কিন্তু পরদিন থেকে কেউ আর মালিনীকে তার মাটির সেই ঘরটায় দেখতে পায়নি। তার বোন তুলসীর বাড়ী এ-গ্রামেই অন্য একটা পাড়ায়। তার কাছেই শিশু কুসুমকে রেখে কোথায় চলে গেছে। 'সরোজ, অর্জুন, কান্তি, গফ্ফর সকলেই তার খোঁজে এসেছিল। আসেনি কেবল মান্নান। সেও সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মালিনীর নিরুদ্দেশ হবার অভিপ্রায়ের কথা আগেই বুঝতে পেরেছিল সরোজ। কথা কাটাকাটির সময় মালিনী বলেছিল— আমি বিধবা মেয়েমানুষ। কোন্ লজ্জায় এ গাঁয়ের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবো বলতে পারেন সরোজদা? এ গাঁয়ের আমি মেয়ে, আবার এ গাঁয়েরই আমি বৌ। চেয়েছিলাম এই মাটিতেই যেমন জন্মেছি, তেমনি এই মাটিতেই যেন আমার মরণ হয়। কিন্তু আমার সে সাধ আর পূরণ হবে না। পশুগুলো তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা উল্লাস করে বলে বেড়াবে আর আমি গাঁয়ে বাস করবো? কখ্খনো নয়।

—কোথায় যাবে?

—বলতে পারবো না। তবে আত্মহত্যা করবো না। ট্রেনের চাকার তলাতেও নয় বা গঙ্গার জলে ডুবেও নয়। মানুষের মাঝেই থাকবো, পৌঁছে ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো।

শিশুকন্যা কুসুমকে ভগিনীর কাছে রেখে বলে গেছে—"দেখিস্ বোন কুসুমকে। কুসুম যদি পারে তবে তার বিধবা মায়ের ওপর যে অত্যাচার হলো তার যে প্রতিশোধ তোলে। সেই মতো করে ওকে গড়ে তুলিস্। কলঙ্কের বোঝা নিয়ে গাঁয়ে বাস করতে পারবো না। সরোজদা, কান্তিদা, গফ্ফরদা এদের কাছে আমার 'সেলাম' পৌঁছে দিস্। ওরাই আমাকে মিছিলে মিটিংয়ে বার করেছিল। তোর জামাইবাবু আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে শোকে আমি মিছিল মিটিং করতে

রতে প্রায় ভুলেই গেছলাম। তুলসী, তুইও এর শোধ নিবি, দাদাদের সঙ্গে মিছিল মিটিংয়ে যাবি। আমি চল্লাম।" মালিনী এইভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তুলসী কান্নায় আকুল। বড়দিদিকে জড়িয়ে ধরে, অঝোরে চোখের জল ঝরতে থাকে।

কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে দেবব্রতর কাছে এসব ঘটনা এসে পৌঁছায়নি। তাই তার স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। ইণ্টারভিউর পালা শেষ হয়েছে সবাই যে যার নিজের ওয়ার্ডে রাতের খানা নিতে থালা নিয়ে লাইন দিয়েছে। আজ হাড়কুঁচোর দিন। সবার চোখে মুখে কেমন একটা সপ্তাহের আকাঙ্ক্ষিত দিনে খুশী খুশীভাব। আজ রাত্রে পোড়া রুটির সঙ্গে কুমড়োর ঘ্যাঁট নয়। আজ রুটির সঙ্গে খানিকটা করে হাড়কুঁচো!

একনম্বরে হঠাৎ এই ফাঁকে এসে পড়ল একটা শ্লিপ। পঁচিশজনকে জেল অফিসে এখ্নি যেতে হবে। শ্লিপ ধরে "পাহারা" নামগুলো এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল। কি ব্যাপার কারুরই বোধগম্য হল না। এক নম্বরের বন্দীদের মধ্যে শুধু ডাক পড়েছে, না সব ওয়ার্ড থেকেই "পাহারা" তাও বলতে পারল না। জেলকমিটির পক্ষে অফিস ইনচার্জ আশুতোষ মজুমদার ছুটলো আগে অফিসে। খোঁজ নিয়ে আসবে ব্যাপার কি? সব জেনে নিয়ে কমিটিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো আশুতোষ। সেও যা বললো তাও খুব পরিষ্কার বোঝা গেল না। আশু ফিরে এসে বললো—মনে হলো এস. পি. এসেছে জেলে। কেউ কিছু বলতে চাইলো না। যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হল আমাদের মধ্যে কিছু বন্দীকে অন্য কোন জেলে স্থানান্তর করবে। কিন্তু কোথায় স্পষ্ট নয়। শুনলাম তো আলিপুর সেণ্ট্রাল। তবে প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকেই নিচ্ছে। জেলের মধ্যে গাদাগাদি করে রাখার বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রতিবাদ এ বোধহয় তারই ফল।

আশুতোষের রিপোর্ট দেওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেল হকার্স ইউনিয়নের নেতা সুদর্শন অধ্যাপক সুশোভন বলে—এই স্থানান্তর বন্ধ করতেই হবে। আগে আমাদের জানানো হক কোথায় আমাদের চালান দেওয়া হচ্ছে।

জেলকমিটির নেতা মণি সেন এগিয়ে এসে বল্লেন—পঁচিশজন আগে জেলঅফিসে চলো। আমিও যাচ্ছি। ফিরে এসে কমিটি বসানো যাবে।

ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই, কিন্তু সকলেই ক্ষোভে কম্পমান। আদেশ এখনই সকলকে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে, গেটের বাইরে পুলিশ-ভ্যান এবং প্রহরী সি. আর. পি. দল প্রস্তুত। সকলকে আলিপুর সেণ্ট্রাল

জেল হাজতে রাখা হবে তাই সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মণি সেন বল্লেন—কি করা যাবে। যেতে তো হবেই। তৈরী হয়ে নাও সকলে। তবে আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। এস. পি. বলল—তার কিছু করার নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ।

জেল গেট থেকে জমাদার এসে উপস্থিত। আবেদনের স্বরে বলে—মণিবাবু পঁচিশজনকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন।

অধ্যাপক সুশোভন চলে গেলো গেটের কাছে। বড় ছিদ্রটা দিয়ে বাইরে রাস্তা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। জোড়া জোড়া ইস্কুলের ছেলেদের হাঁটুগেড়ে "নীল ডাউন"-এর মতো সকলে বসে আছে। সব গরু ছাগল যেন।

একনম্বরে সকলে প্রস্তুত যাবার জন্যে। একমাত্র সুশোভন ছাড়া। সুশোভন ফিরে এসে উত্তেজিত হয়ে বলে—আমরা কেউ যাবো না। আমরা কি জন্তু জানোয়ার। বাইরে আমাদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, এখানেও হবে। কিন্তু এরকম ব্যাপার মেনে নেওয়া যায় না। মণি সেন সুশোভনকে হঠকারী না হবার পরামর্শ দিয়ে বলেন—হয়তো রাজ্যের প্রত্যেকটি জেল থেকেই বন্দী স্থানান্তর হচ্ছে। সেখানে আমরা এই একটা জেলে বন্দী স্থানান্তরে বাধা দিয়ে সফল হতে পারবো না। সেরকম হলে ওরা আমাদের ওপর সাঙ্ঘাতিক দমন পীড়ন চালাবে। যা বাইরের কেউ জানতেও পারবে না।

অধ্যাপক সুশোভন প্রশ্ন করে—কাগজে বেরিয়েছে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেও তো জায়গা হচ্ছে না। উত্তরে মণি সেন বল্লেন—আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নয়। রাজ্যের বাইরে তামিলনাড়ুর কুড্ডালোর জেলে শুনছি নিয়ে যাবে। একবার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হাজতে রাখা হবে।

সকলে চমকে উঠে। বিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠে—সেকি একেবারে তামিলনাড়ু কুড্ডালোর জেল!

—হ্যাঁ।

অগত্যা শুরু হল গোছ-গাছ। এক নম্বর থেকে পঁচিশজনের একটা ছোট-খাটো মিছিল গেটের কাছে চলে গেল শ্লোগান দিতে দিতে। এদের মধ্যে তেরোজন ক্ষেতমজুর বা গরীবকৃষক, চারজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী অধ্যাপক সুশোভন, চারজন মাধ্যমিক শিক্ষক আর তিনজন কলেজের ছাত্র। ওয়ার্ডের বাকী বন্দীরা "লালসেলামী" দিয়ে সকলকে জানান। বিদায় সম্ভাষণ গাওয়া হল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। লোহফটকের বড় ফোকর দিয়ে ঘাড় নিচু এক এক করে পঁচিশজনই চলে

গেল। সারারাত ওয়ার্ডের কেউ ঘুমোলো না। খাদ্যস্পর্শ করলো না। অনেকে সারারাতই চোখের জলে প্রিয়তম বন্ধুর জন্য ভাসিয়েছিল। একটা কান্না ভেজা রাত নয়। মনে হল এরা কি আর ফিরবে, হয়তো সহযোদ্ধা, বন্ধুর জন্য সারা-জীবনই কাতর থাকতে হবে। কাজল, বিকাশ ওরাও যে চলে গেছে।

এক হপ্তা পরের কথা। মণি সেনের নেতৃত্বে জেল কমিটির সভা চলছে, একটা কপি "সান্ধ্য দৈনিক" আজ ইন্টারভিউর সময় পাওয়া গেছে। কাগজটা লুকিয়ে সে এনেছে। সে এমনভাবে মুড়ে এনেছে যে, প্রায় সব খবর পড়াই যায় না। যাহ'ক খবর বেরিয়েছে—বিভিন্ন জেল থেকে 'মিশায়' আটক রাজ বন্দীদের প্রথমে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে এনে রাখা হয়। একদিন বাদেই স্পেশাল ট্রেনযোগে একেবারে তামিলনাড়ুর কুড্ডালোর জেল। হাওড়া ষ্টেশনে যেভাবে বন্দীদের জড়ো করে রাখা হয়েছিল তা, গরু, ভেড়া, ছাগল—চালানের মতো ষ্টেশনেই অনেককে মারধোর করা হয়। ট্রেনটি তামিলনাড়ুতে যখন পৌঁছায় তখন থেকে যে যে ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে প্রত্যেক ষ্টেশনেই মাইকে ঘোষণা করা হয়—এরা সব বাংলাদেশ যুদ্ধে পরাস্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। এরা ভারতের সেনাপতির আত্মসমর্পিত সেলামী। কাছে এ-ঘোষণা শুনে অনেক যাত্রী বা সাধারণ মানুষ রীতি মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা গাড়ীর মধ্যে ইট ছুঁড়তে থাকে। অনেকে থুতু দিতে থাকে। এতো বড অন্যায় যে শাসক দল করতে থাকে তার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত পেল না। কেইই বা শুনবে প্রতিবাদের ভাষা। অনেকেরই মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষা জানা নেই। সংবাদটা পড়া শেষ হলে সবাই কেমন যেন চুপচাপ চলে। মণি সেন বল্লেন—এই কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে এইরকম ব্যবহার পাওয়াই স্বাভাবিক। এর থেকে ভালো আশা করো কি করে তোমরা ?

পরের দিনই এলো একটা খাম। ভিতরে কাজলের চিঠি। খামটা এই জেলের বাইরে শহরের পোষ্ট-অফিসে কর্মরত এক কর্মচারী পায়। সেও একটা চিঠি পেয়েছিল। কাজলের বন্ধু। কাজল ওকে জানিয়েছিল জেলের ঠিকানায় দিলে মণিদা বা শ্যামল পাবেই না। সেন্সরে চলে যাবে আর তারপরই তার শেষ। কাজেই বাইরে কারুর ঠিকানায় পাঠিয়ে সেই চিঠি জেলে কোনোভাবে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়। কাজলের চিঠিতে সান্ধ্য দৈনিকের প্রকাশিত সংবাদ তো আছেই তারসঙ্গে আছে কেমন করে ওরা সেই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত কুড্ডালোর পৌঁছেছিল। কুড্ডালোর জেলের ভিতরটাই বা কেমন আর সেখানকার পরিবেশের চিত্র।

গাড়ী ষ্টেশনে থামলেই কাজল আর বিকাশ হ্যাণ্ডকাপ পরা অবস্থায় ট্রেন থেকে নেমেপড়ে। প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে চোস্ত হিন্দী আর ইংরেজী দুই ভাষাতেই বক্তৃতা শুরু করে। বন্দীদের প্রকৃত পরিচয়। তাদের 'মিশায়' গাদা গাদা কেন আটক করা হচ্ছে সব চেঁচিয়ে বলতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত যারা ঘৃণিত পাকবাহিনীকে ধিক্কার দিতে এসেছিল তারা সোজা ইন্দিরা সরকারের শাপান্ত করতে করতে ফিরে যায়। অনেকে বন্দীদের চুম্বন করে।

কুড্ডালোর পাহাড়ঘেরা নির্জন বিশাল কারাগার। কুখ্যাত বলে প্রসিদ্ধি আছে। জেলগেট পার হতে না হতেই বাংলার বন্দীদের ওপর চালানো হল লাঠিচার্জ। লাঠির আঘাতে অধ্যাপক সুশোভনের কোমরে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে। সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়। শুধুমাত্র কোমরের ল্যাঙোট পরে অনেকে সেলে ঢুকতে বাধ্য হয়। খাওয়াদাওয়া প্রায় কিছু নেই। কেবল একবেলা ভাতের সর্ত তুলতে দেয়।

জেলকমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে—আমরা চীৎকার করে বলবো সব বন্দী এক হও। নিজের দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে অপর দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় না। তাই সব রাজবন্দীর মুক্তি চাই। বিনাবিচারে আটক আইন বাতিল করো। প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীকে রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।

শুরু হল এ জেলে নতুন করে তোলপাড়। কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা নিল। দুদিন প্রত্যেক ওয়ার্ড একেবারে তালাবন্ধ! কেউ বেরহতে পারলো না। বাইরের কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো না। মুখপাত্র আসছে জেলে। শুরু হল ভয়ানক চেকিং। আবার নোটিশ। এবার নোটিশ একনম্বর থেকে বন্দীদের অনশন ধর্মঘটের নোটিশ, প্রতিবাদ সভা। জেলখানার শৃঙ্খলা কেউ মানবে না। দাবী আগে কুড্ডালোর থেকে সকলকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

জেলরবাবুর অফিসে শ্যামলের ডাক পড়েছে। জেলরের সোজা নির্দেশ —আপনাদের একনম্বর ছেড়ে দিতে হবে। আপনারা তো স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না বলেন। পরিবর্তে দুটো কি তিনটে ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হবে। শ্যামলের পক্ষে কোন মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে বলে—আমি আগে কমিটিকে বলবো তারপর কমিটির মতামত আপনাকে জানাবো।

কমিটি জেল কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব দিল নাকচ করে। কর্তৃপক্ষের সুবিধা হবে কমিউনিষ্ট বন্দীরা একনম্বর ছেড়ে দিলে। হাঁক ছেড়ে বাঁচতে ওদের দেওয়া হবে না। দারুণ জায়গা একনম্বর ওয়ার্ডে। কর্তৃপক্ষের অনেক দুর্নীতির কারবার ধরা

পড়ে যায়। সব কিছু এই ওয়ার্ডে বশে লক্ষ্য করা যায়। এক নম্বরে যত কষ্টই হ'ক সবাইকে এই ওয়ার্ডে থাকতে হবে। কোণে ফেলে রাখার ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না।

শ্যামল নেতা মণি সেনের কাছে প্রস্তাব করে—প্রত্যেক দিন কিছু কিছু রাজনৈতিক আলোচনা রাতের হাউসে চলুক। বাইরে দেশের প্রত্যেক পরিস্থিতি কমরেডদের নিয়মিত বুঝিয়ে না দিলে হতাশা আসবে।

ধীমান প্রস্তাব লুফে নিয়ে বলে—হ্যাঁ হ'ক, চার দেওয়ালের মধ্যে আমাদের কতকাল থাকতে হবে কেউ বলতে পারে না। রাজনৈতিক আলোচনা নিয়মিত চলতে থাকুক।

শ্যামল বলে—আমরা একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করার অপরাধে অপরাধী। আমরা এই সমাজটা পাল্টে দিতে চাই। সারা জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী সমর্থক একসঙ্গে এতোজন বাস করছি, পরস্পরকে বোঝার, জানার সুযোগ পাচ্ছি একি কম কথা। এখানেও এই জেলের মধ্যেও রাজনৈতিক পরিবেশ থাকার দরকার।

ধীমানবাবু শুধু নয় আমরা সকলেই চাই জেলের মধ্যে মার্কস্‌বাদের ওপর তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা হ'ক। এটাতো 'ডায়নামিশনের' লক্ষণ।

ধীমান আচমকা প্রয়োগের একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দিতে গিয়ে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করল। ধীমান বলে—আমরা সরকারের চোখে সমাজ বিরোধী, হিংসায় বিশ্বাসী। কারণ আমরা সমাজটাকে পাল্টাতে চাই একথা আমরা সর্বদা খোলাখুলি ঘোষণা করেছি। এখন এইকাজ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছে অনেকে। গ্রেপ্তার হবার পর নেতারা অনেকে বলে থাকেন ও ইচ্ছা করে ধরা দিয়েছে।

মণি সেন বাধা দিয়ে বল্লেন—ইচ্ছা করে ধরা দিলে তাকি বোঝা যায় না, কিন্তু আপনি এই উদাহরণ দিয়ে কি বলতে চান?

সঙ্গে সঙ্গে ধীমান জবাব দিতে এগিয়ে আসে। সে বলল—কেউ হয়তো দলের সংগঠক। দলীয় নীতি ও কৌশল স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করার সময় তিনি হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার এড়ানোর শত চেষ্টা করেও ধরা পড়ে গেলেন আর তার সঙ্গে দলের নেতারা যোগাযোগ রাখবেন না। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের এক কালের ভূমিকার সমালোচনা করতাম। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নেতাদের অধিকাংশই যখন কারাগারে তখন বাইরে যিনি ছিলেন তিনি হয়ে গেলেন কর্মধার। আন্দোলন পরিচালনার সময়

কথায় কথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘৃণ্য গোপন যোগ-সাজস গড়ে তুললেন। কারাগারে আটক নেতারা নেতার কাজের তীব্র প্রতিবাদ করলে তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন—জেলে বন্দী যারা, তারা 'ডেড্' তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই। এখন ধরুন এই একই জিনিস একই চিত্র যদি আমাদের দলের মধ্যে ঘটে তখন কেন তার প্রতিকার হবে না? তাহলে আমাদের দলের সঙ্গে কংগ্রেস দলের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতাদের সঙ্গে বুর্জোয়া জমিদারদের পার্টির নেতাদের তফাৎ কোথায়?

মণি সেন উত্তরে বল্লেন—ঠিক আছে, আপনার এই বক্তব্য একটা সাদা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে দিন। আমি আলোচনা করার জন্য বাইরের নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

শ্যামল হাসিমুখে বলল—ভালোই হল, ধীমানবাবু। লিখে দিয়ে দিন আপনার বক্তব্য। সময় হলে উত্তর পেয়ে যাবেন। ঝামেলা চুকে গেল। ধীমান অবশ্য এই উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। সে বলল—"কেউ গ্রেপ্তার হলেই নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা শুরু করা একটা ফ্যাশনে দাড়িয়েছে। আর নেতাদের কাজের সামান্য সমালোচনা করলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন মিটিংয়ের মধ্যেই।" ধীমানের গলা অবশ্য এরপরই থেমে গেল। মণি সেন সকলকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্লেন—জেলের মধ্যে আপনারা অমানুষিক পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাইরে কত সহস্র কমরেড অমানুষিক পরিবেশে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন। ভিতরে বাইরে সকলেই আমরা এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। বাইরে চলেছে গুপ্তহত্যা। পিছন থেকে ছোরা বা গুলী চালিয়ে মার্কসবাদীদের হত্যা করা শুরু থেকে চলেছে। কখনও কখনও হিস্যা নিয়ে চলছে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি। আমি থেকে ভাগচাষী, গরীবমানুষ যারাই কম্যুনিষ্টদের সমর্থন দিয়েছিল বা ওদের সভায় যেতো তারা গ্রাম ছেড়ে প্রাণের মায়ায় পালাচ্ছে। কত খুন মাঠে তার আগে ঝরেছে। দুর্গাপুরের হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে চেয়ারে বসে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। একজন গুণ্ডা ক্লাশে ঢুকে তাড়াতাড়ি সেই মাস্টারমশাইকে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। একসময় ওরা সবাই ওঁর ছাত্র ছিল। একজন সারা গায়ে বোতল থেকে পেট্রল ছড়িয়ে দিলে। ধরিয়ে দিল দেশলাইকাঠি। আতঙ্কিত ছাত্ররা চোখেমুখে হাতচাপা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ক্লাশ ছেড়ে সব দৌড়ে পালাল। সেদিন কেউ মাস্টারমশাইকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না। সেই সময় অবস্থা এরকম ছিল।

মাস্টারমশাইয়ের বাঁচার জন্য ক্রমাগত প্রাণপণ চীৎকার একসময় থেমে যায়। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে তারা যেমন এসে ঢুকেছিল আবার তেমনিভাবেই ঘাড়ে একটা তেরাঙা ঝাণ্ডা নিয়ে মিলিটারী কায়দায় চলে গেল।

সংবাদপত্রে তো পড়লাম গভীররাতে একদল গুণ্ডা ঘুমন্ত এক পরিবারের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে জনৈক মহিলাকে একদল মিলে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের আগে তার স্বামীকে বেঁধে রেখে মুখে রুমাল গুঁজে দেওয়া হয়। স্বামীর চোখের সামনেই স্ত্রী লাঞ্ছিত। পরের দিন বাড়ীর পাশের ডোবায় স্বামীর মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে কাটা অবস্থায় রাস্তার মধ্যে পাওয়া গেল। আর আবরণ হীন তরুণীকে সকালবেলায় ক্ষত-বিক্ষত অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে কোন সহৃদয় ব্যক্তি হাতপাতালে নিয়ে যায়। গতকালই তো কাগজে দেখলাম টেকনিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপক ক্লাশ নিয়ে ওয়ার্কশপে ঢোকার পথে ছুরিকাঘাতে লুটিয়ে পড়েন সাথে সাথে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

একজন তরুণ জননেতা রাতের ট্রেনে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ষ্টেশনে নেমে রিক্সায় উঠতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন। ষ্টেশনমাস্টারের অফিস খোলা ছিল। তরুণ আত্মরক্ষা করার জন্য ষ্টেশন মাস্টারের অফিস খোলা দেখে দৌড়ে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে টেবিলের তলায় আশ্রয় নেন। গুণ্ডারা অফিসঘর তছনছ করে দেবে আর তাকেও প্রাণে মারতে পারে এই ভেবে ষ্টেশনমাস্টার দিলেন খিল খুলে। তরুণ নেতা বাঁচতে পেলেন না কতবার তাঁর দেহে যে আঘাত করা হয়েছিল তার ঠিক নেই। কেউ বলে ছত্রিশবার, কেউ বা বলে চল্লিশবার। যারা ছোরা হাতে ঢুকেছিল তাদের মধ্যে অগ্রসর দুজন ঐ নেতার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে উপকৃতও হয়েছিল। কিন্তু বিষাক্ত মানুষ মারা হাওয়া তাঁকে বাঁচতে দিল না। ওদের মুক্তিসূর্য দলনেত্রীর একটা ছবি আর তিনরঙা ব্যাজ ওদের প্রত্যেকে বুকে শোভা পাচ্ছিল।

ওরা কৌশল নিয়েছে প্রথম আঘাতেই দুর্বলশ্রেণী চেতনা, ফলে অসংগঠিত এলাকাগুলির ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে মারাত্মক আঘাত হানার, যাতে ওরা প্রথম চোটেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। তারপর ঐ আত্মসমর্পণকারীদের হাতে বোমা তুলে দিয়ে বোমা ছুঁড়তে শেখায়। প্রশিক্ষণ শেষে ওদের দিয়েই আমাদের সংগঠিত ঘাঁটি গ্রামগুলো ভাঙ্গার কাজে হাত দেয়, যে তাদের নির্দেশমতো চলেনি পরেরদিন পথের পাশে ধানের ক্ষেতে, ডোবার জলে, নর্দমার মধ্যে সে লাশ হয়ে পড়ে থাকে। ঘাঁটি গ্রামের মানুষগুলো অবাক, কি করে অন্য গাঁয়ের বা পাশের গাঁয়ের তাদেরই দলভুক্ত মানুষগুলো হাতে বোমা নিয়ে তাদের দিকেই ছুঁড়ে মারার

জন্য এগিয়ে আসে। ওরা তো আসল ঘটনাই জানে না। কেউ কেউ বা তিন চার পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। অনেকে পরিবার সঙ্গে নিয়ে গেছে, যারা পারেনি তারা শেষ হয়ে গেছে। যারা চলে গেছে বা লাশ হয়ে গেছে তাদের জমিগুলোও রাতারাতি বেদখল। শ্রেণী সংঘর্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রামগুলিকেই ওরা বেছে নেয়। আপনারা এখন পুলিশ. সি. আর. পি যৌথ উদ্যোগে 'কোম্বিং অপারেশন'-এর চেহারা দেখছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নয়াউপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের সৈনিকদের দমনকরার এ-এক মারাত্মক হাতিয়ার। সেই পদ্ধতির প্রয়োগ চলছে দুর্ভাগা এই দেশে।

আবার দেখুন ওপার বাংলার মুক্তি যোদ্ধারা লড়ছে স্বাধীনতার জন্য যখন এপার বাংলায় আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার, আধাফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসজনিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছি। ওঁরা লড়ছেন যাঁর অনুপ্রেরণায়। এবার বাংলায় যিনি অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করেছেন আবার তার সঙ্গে তিনি দহরম মহরম করছেন আমরাই প্রথম থেকে বলে আসছি বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্রশাস্ত্র সমেত সবরকম সাহায্য দিতে হবে। পদ্মা আর ভাগীরথীর জল আজ শহীদের রক্তরাঙা। কোনোদেশের কারাগারেই আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না।

আর কদিন বাদে এরাজ্যে সাধারণ নির্বাচন। কারাগারের মধ্যে থেকেও যাতে আমরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারি তার ব্যবস্থা চাই। যাঁরা আজ কারাগারের বাইরে তাঁদের কত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তাঁরা অবাধে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রশক্তিকে পাশে রেখে শাসকশ্রেণী সশস্ত্র মত্ত অবস্থায় ভোট করছে। জানিনা এই পরিস্থিতিতে জনগণ ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা।

মণি সেন বলে চল্লেন—আমাদের দেশের একজন নেতার সেই মহান উক্তি স্মরণ করুন। যেখানে তিনি বলেছেন—"ওরা যদি আমাদের দিকে বোমা ছুঁড়ে। আমরা কি ওদের দিকে রসগোল্লা ছুঁড়বো?" এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই আপনাদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। বাইরে যে লড়াই চলছে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষক যে মহান সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার কতটুকুই বা আমরা এই চারদেওয়ালের মধ্যে বসে জানতে পারছি। এখানে একটা ঘরে থাকতে থাকতে কতকাল কেটে যাচ্ছে। সূর্য উঠছে আবার ডুবছে। আমরা রোজই একই কথা একশবার চিন্তা করি। ঠিক তখনই চলছে সামনের রেলষ্টেশনের গায়ে বোমা, গুলীর আওয়াজ। কেউ নিশ্চয়ই প্রাণ হারিয়েছে।

হ্যাঁ এই কারাগারের গা ঘেঁসে রয়েছে ঐ রেলষ্টেশন প্লাটফর্ম। বহু উঁচু প্লাটফরম। পাশে ভাগীরথী বয়ে চলেছে। রেলব্রীজ দেখা যায়। মেন গেটের সামনে দিয়ে বড পাকা রাস্তা, ব্রীজের তলা দিয়ে চলে গেছে। প্লাটফর্ম তিনতলা সমান উঁচু। বন্দীরা একটু চেষ্টা করলেই প্লাটফর্মে লোক চলাচল দেখতে পায়। লোকাল ট্রেন থামে, লোকজন ওঠা নামা করে। গার্ড সাহেব ট্রেন ছাড়ার বেল টিপতেই আবার দ্রুত গতিতে ষ্টেশন ছেড়ে চলে যায়। নিকট আত্মীয় কারাগারে, ইণ্টারভিউ শেষে প্রিয়জন ষ্টেশন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে আবার দেখা যায় কিনা তাকে। হাত নাডে ষ্টেশন থেকে, রুমাল ওড়ায়। অনেক সময় চোখা-চোখি হয়ে যায় এখন প্রাচীর অনেক উঁচু হয়ে গেছে। তবে আবার একবার দেখা হবে এই আশায় অনেকে কতরকম চেষ্টা করে। বড গভীর আত্মীয়তা এই বিশাল কারাগারের সঙ্গে ঐ ষ্টেশন প্লাটফর্মটার। এই ষ্টেশন প্লাট-ফরম থেকেই সিঁডি দিয়ে সকালবেলায় ট্রেন থেকে নেমে আসছিল রাজ্যসরকারী কর্মচারী গৌতম দে। কর্মচারী আন্দোলনকে ভালবাসতেন। অকস্মাৎ সামনের দিকে দুজন যুবক ছোরা হাতে এগিয়ে এসে কিছু বুঝতে না দিয়েই আঘাত করে বসল গৌতমদের বুকে। পিছন থেকে চললো মুহুর্মুহু পাইপগানের গুলীর আওয়াজ। যাত্রীরা যারা ট্রেন থেকে নেমেছিল তারা ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো।

গৌতমের পকেটে সেদিন মাসিক বেতন ছিল। বাড়ীতে রুগ্না স্ত্রী আর মাকে নিয়ে সংসার। মুক্তি সূর্যের সৈনিকরা ওর জীবন কেড়ে নিল। বন্দীবের বোধ হয় তখন গৌতমের নিহত ঘটনা জানা ছিল না। কিন্তু মণি সেনের কাছ থেকে যখন সব কিছু জানা গেল তখন শোকে সকলেই মুহ্যমান। হায় দেশমাতৃকা। এই অবস্থা তোমার বুকে যখন তোমার স্বাধীনতার পঁচিশবৎসর পূর্তি চলেছে সর্বত্র !

জেলখানার ভোরবেলা। কেউ কম্বল ছেড়েছে কেউ বা ছাডছে। একনম্বরে জমাদার সেপাই এসে "গুণতী" করে কোন্ ফাঁকে চলে গেছে। অবশ্য সেপাই জমাদারদের অন্যকথা। তারা বলে—"মণিবাবু, সরকার আপনাদের সমাজবিরোধী বলে ব'লে আমরাও কি বলবো নাকি। আমরা তো জানি আপনারা কে কি ! আপনারা আমাদের কাছে খারাপ ব্যবহার পাবেন না। আবার যদি না সরকার আমাদের বাধ্য না করে।" ওয়ার্ডের বড় লোহার দ্বার খুলে দিল সেপাই। সবাই এখন হাত মুখ ধুতে, এককথায় প্রাতঃক্রিয়া সারতে নামবে। শ্লিপ হাতে ঢুকলো একজন পাহারা। যাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের নাম কটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল। সকাল আটটার মধ্যে কিচেন থেকে ভাত নিয়ে এসে খেয়ে প্রস্তুত.

হতে হবে। কোর্টের জন্য পুলিশ ভ্যান আটটায় জেলগেটে আসবে। এই স্লিপটা পড়া শেষ হলে আরেকটা স্লিপ নিয়ে একদমে বলে গেল—সঞ্জয় দে খালাস। এখুনি তৈরী হয়ে নিন। সবাই চমকে উঠলো। সঞ্জয় বাড়ি যাবে এখুনি। সবাই 'পাহারাকে' ঘিরে ধরলো। সবাই জানতে চায় কিভাবে সঞ্জয় মুক্তি পেল। 'পাহারা' যুবকটিই এখন সংবাদসূত্র। জেলঅফিসে যাতায়াত করে বলে অনেকের ধারণা ওরা অনেক কিছু আগাম জানতে পারে। 'পাহারার' ছোট্ট সংক্ষিপ্ত উত্তর—হাইকোর্টের আদেশে।

ওয়ার্ডে সাতসকালে শুরু হল সঞ্জয়কে নিয়ে সকলের নাচানাচি। সঞ্জয়ও আত্মহারা। কাকে কি বলবে। কার কাছ থেকে কি ভাবে যে বিদায় নেবে, বিদায় নেবার মুহূর্তে সকলকে কি বলা উচিত ভেবেই পায় না। কতকাল পরে আবার নিজের নির্দিষ্ট বিছানায় শুতে পারবে। মায়ের সেই প্রশান্তিতে ভরা মুখের কথা আবার শুনবে। অসুস্থ বাবার সেবা করবে। আগে বাবাকে হাসপাতালে চেকআপ করার জন্য নিয়ে যেতে হবে। এমন সব কত ভাবনা যেন মাকড়সার জাল বিছিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে এবার শিখাকে সে কথা মতো রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করবে আর দেরী করবে না। মা, বাবা হয়তো কয়েকদিন বাইরে বের হতেই দেবেন না। বাবা নিশ্চয়ই বলবেন—আর না, ঢের হয়েছে। এবার চাকরী বাকরী খ্যাখো। আমি তো আর কদিন বাঁচবো। পেনশনের টাকা আর পাঁচবিঘে জমি এইতো সম্বল। মা নিশ্চয়ই বাবাকে বাধা দেবেন। মা বলবেন—তুমি আবার সেই বকবক করছো। ও যা ভালো বোঝে করবে। ছেলেমানুষ নাকি। তুমিও তো এককালে স্বদেশী করতে। মা-বাবার কথার মাঝে বোন মিনু এসে ঢুকবে। দাদার হাত ধরে টানাটানি করবে—দাদা তোমার সেই হালুম হুলুম গল্পটা আবার বলো না। শিখাদি মনমরা হয়ে গেছে। দাদা, তোমার সেই গল্পটা—"রোম পুড়ছে আর নীরো হাসছে সেইটাই বলে। আর সেই গল্পটা বলো না, রাজারাণী পাহাড়ে উঠতো আর পাহাড় থেকে জ্যান্ত হাতি গড়িয়ে দেওয়া দেখতো, আর আনন্দে হাততালি দিতো। সেই গল্পটা বলো। ওঃ, কি দারুণ গল্প! চলো শিখাদীর বাড়িতে চলো। ওখানে বসে শিখাদি আর আমি গল্প শুনবো। তুমি ছাড়া আমাদের গল্প বলার আর কে আছে বলো? তোমার জেলের গল্পও শুনবো। এখন চলে তো শিখাদির বাড়ি।"

সব গুছিয়ে নিতে হবে সঞ্জয়কে তাড়াতাড়ি। এবার ঘরে ফেরার পালা। মুক্তির অনাবিল উচ্ছ্বাস। সব কিছুতেই সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে ওয়ার্ডের

বন্ধুরাই। সুরেশ, আকবর আর রসিদ তিনজনে সঞ্জয়ের সমবয়সী বন্ধু। পাশা-পাশি চারজনে গুটিসুটি মেরে পাশে পড়ে থাকতো। সঞ্জয় ঘরে ফিরেছে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেও ওদের মধ্যে টান দিচ্ছে বিয়োগ-বিধুর বেদনা। সঞ্জয়ের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। তাই যাবার সময় সবকিছু সঙ্গে না নিয়ে সুরেশ, আকবর আর রসিদ চাইতে অনেক কিছু ওদের দিয়ে দিল। গেট পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবরা এগিয়ে এসে সহযোদ্ধার বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে এল। মাথা গলিয়ে সঞ্জয় ওদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঞ্জয় অফিসে এলে ডেপুটি জেলর তাকে একপাশে দাঁড়াতে বললেন। সঞ্জয়কে অন্ততঃ আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। ডেপুটি শুরু হল সঞ্জয়ের সবকিছু মিলিয়ে নেওয়ার কাজ। প্রথম 'আইডেন্টিফিকেশন মার্কস' ব্যক্তিগত টাকা পয়সা যা ব্যক্তিগত পার্সে জমা ছিল। বাজার, লাইব্রেরীর বইয়ের হিসেব কিছুই বাদ যায় না, থালা, বাটী, কম্বল আপনার কই? সঞ্জয় এ প্রশ্নে সোজাসুজি জবাব দিল—"ওগুলো আছে ওয়ার্ডের বন্ধুদের কাছে। আমাদের ওয়ার্ডের অনেকেরই যে থালা, বাটী, কম্বল, নেই। আপনারা যেদিন প্রত্যেকটি বন্দীকে ওসব দিতে পারবেন সেদিন মুক্তি পাবে সেইই যাবার সময় ফেরৎ দিয়ে যাবে।" এর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে ডেপুটিবাবু সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলেন—"সঞ্জয়, আজই কি তুমি বাড়ী ফিরবে?" ডেপুটি ততক্ষণে গেটের কাছে রক্ষিত ডায়েরী বইয়ে সঞ্জয় যে ছাড়া পাচ্ছে সেটা নোট করে নিলেন।

উত্তরে সঞ্জয় বলে—প্রথমে একবার দিদির বাড়ি যাবো। দিদির বাড়ি এই শহরেই। তারপর বাড়ি। ডেপুটিবাবু সঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে একেবারে মেন গেটে চলে এসে সেন্ট্রিকে বল্লেন—"সেন্ট্রি, গেট খোল। এ ছাড়া পেয়েছে।" চাবি কার কাছে ঠিক এই মুহূর্তে অফিসঘর থেকে কেরাণীবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"ডেপুটি-বাবু, সঞ্জয়কে ছাড়াবেন না, ফিরিয়ে আসুন, দরকার আছে।" চমকে উঠলো সবাই। ডেপুটি, বন্দী, সেন্ট্রি, পাহারা, গেট সকলেই চমকে উঠলো। গেট আর খোলা হ'ল না। সঞ্জয় গিয়ে উঠলো আবার অফিসে।

কেরাণীবাবু একটা খাতা আর কিছু কাগজপত্র নিয়ে ডেপুটি জেলরকে দেখায়। চুপিসারে ওদের আলাপ, কথাবার্তা। মিনিট পাঁচেক এইভাবে অপেক্ষমান সঞ্জয়। সে তো তখনো জানে না কি হতে যাচ্ছে তার ভাগ্য।

ডেপুটিই দুঃখপ্রকাশ করে সঞ্জয়কে বললেন—সঞ্জয় তোমাকে তো ছাড়া যাচ্ছে না। তোমার নামে পুরানো মামলার একটা ওয়ারেণ্ট অফিসে রয়েছে। ঐ

কেশে আগে তোমাকে জামীন নিতে হবে। জামীনের বণ্ড আমাদের কাছে থাকবে।

ততক্ষণে একটু মুষড়ে পড়েছে সঞ্জয়। এ আবার কোন্ কেশ? যাইহোক ডেপুটিবাবুই সহৃদয় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার দিদির বাড়ি তো এই শহরেই। ঠিকানা বলো। কাল যাতে তাঁরা কেউ জামীন করিয়ে নেন একটা খবর পাঠাচ্ছি। সঞ্জয় উত্তর দেয়—আমার জামাইবাবুর নাম শ্রীমিহির দে, ৬ নং নতুন পল্লী, জয়শ্রী নগর।

সঞ্জয়ের নামে পুরানো কেশের ধারা পড়েছে বেশ ভারী গোছের। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪৭, ১৪৮, ৩০৭ এবং ৬ (৩) ইণ্ডিয়ান একস প্লোসিও অ্যাক্ট। সঞ্জয় নাকি কবে ভিন্ন গাঁয়ের এক জোতদারকে খুন করতে গেছলো। সঞ্জয় কেশের বিবরণ শুনে বলে—ডেপুটিবাবু, আমি ঐ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানি না।" ততক্ষণে সেন্ট্রি তাগাদা লাগিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়কে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার জন্য ছোট দরজার মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে যেমন সে অফিসে এসেছিল ছাড়া পাবার জন্য, ঠিক সেইভাবেই আবার চলে গেল ভিতরে একনম্বরে ঘটনা শুনে ওয়ার্ডের সকলেই বিমর্ষ, কিন্তু করার তো কারুরই কিছু নেই।

পরদিনই এস. ডি. জে. এম-এর এজলাসে দুহাজার টাকার জামীন আদেশ হল। ল-ইয়ার সিওরিটি চাই। সেটাও করা হল। বেলবণ্ডে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরের পর একজন কোর্ট পেয়াদা চলে গেল জেল গেটে। রাত্রি সাতটার সময়েও জেল অফিসে ঠায় দাঁড়িয়ে সঞ্জয়। কষ্ট হলেও এবার নিশ্চিত মুক্তির আনন্দে তার চোখেমুখে খুশীখুশীভাব। এতক্ষণ অফিসে ডেপুটি ছিলেন না। সাতটার পর পান চিবোতে চিবোতে ডেপুটি এসে নিজের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। কেরাণীবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সলা চললো। ডেপুটি শেষে আবার সঞ্জয়কে নিয়ে গেটের কাছে চলে এলেন। যেন লৌহ গেটের ছোট দরজা খুলে গেল। সঞ্জয়কে ধরে প্রায় বাইরে ঠেলে দিলেন ডেপুটিবাবু। সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান একটি সি. আর. পি. পি. স্কোয়াড তাকে ঘিরে ফেললো। একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে সঞ্জয়ের হাত ধীরে একজন কনষ্টবলকেই ইঙ্গিত করতেই সে দুহাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। সঞ্জয়কে একটা জীপে তোলা হল। পিছনে সি. আর. পি ভর্তি ভ্যান। জীপে পুলিশ অফিসার আর কনষ্টেবল ঠাসা। জীপ ছুটলো অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে।

ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ পৌঁছে গেল একনম্বরে। গেটে কর্মরত কনভিক্ট সন্ধ্যার ডিউটি সেরে তার ঠিকানায় যাবার পথে চুপি চুপি শ্যামলকে ডেকে ঘটনাটা বলে

চলে গেল। একনম্বর চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোথায় ওরা নিয়ে গেল সঞ্জয়কে। পুলিশ জীপে তুলে অনেককেই গুলী করে হত্যা করেছে, পরে প্রচার চালিয়ে দেয় আসামী পালাচ্ছিল অথবা ভ্যানের মধ্যে পুলিশকে মারধোর করছিল এমন সব আজগুবী গল্প।

পুরো একটা দিন পার হয়ে গেল। সঞ্জয়ের কোন খবর নেই। এদিকে গেটে ওর দিদি-জামাইবাবু নিতে এসে ওর কোন সংবাদ না পেয়ে নাকি ফিরে গেছে। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলেনি, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি, প্রহরারত সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরা সেণ্ট্রি তাদের একবার চুপি চুপি বলেছিল আর দাঁড়াবেন না। বাড়ি চলে যান। শেষে আপনাদেরই পুরে দেবে। দেশে যা চলছে কাণ্ডকারখানা।

পরদিন মধ্য রাত। ছুটোর ঘটা শোনা গেছে। শ্যামলকে ঘিরে ধরে শুয়ে আছে সুরেশ। আকবর আর রসিদ। কেউই ঘুমুতে পারছে না। সঞ্জয়ের চিন্তায় ওরা আকুল। কথা বলতে বলতে অনেকেই ঘুমিয়ে গেছে। হঠাৎ ওয়ার্ডের দরজার তালা খোলার শব্দ। সজাগ হয়ে ওঠে ওরা অর্ধশায়িত শ্যামল খাড়া হয়ে বসে পড়ে। নিশ্চয়ই আবার কারুর বন্দীদশা হয়েছে। জ্বলজ্বল করে বিদ্যুতের বাল্বগুলো জ্বলছে। সার সার দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে, এই একটা ঘরে শতাধিক মানুষ। জায়গা নেই নড়াচড়া করার। এর মধ্যে আবার কেউ ঢুকছে।

দরজার বিশাল লোহার পাল্লাদুটো দুফাঁক হতেই ঠেলে দেওয়া হল যাকে সে আর কেউ নয়। সে সঞ্জয়। শ্যামল দৌড়ে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সঞ্জয়কে। আকবর, সুরেশ, রসিদ, ঘিরে ধরলো। অন্যরা ঘুমিয়ে। কেউ কিছু জানতে পারলো না।

সঞ্জয়ের চোখের কোণে ঘনকালি, বেশ রোগা হয়ে গেছে, চুলে আঁচড় পড়েনি। পেটে ভাত পড়েনি। চোখে ঘুম ছিল না। তার ওপর প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে। পুলিশ অফিসাররা ওকে পুনরায় আটকাদেশের কাগজ ধরিয়েছে। মুক্তি বুঝি ও পাবে না। অন্ধকার থানাহাজতে পড়েছিল। আরও তিনবছর জেলে পড়ে থাকতে হবে।

শ্যামল তার কম্বলে সঞ্জয়কে বসতে অনুরোধ করে—সঞ্জয়, একটু বসো। জল আছে হাত মুখ ধোও। কিন্তু চিড়া গুড় আর কলা আছে। ভিজিয়ে দিচ্ছি। সঞ্জয় শ্যামলের দিকে তার পুনরায় ডিটেনশানের কাগজটা এগিয়ে দিল। পড়া শেষ হতে ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে গেল শ্যামল। একি অদ্ভুত অভিযোগ কর্তাদের। সঞ্জয় নাকি একটা বৈধ সরকারকে সবলে উচ্ছেদ করার জন্য জেলে বসে বসে পরিকল্পনা

করেছিল। শ্যামল বলে—জেলে বসে বসে সরকারকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা। একবার হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পেল। তাহলে এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করতে আবার হাইকোর্টে যেতে হবে। বন্দীমুক্তির জন্য অভিভাবকরা কতবার হাইকোর্টে যাবে যাক্ না। তাহলে তো সরকারবাহাদুর ইচ্ছা হলে বিভিন্ন থানায় নানাকেশেও জড়াতে পারে। আর এসবের বিচার হওয়া অসম্ভব। ইচ্ছা হলে বন্দীকে একদিনের জায়গায় সাতদিন একটা হাজতে অন্ধকারে ফেলে রাখা যেতে পারে। আমরা আজব গণতন্ত্রে বাস করছি।

এরপর বন্দীকে আটক করার কারণও জানানো হবে না। কোন্ জেলে আটক রাখা হবে তাও জানা যাবে না। সবকিছু এখন থেকে তাহলে মুক্তি সূর্যের মর্জি-মাফিক চলবে ?

সঞ্জয় কথা বললো—হ্যাঁ, ব্যাপারটা তো দেখছি তাই। দুবার ছাড়া পেয়েও আমার আজ এই হাল। দেশের মানুষ এই অবস্থা একদিন নিশ্চয়ই পাল্টে দেবে। এখন আর ভেবে কি হবে শ্যামলদা। কপালে আমার ভোগান্তি ছিল।

—হ্যাঁ, যাও তুমি উঠে হাত মুখ ধুয়ে এসো। চিড়ে ভিজে গেছে। খেয়ে নাও। আকবর তোমরা শুয়ে পড়ো। যা হবার হয়েছে আর তো কিছু করা যাবে না।

খবর পৌঁছেছে সঞ্জয়ের দিদির বাড়ি। দিদি মন্দিনী পরদিন জেলগেটে ছুটে এসেছে ভাইয়ের সঙ্গে ইণ্টারভিউ করবার জন্য।

মন্দিনী বলল—ডেপুটিবাবু। সঞ্জয় দে আমার ভাই। তার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি ? সেই বেলা দুটোর সময় স্লিপ দিয়েছি পাঁচটা বেজে গেলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

ডেপুটিবাবু মাথাটা তুলে জানলার বিপরীত দিকে অপেক্ষমান মহিলার কথার উত্তরে বল্লেন—সঞ্জয়ের সঙ্গে এখন কিছু দিন কারুরই দেখা হবে না। ওপরের আদেশ।

—আমি যে তারজন্য কিছু কমলালেবু এনেছিলাম ডেপুটিবাবু। ডেপুটির মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো। গলাটা একটু মেজাজ দেখিয়ে বল্লেন—বলছি তো দেখা হবে না। আবার কথা বাড়ান কেন ?

মন্দিনীর চোখের জল ডেপুটির চোখে পড়ে না। আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে আবার জিজ্ঞেস করে—আমার ভাই ভালো আছে তো ডেপুটিবাবু। ডেপুটির সেই একই মেজাজের উত্তর—হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব ভালো আছে। এখন যান।

মন্দিনী ধীর পদক্ষেপে কমলালেবুর প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কিছুদূরেই অবস্থিত বকুল গাছটার চারদিক ঘেরা সিমেন্টের বেদীটায় গিয়ে বসে পড়ে। ক্রমে অন্ধকার নেমে আসে। রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল এমনিতেই কমে গেছে। সময়টা ভালো নয়। তাই সন্ধ্যার পর খুব দরকার না পড়লে কেউ বের হয় না। বকুল গাছটা থেকে ডানার ঝটপট শব্দ করে একটা রাতচরা পাখী উড়ে গেল। একটা যাত্রী-বাস সামনে দিয়ে চলে গেল। অদূরেই তিনতলার সমান উঁচু প্লাটফরম্। ট্রেন একটা এসে থামলো। কিছুদূরেই নিস্তব্ধ ভাগীরথী। মন্দিনী বসে বসে চোখের জল ফেলছিল। এমন সময় একটা পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ—আপনি কে? এখানে এভাবে বসে কেন? মন্দিনী চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়—আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

—তা কি হল? দেখা হয়নি?

—না। ওরা অনুমতি দিল না।

—আপনার ভাই কি রাজনীতির লোক?

একথার কোন উত্তর দিল না মন্দিনী। মহিলাকে চুপ করে থাকতে দেখে যুবক এবার নিজেই বললো—আপনার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতে পারি কী?

—হ্যাঁ, এই শহরেই আমার বাড়ি।

—তাহলে তো জানেন, কিছুদিন আগে এই জেলে একজন বন্দীকে ওরা পিটিয়ে হত্যা করেছে।

—হ্যাঁ শুনেছি। আমার ভাইয়ের জন্য আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। দু'দুবার ছাড়া পেয়েও তার বন্দীদশা ঘুচছে না।

—কিছু করার উপায় নেই। রাত হচ্ছে। এখানে এভাবে বসে থাকলে তো ভাই মুক্তি পাবে না। উল্টে আপনারও বিপদ হবে। জায়গাটা ভালো নয়। আমার এখানেই বাড়ি। এই জেল গেটের সামনেই একজন পুলিশই খুন করেছে। আর একজন তো রেলষ্টেশন প্লাটফরম্ দিয়ে নামতে নামতে দিনদুপুরে প্রাণ হারালেন।

মন্দিনী যুবকের কথায় অবিশ্বাস না করে উঠে পড়লো। বাড়ির কাছে গিয়েও শেষে বাড়ি ঢুকতে মন চাইলো না। বাইরে দরজার সামনে বসার জায়গাটায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

মিহিরবাবু বাইরে থেকে ফিরে পুত্র শিশিরকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই শিশির বললো—মা সেই বেলা বারোটার সময় মামাকে দেখতে গেছে।

—এখনও ফেরেনি ?

—না।

—সঞ্জয়ের জন্য কতকাণ্ড করে হাইকোর্ট করলাম। হাইকোর্ট মুক্তি দিল তবু পুলিশ ওকে ছাড়ছে না। তোর মাকে ছাখ। আমিও বের হচ্ছি, শিশির বাড়ি থেকে বেরহতেই চোখে পড়ল মাকে। অস্ফুট স্বরে চীৎকার করে উঠলো—একি মা, তুমি এখানে বসে, এভাবে ? মায়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে শিশির মায়ের কাছে বসে পড়ে। পা দুটো জড়িয়ে ধরে মায়ের মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে—মা তুমি কাঁদছো ? ছোটমামার জন্য কাঁদছো ? আজ দেখা হয়নি ? একমাত্র পুত্রকে জড়িয়ে ধরে মন্দিনী খানিক খুব কেঁদে নেয়। সেই অবস্থাতেই বলে—শিশির, তোর ছোটমামার সঙ্গে ওরা তো দেখা করতে দিল না।

—মা তুমি এইভাবে কেঁদে তো আর ছোটমামাকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে না। বাবা এসেছেন। এক্ষুনি বাবাও তোমার খোঁজে বের হবেন। ছোটমামার কাছে কিছু খাবার পৌঁছে দিয়েছো কি ?

—না, ওরা তারও অনুমতি দিল না। আমি কিছু কমলালেবু কিনে নিয়ে গেছলাম। সে-সব আসার সময় গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসেছি। পুত্রের হাত ধরে মন্দিনী ঘরে ফিরে যায়।

শ্যামলের হাতে সাদা কাগজে লেখা একটা চিঠি একজন কনভিক্ট দিয়ে গেল। পাচার করা চিঠি। ভাইঝি রানু লিখেছে। পরিষ্কার ঝকঝকে নয়। কিন্তু গোটা গোটা। রানু লিখেছে—

"কাকু, অনেকদিন জেলগেটে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাবার শরীর আগের চেয়েও অবনতি হয়েছে, মা বড্ড বেশী এক্সসেন্ট্রিক হয়ে পড়েছে। আমি বা আমরা কেমন যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। আপনারা যারা চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ আছেন, তাদের মনের জোর নিশ্চয়ই বেশী। আমরা বাইরে এক জঙ্গলের রাজত্বে বাস করছি। এতোদিন জানতাম জন্তুজানোয়াররাই বুঝি কেবল জঙ্গলে বাস করে। এখন আমার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। হিংস্র জানোয়াররা দিনের বেলাকে ভয় খায় না। ওরা পাড়ায় ঢুকছে, মানুষ মারছে। কততাজা জোয়ান এর মধ্যে সাবাড়। মানুষের রক্তের স্বাদ একবার পেলে যা হয়। কত লোক যে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল। ভিটেমাটি, গরু ছাগল, জমিজিরেত সব থাকছে পড়ে। সে-সব তারপরই বেদখল। তুমি জেলে আছো তাই এদৃশ্য দেখতে হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের

চোখের সামনে এ-সব ঘটছে। আমরা কি রকম সুখে আছি, কাকু ভাবতে পারো! নাড়ীভুঁড়ী বার করে ফেলেছে, হাতে ধরে ছুটে পালাতে গিয়ে আমার সামনেই একজন পড়ে মারা গেলো। ও নাকি পাড়ায় মিছিল মিটিংএ থাকতো এই তার অপরাধ। জানোয়ারগুলো সবচেয়ে বেশী ভক্ত মেয়েমানুষের রক্তে। আমরা মেয়েরা এখন দিনের বেলাতেও সিনেমা যাই না। বাজারে বের হই না। আমরা সবাই 'কারাগারে' আটক। গোটা দেশটাই বুঝি জেলখানা!

পাশাপাশি আর এক দুঃখের কথা তোমায় জানাই, দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য অনেক বাড়িতেই ছেলেমেয়েদের কান্নার রোল শুনতে পাওয়া যায়। এমন একটা বাড়ি নেই যে-বাড়িতে কর্মক্ষম বেকার যুবক-যুবতী বসে নেই। এতো ভিক্ষুক বেড়েছে যে, চিন্তাই করা যায় না। পথেঘাটে, দোর গোড়ায়, বাসে, ট্রেনে, ষ্টেশন প্লাটফরমে, বাজার হাটে খানিক দাঁড়াবার উপায় নেই সামনে এসে দাঁড়াবে মলিনবসন ভিক্ষুকের দল। কাকু, তুমি চিতলগাঁয়ের বুড়ো ইয়াসীন চাচার কথা, নিশ্চয়ই বেশ ভালই মনে করতে পারো। একটা জনসভার দিন যে তার কি একটা অভাব জানাতে উঠে পড়েছিল একেবারে মঞ্চে। ওকে ওরা মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছিল। গত পরশুদিন ভাই নিতুকে নিয়ে আমি প্লাটফরমে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দেখি ইয়াসীন চাচা রেলিংয়ের ধারে একটা বস্তায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। মুখে একটাই শব্দ 'জল', 'জল', পরণে শতবিচ্ছিন্ন ময়লা একটুকরো কাপড়। মাথার সামনে ছিল একটা ছোট ঘটি। সেইই সেটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। নিতু এক ঘটি জল নিয়ে এলো কল থেকে। তৃষ্ণার জল মুখে দিতেই ইয়াসীন চাচা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। গায়ে তার শুধু চামড়া আর কখানা হাড়। হাড় জুড়িয়ে গেল, ইয়াসীন চাচা আর কোনদিন ভিক্ষায় বের হবে না। আর কখনও কারুর কাছে চাচা কিছু চাইতে যাবে না।

কাকু তুমিতো জান ইয়াসীন চাচার একসময় চারবিঘা জমি ছিল। আমাদের গাঁয়ের মুকুন্দ রায়ের কাছে ঐ চারবিঘেই বন্ধকী রেখে ভাগে চাষ করতো। বন্ধকী জমি আর ইয়াসীন চাচা ছাড়াতে পারেনি। রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে সাব কোবলা বিক্রী। কাকু, এই পথে হাঁটলে কি আমরা সমাজতন্ত্রে পৌছাবো?

ভুবনপালকে কখনও তুমি দেখেছো কি? এই বদস্বভাবের গুণ্ডাটাই মালিনীর সর্বনাশ করেছিল। ভুবনপাল এখন পাড়ার উঠতি যুবকদের গুরু। সে এখন হবু এম. এল. এর নির্বাচনী এজেন্ট। জীপে মোটরের ডগায় চরকা আঁকা ঝাণ্ডা উড়িয়ে ঘুরে চেড়াচ্ছে। কয়েকদিন আগে দুজন খড়ের ব্যাপারী ভুবনপালের

খামার বাড়িতে খড়ের পলুই থেকে আঁটি ভাঙ্গতে ব্যস্ত ছিল। পলুইয়ের গাদা থেকে বেরিয়ে পড়ল দুটো তাজা বোমা। একটা তো ফেটে যায় মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে। পাড়ার আমরা সবাই দারুণ চমকে উঠেছিলাম। আমি কাছাকাছি গিয়ে দেখি ব্যাপারী দুজনের একজন তো রীতিমতো আহত অবস্থায় মাটিতে গোঙাচ্ছে, আর অন্যজন দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তুমি হয়তো বলবে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, পাড়াশুদ্ধ লোককে জড় করা হয়েছিল, এসব কিছুই করা হয়নি। সবাই দেখলো, বুঝল ঘটনার গতি কিন্তু সবারই মুখে যেন তালাবন্ধ। কেমন যেন দমবন্ধ অবস্থা। পুলিশ অফিসাররা দলবলসহ এসেছিল। কিন্তু পালের বাড়িতেই খানাপিনা সেরে ফিরে যায়।

আমাদের গানের স্কোয়াড যেন ভাঙ্গা হাট। বাবা আমার বিয়ে দেবার জন্য মরিয়া। আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, বুঝি অরক্ষণীয়া হয়ে যাবার ভূত বাবার ঘাড়ে চেপেছে। আমার বিয়ে এ মাসেই। সেই সময় তোমার অনুপস্থিতি আমি ভাবতেই পারছি না। শীগগীরই আমি আর মা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবো।"

আমার প্রণাম নিও।

তোমার স্নেহের রাণী—

বিয়ের আগে রাণী জেলগেটে একদিন মাকে নিয়ে এসেছিল। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য আরও উজ্জ্বল হয়েছে। বৌদি জালের উল্টোদিকে শ্যামলকে দেখে কেঁদে আকুল বিয়ের পরদিন রাণী ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে জেলগেটে কারুর জন্য এক টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি মিষ্টি দিয়ে। কমিউনের সবাই সেদিন মিষ্টি মুখ করলো। রাণীর চিঠিটা শ্যামল নষ্ট করেনি। ওর চিঠিটা পড়ে শ্যামল আরও উদ্বিগ্ন। বাইরে আকাল চলছে, না খেতে পেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, তবু সরকার তা স্বীকার করে না, বাজারী কাগজগুলোও ছাপায় না। আশ্চর্য হবার কথা।

কম্বলে শুয়ে শুয়ে আবার একবার রাণীর চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে শেষ করে শ্যামল। তাহলে ছাড়া পেয়ে রাণীকে নতুনরূপে এবার দেখবে। কিন্তু দেশজুড়ে যে আকাল!

একজন মেট বিকালে জানলার ধারে উপবিষ্ট শ্যামলের খুব কাছে চুপি সারে এসে খুব চাপা গলায় বলে—শ্যামলদা, শোভা বলে এক মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আজ গেটে এসেছিল।

শ্যামল অবাক হয়ে যায়। অবিশ্বাসের মতো মনে হল। অস্ফুট স্বরে সে

বলে—শোভা! কি বলছেন আপনি?

শ্যামলের বিশ্বাস না করার কারণও আছে। শোভা বলে একটি মেয়ে কলেজে পড়তো। শ্যামলদের বাড়ির গায়েই বাড়ি। যদিও শোভাদের আসল বাড়ি কলকাতার মাণিকতলায়। এখানে এসেছে বড় হয়ে বহুকাল পরে। শ্যামল আর শোভা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতো। কিন্তু সে তো বহুকাল আগের কথা। শোভার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় থাকে এখন তাও জানা নেই। কাজেই সে কেন তার সঙ্গে জেলগেটে দেখা করতে আসবে।

মেট বুঝলো শ্যামলের কোথাও একটা খটকা লেগেছে। কয়েকমুহূর্ত বাদে শ্যামল বলে—হতে পারে। কিন্তু এর বেশী কিছু বলার বা জানার আছে?

—বলতে পারছি না। তবে আপনার নামে কোন স্লিপ দেয়নি। অনেকক্ষণ চুপচাপ গেটে অপেক্ষা করছিল।

শ্যামল পুনরায় প্রশ্ন করে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন মহিলাটি বিবাহিত না অবিবাহিতা? মজুর শ্রেণীর ঘরের মেয়ে না মধ্যবিত্তঘরের মেয়ে?

খানিক চিন্তা করে নিল কনভিক্ট মেট। কিছুক্ষণ পরেই বললো—মনে হলো তো বিবাহিতা। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে।

মেটকে চলে যেতে বলে শ্যামল চিন্তায় ডুবে গেল। কিন্তু কোন কূলকিনারা করতে পারলো না। কে সেই শোভা, কি বা তার পদবী। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন এক শোভার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে নয় তো! গাঁয়ের বাউরীপাড়ার শোভা বাউলদাস যে মহিলাসমিতি করতো সে আসেনি তো! শোভা বৌদিও আসতে পারে। শোভা বৌদির অপার স্নেহ তাকে মুগ্ধ করেছিল। মিছিলে মিটিংয়ে বের হতেন না বটে তবে গভীর রাতে অনেকদিনই শ্যামলদের আশ্রয় দিয়েছেন। ভোর হবার আগেই ওরা শোভা বৌদির ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। সেদিনের আশ্রয়দাত্রীই কি তাহলে আজ জেলগেটে এসেছিলেন।

"কি ভাবছো এতো শ্যামল?" বলে দেবব্রত ঘাড়ে একটা চাপড় দিতেই উঠলো শ্যামল। সে উত্তরে বললো—"কি আর ভাববো দেবব্রতবাবু। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।" যাক্ চা হয়ে গেল আপনাদের কমিউনে?

—"না না চা হচ্ছে। এখনও খাওয়া হয়নি।"

—তাহলে আমায় এক গেলাস দেবেন।

—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তুমি তো যে কোন কমিউনে যাবে সেখানেই চা পাবে। চলো চলো আমাদের কমিউনে চলো।" দেবব্রতদের কমিউনে শ্যামল

চা-পানে বসে গেল।

ওধারে একটা কমিউনে চার-পাঁচ জন মিলে গল্পগুজব করছে, পাশে চার-পাঁচ জন লুডো খেলতে ব্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল হঠাৎ লুডো খেলোয়াড়দের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা। ঘুঁটি কাঁচানো যাবে কখন তাই নিয়েই নাকি বিতর্ক। ফয়সালা নিজেদের মধ্যে না হওয়ায় শেষে সবাই খেলা ছেড়ে উঠে পড়েছে। কিন্তু কথা কাটাকাটি থামলো না। একজন তারই মাঝে তাড়াতাড়ি লুডোর বোর্ড আর ছক্কা ঘুঁটি কুড়িয়ে গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। কথা কাটাকাটি থামাতে সবাই যখন দৌড়ে এসে ওদের ঘিরে ধরেছে তখন মেটবার আশা আরও সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এ যেন 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'। সবাই সবাইকে বোঝাতে চায়, সবাই সবাইকে থামাতে চায়। কেউ কারুর যুক্তি শুনতে নারাজ। অবস্থা ক্রমশঃ জটিল থেকে ডিগ্রির তফাৎ হয়ে যাবার সম্ভাবনা হয়ে উঠল প্রবল। কে একজন মাথাগরম করে ফেললো। একজনের গায়ে হাত পড়লো। চঞ্চল হয়ে উঠলো গোটা এক নম্বর ওয়ার্ড। জানলার আশে-পাশে কিছু পাহারা ও মেট উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে এক সেপাই লক্ষ্য রাখছিল ওয়ার্ডের ভিতরে যা যা ঘটছে।

কেন এমন পরিস্থিতি একনম্বরে। সাতনম্বরে যা যা নিয়ে গণ্ডগোল হয় এক-নম্বরের তো তা নিয়ে হবার কথা নয়। হয়ও না। সামান্য লুডো খেলা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি, তাই থেকে নিজেদের মধ্যে মারামারির পর্যায় এতে একনম্বরের সুনাম কি বাড়লো! সবাই যখন যে যার সীটে এসে পুনরায় বসে দম নিচ্ছে তখন কথাগুলো বলছিল দেবব্রত। 'ওয়ার্ডে নেতারা রয়েছে। তাঁরাই বা কি ভূমিকা নিচ্ছেন? তাঁরা কেন কেউ কেউ এইসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছেন?

লালমোহন পাশ থেকে দেবব্রতর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—দীর্ঘদিন একটা ঘরে এতোজন থাকতে থাকতে সবাইয়েরই মেজাজ একটু তুঙ্গে উঠে যাচ্ছে। সবাই কেমন যেন খিট-খিটে হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামল একথার প্রতিবাদ করে বলে—এটা কোন কথা হল? জেলের মধ্যে এইরকম অবস্থায় কি করে মেজাজ ঠিক রাখা যায় তার জন্য কতরকম প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। প্রায়শঃই যদি এমন ছোটখাটো ঘটনায় বয়স নির্বিশেষে সবাই জড়িয়ে পড়েন তাহলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে। যাহ'ক মণিদা আছেন আমাদের সকলের নেতা তাঁর ওপরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দিতে হবে।

দূরের একটা কমিউন থেকে ভেসে এলো সুরেলা গানের আওয়াজ। 'লালঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না, চাই তার লালফিতে চিরুনী আর আয়না।'

মুহূর্তের মধ্যে সবাই আবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করলো—কয়েকজন উৎসাহী ছুটে গেলো গায়কের দিকে ঘিরে ধরে অনেকে তাল দিতে লাগলো নবীন গায়কের দিকে। সবাই তাকে ঘিরে ধরলো—অনেকে তালে তাল দিতে থাকলো। ঘটে গেলো পট পরিবর্তন। চলেগেল ওরা একমঞ্চ থেকে আরেক মঞ্চে।

কারাগারের ভরদুপুরবেলা। সকলেই কেমন নিঝুম, নিস্তব্ধ দুপুরের নাস্তা হয়ে গেছে। কম্বলে শুয়ে সকলে বিশ্রাম নিচ্ছে। গোটাকতক কাক সামনের নারকোল গাছটার মাথায় লাফালাফি করছে। অদূরে সেলের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে এক সেপাই। হাতে একটা লাঠি মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে আর খৈনি টিপছে। নিচের ঠোঁট ফাঁক করে তারমধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। ফিমেল ওয়ার্ডের ভার-প্রাপ্ত মহিলা জমাদার থাকে এসময় ধীরপদক্ষেপে বিপুলা শরীর নিয়ে রোজই যেতে দেখা যায় আজও তার ব্যতিক্রম নেই। তিনিও চলে গেলেন ফিমেল ওয়ার্ডে। তাঁতকামানের তাঁতচালানোর আওয়াজ শোনা যায়। তাঁত চালাচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী জীবন। পাশের একটা ছোট্ট অন্ধকার গুমটি থেকে কে এক আসামী ডাল ভাঙছে, তার আওয়াজ ভেসে আসছে। ফাঁকে আর কাউকে দেখা যায় না। এরই মাঝে জানলার ওপাশ থেকে ছোট্ট একটা ডাক 'শ্যামলদা'। শুয়েছিল কম্বলে, উঠে বসলো সে। 'কি ব্যাপার ? কিছু বলবেন ?' শ্যামল উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে। একটা দমকা হাওয়া হঠাৎ ঝরাপাতা সব উড়িয়ে নিয়ে ঘুর্ণিঝড়ের মতো পাক খেতে খেতে চলে গেল—'গতকাল আপনার সঙ্গে জেল গেটে শোভা নামে এক ভদ্রমহিলা সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে একবার কথা বলেছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁকে আমি ঠাঁয় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি কি কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ? তা তিনি যা বল্লেন—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্যামল বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কি বল্লেন তিনি ? তাহলে মেট ঠিকই বলেছিল। বল্লেন—"আমি শ্যামলবাবুর জন্য কিছু সামান্য ফল এনেছি। কি করে তাঁর হাতে এগুলো তুলে দিই বলুন তো ?"

—তা দেখা করে দেবেন কি ? স্লিপ দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ দিয়েছি।

—কখন ?

—আমি যখন এসে পৌছেছি তখন স্লিপ নেবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছলো। তাই স্লিপ দিয়েও কিছু হয়নি। এখন ভাবছি চলে যাবো কিনা। বহুদূর থেকে

হেঁটে, বাসে এসেছি। ফিরতে আবার অনেক রাত হবে। তাই ভাবছি। তা আমি ওঁকে বল্লাম—বেশতো প্যাকেটটা আমাকে দিতে পারেন অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলে। আমি ওঁর কাছে ঠিক পৌঁছে দেবো।

—কিন্তু আপনাকে তো আমি ঠিক চিনি না। ওঁর কোন ক্ষতি হবে না তো? আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম—দেখুন জেলে রক্ষীর কাজ করি বলে অমানুষ ভাববেন না। আমাদের অনেক সমস্যা। তার জন্য আমাদেরও ইউনিয়ন আছে। ধর্মঘট হয়, মিছিল জারি, ছাঁটাই হয়। কেউ বা সাসপেণ্ড হয়। আমরাও বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করি। আপনি নিশ্চিত মনে আমার ওপর ঐ প্যাকেটের দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারেন। উনি আমাকে এই প্যাকেটটা হাতে তুলে দিয়েছেন চুপি চুপি পাশে সরে গিয়ে। জেল গেটের বা অফিসের কেউ টের পায়নি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওটা ঝোলার মধ্যে পুরে ফেল্লাম। কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। এখন আপনার জিনিস আপনি বুঝে নিন। এই নিন—"বলে একটা ছোট প্যাকেট শ্যামলের হাতে তুলে দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল।"

প্যাকেটের মুখটা ছোট মোটা সুতোর কাপড় দিয়ে বাঁধা। ফাঁসটা টান দিতেই খুলে গেল। ভিতরে হাত দিতে বের হল একটা হাতে তৈরী চারখানা রুটি, গুড়, দুটো আপেল একটা বেশ বড় মাপের লালপতাকা। কারাগারের বাইরে তখন ভোটের ঢাকে কাঠির আওয়াজ। অথচ দেশজুড়ে দমবন্ধ অবস্থা। ইতিমধ্যেই এক হাজার মার্কসবাদী নিশ্চিহ্ন। চারদেওয়ালের মধ্যে আটক দশহাজার। পনেরো হাজারের ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, কয়হাজার এলাকা ছাড়া তার সঠিক হিসেব খুঁজে পাওয়া ভার। হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন কিছুই বাকী নেই। বালক-বৃদ্ধ-নারী-কেউই রেহাই পায়নি। একটা স্থায়ী সরকার'কে চ্যালেঞ্জ! মার্কসবাদীদের প্রশ্রয়, আশ্রয় দান। মার্কসবাদ উচ্চারণও যে নিষিদ্ধ। দেওয়ালের দুর্দান্ত লিখন—"বাংলা দেশের দুটি পশু, ইয়াহিয়া, জোতিবসু।" এরা ভুলবে নাকো ভিয়েতনাম ভুলে যাবে বাপের নাম। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এশিয়ার মুক্তিসূর্য সদর্পে ঘোষণা করলেন—"আমাদের পা ফেলার জায়গা ছিল না। এবার পেয়েছি শোবার জায়গা।" একটা থানাতেই সাবাড় করা হল চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে। পা ফেলার পর হল- শোবার জায়গা। ভিয়েতনামের 'মহিলাই-এর নাম যারা শুনেছে তারাও আতঙ্কিত হয়ে উঠল কলকাতার কাশীপুরের ঘটনা শুনে।

একটা সংবাদপত্র অফিস আর তার ছাপাখানায় চললো হামলা। তার প্রকাশনা ভবনে ঢুকে একদল ক্রুদ্ধ যুবকের অগ্নিবর্ষি জিজ্ঞাসা, মুখে মাতৃবন্দনা—কি ছাপাচ্ছেন

মশাই আপনারা? ওরা সশস্ত্র। হাতে লোহার রড কোমরে ভারী রিভলবার। সর্বদিক খোঁজাখুঁজি শেষ হয়ে গেল। একজন এদিক-ওদিক আরও খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে চলে। কাকে যেন খুঁজছে। হঠাৎ সামনে বসা এক বৃদ্ধের গলাটা টিপে ধরল। বৃদ্ধ আতঙ্কে উঠে এক ঝাপটা দিতেই গলা হাতছাড়া। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোহার রড একটা মাথার উপর উঁচিয়ে ধরে চীৎকার করে বলে—বলুন, আপনি কে? পাবলিশার?

বৃদ্ধের চোখের সামনে বাড়িতে অর্ধভূক্ত মুখগুলো ভেসে উঠলো। পরক্ষণেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলে—আজ্ঞে না, আমি ঝাড়ুদার। কাজ করি এখানে।

—তাহলে পাবলিশার কি আসেননি? বলুন তিনি কখন কখন আসেন? বাড়ি কোথায়? আজ আসবেন?

আজ্ঞে না তিনি তো আজ আসবেন না। কদিন আসেননি। হঠাৎ বৃদ্ধের মনের মধ্যে কেমন যেন সাহসের সঞ্চার হলো। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসলো—আপনারা? আপনাদের পরিচয়?

ওদের মুখচোখের ভাব গেল পাল্টে। একজন বুক ফুলিয়ে উত্তর দিল—আমরা? আমরা দেশের কাজ করি। দেখছো না এটা কি? বুকের ওপর ঝুলছে একটা মহিলার প্রতিকৃতি সম্বলিত লকেট। সুতো গলায় বাঁধা। বুঝি বা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। বৃদ্ধ খানিক থেমে ওদের আগমনের হেতু জানতে চেয়ে বলে—কিন্তু আমাদের অপরাধ?

—"অপরাধ? সহস্র অপরাধ, লক্ষকোটি অপরাধ তোমাদের।" হো হো হাসিতে চারদিকের বাতাস কম্পমান। "শোন বুড়ো, তোমাদের এখানে স্তালিনের লেখা বই ছাপা হচ্ছে কেন? স্তালিনের লেখা কোন বই ছাপাতে আমরা অনুমতি দিই না। এক কথায় নিষিদ্ধ।"

পাশ থেকে একজন গম্ভীর গলায় বলে—অবশ্য হিটলারের লেখা বই ছাপতে পারো।

বৃদ্ধ এবার সোজা-সুজি প্রশ্ন করে—কেন স্তালিনের লেখা ছাপা যাবে না? স্তালিনের লেখা বই ছাপাতো নিষিদ্ধ হয়নি।

উত্তর এলো—তুমি কি জানো বুড়ো? বয়সটাই হলো? বুদ্ধি হলো না। জানো স্তালিন সি. পি. এম. ছিলেন?

বৃদ্ধ অবাক। কোনদিন তো একথা শোনেনি। সি. পি. এম? উনি তো রাশিয়ার মানুষ।

আর একজন যুবক থুতনীর কাছে ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে যায়। চীৎকার করে সে বলে—জানো সি. পি. এম.-কে আমরা এই দেশের মাটিতে কবর দেবো। ওরা দেশটাকে ভিয়েতনাম বানাবার খোয়াব দেখে। স্তালিনের বই ছাপা এখন থেকে নিষিদ্ধ।

—কিন্তু সরকারী নির্দেশ ?

এবার চটে লাল যুবকের দল। ঘুসি পাকিয়ে যায় বৃদ্ধের দিকে। ফোঁস করে বলে ওঠে—সরকার ? আমরাই তো সরকার। সরকারকে আমরা চালাই। একজন বুকচিতিয়ে বলে—আমি এস. ডি. ও.।

অপর একজন সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে আমি ডি. এম.।

তৃতীয় ব্যক্তি হুঙ্কার ছেড়ে বলে—হুঁ, জানো, আমি মন্ত্রী। অতএব বুঝতে পারছো আমরা কারা ? দেরী করবো না, হুকুম। বুঝলে বুড়ো এ হল হুকুম।

—কিন্তু আমি তো প্রেসের মালিক নই। বৃদ্ধের কণ্ঠে এবার যেন কিছুটা ভিন্নস্বর। গলার আওয়াজ কিছুটা ভারী। এতে ওরা আরও জ্বলে উঠলো। বেশ উত্তেজনা। এই বাপ্টি, দেতো তোর পাইপগানটা। কর্কশ আওয়াজে তেড়ে গিয়ে একজন বাপ্টির হাত থেকে পাইপ গানটা নিয়ে বলে—শেষ করেদি ব্যাটাকে। বদন বিগড়ে দেবো। তখন থেকে ফ্যাচফ্যাচ করছে। পাইপগানটা বুকের কাছে নিয়ে ফিট করে মুখ বিকৃত করে যুবকটি বলে—দেখবে আমাদের ওপর কি নির্দেশ আছে। যদি কথা না শোনো তবে স্তালিনের ফাদারও তোমায় বাঁচাতে পারবে না।

ট্রিগার প্রায় চেপে ধরেছিল। এমন অবস্থায় ওদের মধ্যে একজন তার হাতটা চেপে ধরে বলে ওঠে—এ্যাই থাম, থাম। কি করছিস্। এই বুড়োকে মারার আগে শালা পাবলিশারটাকে খোঁজ। তারপর একে। বাপ্টি বলে—শালা খুব বেঁচে গেলি। নেহাত ভকতদা বলছে তাই। নাহলে তোর ভবলীলা এখনই সাঙ্গ হতো। রক্তগঙ্গা ছুটে যেতো। ভকতদা তুমি আমার কাজে এমনি প্রায়ই বাধা দাও কেন বলতো। ভকত বলল—তোর পাগলামো থামাবার জন্য। আপাতত হয়ে গেল এখানকার 'কাজ'। ভকত সবাইকে মুখের আওয়াজে কি যেন বললো। তারপর ছাগল তাড়ানো করে সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এবার ওদের 'কাজ' একটা 'বালিকা বিদ্যালয়ে'।

ইস্কুলের টিফিনের সময় পনেরো মিনিট। সেটা শেষ হলে বেজে উঠলো ক্লাশে ফিরে যাওয়ার ঘন্টা। গেটটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। গেটে দারোয়ান

রয়েছে পাহারায়। মণ্টু, মান্টি সবাইকে নিয়ে ভকত ঢুকতে চাইলো ইস্কুলের মধ্যে। দারোয়ান জানতে চাইলো ওদের পরিচয়। মেয়েদের ইস্কুল। পরিচয় আগে জানতে হবে। এটাই নির্দেশ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি লাগবে ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন হলে।'

হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই দূরে ছিটকে পড়লো দারোয়ান? দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে মান্টি বলে—দেবো। টেংরী খুলে? শালা বাপের ইস্কুল। এ ইস্কুলতো আমাদের ইস্কুল, আমাদের তৈরী। এখানে ঢুকতে অনুমতি লাগবে কেন? ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে দারোয়ান। সেও তখন চীৎকার করতে থাকে—কে, কে আপনারা? পরিচয় কি? নিশ্চয়ই গুণ্ডা বদমায়েস। এটা মেয়েদের ইস্কুল। অসভ্যতা করলে—

—ব্যাটারা নিশ্চয়ই মেয়ে লুঠ করতে এসেছে বলে গেটটা পুনরায় টেনে দিতে যাবে এমন সময় মান্টি ও মণ্টু তার ঘাড়ের ওপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাত পা বাঁধা মুখের মধ্যে কাপড় গোঁজা অবস্থায় রইলো পড়ে।

পরমুহূর্তেই লাফাতে লাফাতে ওরা ঢুকতে গেল সোজা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ঘরে। হতচকিত প্রধানা শিক্ষয়িত্রী? এতোগুলো লোককে ঢুকতে দেখে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনারা কে? এটা মেয়েদের ইস্কুল। ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হয়। এটা তো সকলেই জানেন। আপনারা ঘরের বাইরে যান। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে যায়। মণ্টু মান্টিকে চিমটি কেটে চুপিসারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—শালা। দিদিমণির দেওয়া জ্ঞান। নাও হজম করো। ততক্ষণে ওরা সকলেই ঢুকে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে মণ্টু এবার বড়দির উদ্দেশ্যে বলে—তা কতক্ষণ আমাদের এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে দিদিমণি? আপনার সঙ্গে আমাদের আলোচনা আছে।

কঠিনস্বরে উত্তর সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো—যতক্ষণ না আমি আপনাদের পারমিশন দিচ্ছি। গেটের দারোয়ানের মাধ্যমে আমার অনুমতি নিতে হয়। কই সে তো আসেনি। মান্টি পাল্টা প্রশ্ন করে—ঘরের খেয়ে আমরা দেশের কাজে এসেছি। তার জন্যও অনুমতি নিতে হবে? প্রধানাশিক্ষয়িত্রী শিবানী দেবী অবাক। আজ পর্যন্ত এই ধরনের আচরণ তিনি কখনও চোখে দেখেননি। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—আপনারা দেশের কাজ করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন? ভালো খুব ভালো কিন্তু আপনারা ঢুকলেন কি ভাবে? দারোয়ান বুঝি গেটে নেই। প্রশ্ন শুনে হো হো করে মণ্টু মান্টির হাসি গড়িয়ে পড়ল। মান্টি মণ্টুর ঘাড়ে বড়রকমের একটা চড় বসিয়ে থুতনী টিপে ধরে বলে—বল্ বল্ তুই বল্ না দারোয়ানটা এখন কি

করছে ? কোথায় আছে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের দারোয়ান ? সে কি করছে এখন ? কোথায় আছে ?

—আপনার দারোয়ান দেখুন হয়তো এতক্ষণ ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। শ্বাস উঠেও যেতে পারে এতক্ষণ। হ্যাঁ শুনুন আপনার দারোয়ান মরুক। আমরা যেজন্য এসেছি সেটার কি করছেন বলুন।

—আপনারাই আগে বলুন কি জন্য এসেছেন। কিন্তু আমাদের দারোয়ানের খোঁজটা আমায় আগে নিতে দিন—এই বলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী উঠতে যাবেন তখন বুক চিতিয়ে দুজনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ তিনি এখন আটক।

—আমরা দেশের কাজ করি এটা বুঝি ঠিক বিশ্বেস হচ্ছে না, না ? আর হবেই বা কি করে ? লালজাতের সঙ্গে পিরীত। লাল পেড়ে শাড়ির, লাল রঙের ওপর পছন্দ থাকলে পর্যন্ত তো আপনি আমাদের চিনতে পারবেন না ? এটা তো জানা কথা ?

—আপনার ইস্কুলের মেয়েরা লালপেড়ে শাড়ী ব্লাউজ কেন পরে তা আমাদের বলতে হবে।

—ওটা তো ইউনিফর্ম। সমস্ত ক্লাশের প্রত্যেক ছাত্রীদের ঐ ইউনিফর্ম পরে ইস্কুলে আসতে হয়। এটা বহুদিনের নিয়ম।

—শুনুন দিদি, আমাদের দল এখন দেশশাসন করছে। আমাদের দলনেত্রী যিনি দেশনেত্রীও। তাঁর নির্দেশে আমরা দেশ থেকে লালরঙের ছোপ, কাজ যা কিছু যেখানে আছে সব মুছে দিতে বেরিয়েছি। দলের সদস্যরা এরই মধ্যে প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে চারদিকে ঘিরে ধরেছে। ওরা কেউ ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে, কেউ গান ধরেছে, কেউ বা পা নাচাচ্ছে।

—কিন্তু রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধীনে এই বিদ্যালয় চলে। শিক্ষাবিভাগ থেকে তো কোন সারকুলার এ সম্পর্কে জারী করা হয়নি। শিক্ষাবিভাগ যদি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ জারী করেন তবেই আমরা তা মেনে নেবো। কারণ ঐ ইউনিফর্ম শিক্ষাবিভাগের দ্বারা অনুমোদিত। তাছাড়া অভিভাবকরা তো কেউ এ সম্পর্কে তাঁদের কোন আপত্তির কথা জানাননি।

—আমরাও তো এক একজন অভিভাবক।

—তাহলে লিখিতভাবে অভিযোগ দিন। আমি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবো। অভিযোগ লিখে দিতে বলায় উত্তেজিত মান্টি বলে—ওসব ছাড়ুন। কোন লিখিত টিখিত নয়। ওসব আমরা মানি না। আমরা এসেছি,

বলছি যা তাই মানতে হবে। আমাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।

—কাল থেকেই ইস্কুলের কোন মেয়ে যেন আর লালপেড়ে শাড়ি আর লাল কাপড় পরে না আসে। কালথেকেই কাপড়ের পাড়ের রঙ হবে সবুজ, ব্লাউজ সবুজ। শুনুন এটা করবেন, বুঝলেন। আমাদের আর অপেক্ষা করার সময় নেই। ঝড়ের মতো আমাদের ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। এক্ষুনি আমাদের লাল তাড়াতে অন্য এক গাঁয়ে ছুটতে হবে।

বাধা দিয়ে বন্ধটি বলল—আচ্ছা তুমি প্রায়ই লাল তাড়ানো বলো। যদি খতম করা দরকার হয়। তখনও কি তাড়িয়ে বেড়াবে?

হেসে বন্ধুর গালে টুস করে একটা চুমু খেয়ে নিয়ে সে বলল—আরে বন্ধু, খতম করার দরকার হলে তো, নাও নাও চলো এখন টমাস অসিতদের খোঁজে বের হতে হবে। রেলের এক ওয়াগন ভর্তি লোহার পার্টস এসেছে গোডাউনে আজ ভোরে। এখনই যদি না বের হই। অসিত টমাসদেব দল সব একাই মেরে দেবে। চলো চলো। চলি বড়দি। কেমন? বলে যেমন উর্দ্ধশ্বাসে ওরা ঢুকেছিল ঠিক তেমনি ঝড়ের মতো ওরা বেরিরে গেল। যাবার সময় চোখ গোল গোল করে শাসিয়ে গেল—কাল যেন দেখি।

ওরা চলে গেল এবার একটা সিনেমা হলে। জোর করে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর আসন দখল করলো। চুপচাপ ছবি দেখতে শুরু করে। পর্দায় ভেসে উঠলো—একটি নিরন্ন পরিবারের সকলে এক জায়গায় বসে ভাতের ফ্যান গিলছে। ওদের ঘরে এক কোণাও খাদ্য নেই। ফ্যান চেয়ে এনেছে পাশের দোতলাবাড়ি থেকে। বন্ধকী পড়েছে নিজের বাড়ি। দোতলা বাড়িওয়ালার খিড়কীর দিকে একটা ধুলোবালি ভর্তি পোড়ো ঘরেই এখন আশ্রয়।

সকাল হলেই এখন ওদের ভরসা ভিক্ষাবৃত্তি। সকলেই ভিক্ষায় বের হতে পারে। বড় মেয়েটি ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পথের ধারে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। মৃতদেহটির চোখের কোণে পিঁপড়ায় ভর্তি। জলঝড়ের মধ্যে ভিক্ষা শেষে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল। সকলেই তখন ফিরে এসেছে! ওই এখন ফিরল। সবায়েরই চোখেমুখে বিষণ্ণ ছাপ। ঘরের ছাদের সবদিক থেকেই যেন জল ঝরছে। শান্তিতে বসে রাত কাটাবার এতোটুকু জায়গা নেই।

ভিক্ষায় বেরিয়ে মেয়েটি যেন কতো কি জানছে। একদিন তার চোখের সামনে চার-পাঁচজন মিলে কার যেন গলা টিপে ধরলো। ও তাড়াতাড়ি একটা মাটির ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে থরথর করে কাঁপতে থাকে। অন্ততঃ আধঘণ্টা

পরে উঁকি মেরে দেখে, না আর কেউ নেই। ধীরপদক্ষেপে ভিক্ষাপাত্রটা নিয়ে সে পথে আবার বের হয়। ঘটনাস্থলে কেউ নেই। কিন্তু আরও কিছুদূরে পথের ওপর পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত একটা দেহ। মেয়েটি চারদিকে একবার লক্ষ্য করল। তারপর ধীরে ধীরে ওর কাছে ঝুঁকে পড়ে। নাকের কাছে হাতটা উলটিয়ে দেখে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। কিছুই পেল না। লোকটা একদম নড়ছে না।

হাঁটতে হাঁটতে ও এগিয়ে চলল। একটা পাকাবাড়ির পিছনের দেওয়ালে একটা ছাপা পোষ্টার সাঁটা। তাতে লেখা আছে—"হিংসা নয় আমরা বাঁচাতে চাই, বাঁচতে চাই।" কথাগুলো বড় কালো হরফে। তার মধ্যে যেন সবুজ আভায় একটা ছোরা ও একটি পাইপগান আঁকা। মেয়েটি কি মনে করে টান মারলো দেওয়ালে সাঁটা পোষ্টারের একটা কোণা ধরে। কোথা থেকে ছেঁড়া বস্তা হাতে একটা লোক এসে দৌড়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ল।

থাকতে না পেরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওরা সমস্বরে চীৎকার করতে থাকে—বন্দেমাতরম্। যুগ যুগ জীও। এ বই আমরা চলতে দিচ্ছি না, দেবো না। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্। সমস্ত হল কেঁপে উঠল। ঘটনায় অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করে। ছাড়া পেয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মণি সেনও দেখছিলেন চিত্রটি। ঠিক এসময় ফাঁকা মাঠে গুপ্ত হত্যার একটা ঘটনা ঘটলো ওদের গলার স্বর আরও তুঙ্গে উঠলো।

দর্শকমণ্ডলী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শুরু হল প্রথমে ছোটাছুটি। অজানিত আশঙ্কায় চেয়ার ছেড়ে অনেকে মেঝেয় পড়ে যায়। কিশোরদের কান্না, মেয়েদের আর্ত চীৎকার। মণি সেনের নেতৃত্বে দর্শকমণ্ডলীর একাংশ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লো যারা ওদের চীৎকারে পাল্টা চীৎকার করছিল তাদের আগ্নেয়াস্ত্র তুলে ওরা বেরিয়ে যায়! শেষপর্যন্ত গেটকীপার গেটখুলে দেয়। অপারেটর বন্ধ করে দিল প্রজেক্টারের কাজ। লাউডস্পীকারে ঘোষিত হল আজকের শো কর্তৃপক্ষ হলের মধ্যে হামলার জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভোট হবেই। তার আগে ভোট যন্ত্রটা ঠিক নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক করে ফেলতে হবে। যারা লাল রঙ ভালবাসে, লালপতাকা শ্রদ্ধা করে। কমুনিষ্টদের পক্ষে বই ছাপায় তাদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে নির্বাচনটাই প্রহসনে পরিণত হতে পারে। কারণ ওরা দেশের শত্রু বিদেশীকে ভালবাসে। এবার নির্বাচনে প্রার্থী উদাসপুরের জমিদার বিশ্বনাথ চৌধুরী। তার পক্ষে অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছে বিটু আর কাশী। কম্যুনিষ্টদের হারাতে হবে। কারণ ওরা গণতন্ত্র মানে না। বিশ্বনাথ চৌধুরীর

বাড়ির ভিতরে চলেছে গোপন মন্ত্রণা সভা। বিন্টু কাশী অবশ্য সেখানে নেই। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে বিন্টু আর কাশীরা দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত। আঁকা হয়েছে সুন্দর গাইবাছুর প্রতীক চিহ্ন। বিন্টু লিখেছে আর কাশী একটা দল নিয়ে আছে পাহারায়। গোপন মন্ত্রণা সভায় যে সিদ্ধান্ত এইমাত্র নেওয়া হয়েছে তা কার্যকরী করার বিন্টু কাশীর ওপর দায়ীত্ব পড়ল। ওদের সঙ্গে যোগ দেবে মণ্টু-মান্টি। ওরা পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যেই। মন্ত্রণা সভায় ওরা যোগ নিয়েছে।

গ্রামের সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন। রাত তিনটে। সাঁওতালপাড়ায় চারজনে পৌঁছালো। গ্রামে চারটে সাঁওতালপাড়া। ওদের এখন কাজ মঙ্গল মুর্মুর বাড়িতে। বড় বড় চারটে মশাল বাঁধা অবস্থায় শোয়া পড়ে রইলো মঙ্গলদের উঠোনে। নিজেদের মুখচোখ মাথা মুড়ে ফেলা হলো কালো কাপড়ে। ওদের প্রত্যেকের পরণে এক পিস গেঞ্জী আর হাফপ্যাণ্ট। একজনের পায়ে ছিল চটি, অন্যদের খালি পা।

মঙ্গলের ঘরের দরজায় টোকামারার শব্দ। ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা ঘুমুচ্ছে অঘোরে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করা যায় তাই দিয়ে বিন্টু দেখতে পায় মঙ্গল আর টুসী পাশাপাশী গভীর নিদ্রামগ্ন। ওদের মাঝে এক শিশুও ঘুমন্ত। সম্ভতঃ নাতি টাতি হবে। বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দেওয়া হ'ল। ঘরের চারপাশ ঘুরে নেয়। চালায় হাত দেয়, টেষ্ট করে দেখে নেয় ভিজা না শুকনো। একটা কেরোসিনের স্প্রে মেসিন থেকে খড়ের চালে কেরোসিন ছিটিয়ে দেওয়া হল। মশাল দুটো ভেজানো হল কেরোসিনে, এবার আসল কাজ।

মণ্টু আর মান্টি খড়ের চালের দুপ্রান্তে গিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিল চালের ওপর। তারপর বিন্টু আর কাশী এগিয়ে আসে। হাতে জ্বলন্ত মশাল। চালের চারদিকে সেই জ্বলন্ত মশালের স্পর্শ। আগুনের ভয়ঙ্কর লেলিহান শিখা। ঘরের ভিতরে চীৎকার। দরজায় শেকল দেওয়া। শিশুকণ্ঠের চীৎকার ধীরে ধীরে থেমে যায়। এরমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ার অন্যান্য ঘরের চালেও আগুনের লেলিহান শিখা।

বেরিয়ে পড় সব ঘর থেকে, 'আগুন, আগুন'। 'আগুন লাগিয়ে দিয়েছে 'ওরা' দু-চারজন বেরিয়ে পড়েছে। অন্যরা বের হতে পারছে না। প্রায় সব ঘরেই বাইরে থেকে শিকল তোলা। খেবলাং কোনক্রমে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে। ভিতর থেকে লাথি মেরে মেরে ভেঙ্গে ফেলেছিল দরজা। দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে

দৌড়ঝাঁপ করতে ঘরের শেকলগুলো খুলে ফেললো। খেবলাংয়ের গলার প্রচণ্ডতম আওয়াজ—'পালাও, পালাও'। পালাও শীগগীরই নচেৎ সকলেই পুড়ে মরবে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েই যে যার গরু ছাগলের দড়ি খুলে দিচ্ছে। কেউ কিছু সঙ্গে নেবার সময় পাচ্ছে না। হাঁসমুরগী সব দৌড়াদৌড়ি করছে। আল দিয়ে আল দিয়ে কেউ কেউ ছুটলো থানায়। ওরা চায় পুলিশ এসে দেখুক, আগুন নেভাতে দমকল আসুক। কিন্তু যারা থানায় গেলো তারাও আর ফিরলো না। যারা গেছলো তাদের বিরুদ্ধে থানায় 'ডাকাতি' আর আগুন লাগানোর অভিযোগ আগেই নথিভুক্তছিল। ওরা সকলেই চলে গেল অন্ধকার হাজতে।

শেষের দিকে একটা ঘরের খড়ের চালে আগুন ছুটলো হাওয়ায়। এক আদিবাসী বৃদ্ধা পুঁটলী নিয়ে সেই চালের নিচে বসে। ভাবছিলো হয়তো কোথায় এবার যাবে। খেবলাং দৌড়ে গিয়ে বুড়ীকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। খেবলাং বলে—মরবার ইচ্ছে হয়েছে বুড়ীর। ইতিমধ্যে আগুনে ঝলসানো নাতিকে নিয়ে মঙ্গল ও টুসী কেঁদে আকুল। ওদেরও প্রায় অর্ধদগ্ধ অবস্থা। নাতি মারা গেছে।

হুটো গরুর গাড়ীতে আহত, মৃত দগ্ধ দেহগুলোকে নিয়ে গাঁয়ের উল্টোদিকের পথ ধরে অন্ধকারে অন্ধকারে চলে যায়। একটা দূর গ্রামের হাসপাতালে ওদের পোঁছে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এই রাস্তা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। মণ্টু, মান্টি, কিন্টু আর কাশী দলবলসহ মূল বড় রাস্তাটি আটকে রেখেছিল।

ভোরের দিকে একটা জীপ ঢোকে গ্রামে। তার থেকে বিন্টু, কাশী, মণ্টু, আর মান্টি নেমে এল। ভিতর থেকে নামলো আরও জন চার-পাঁচ। প্রথমেই শিকার খেবলাং। ওদের দেখেই খেবলাং দৌড়োতে থাকে। বিন্টু আর কাশী ওকে জাপটে ধরে টেনে হিঁচড়ে জীপে তোলে। সবাই জীপে ওঠার পর নিমেষে উধাও সেই জীপ। সেইদিন থেকে খেবলাংকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আর কেউ দেখেনি।

মঙ্গল মারা যায় হাসপাতালে। পাড়া ক্রমশঃ শূন্য হয়ে পড়ে। বিধবা টুসি দিনের পর দিন গুমরে গুমরে মরে।

উদাসপুরের পাশেই চিতলগাঁ। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থী রামবাবু। নির্বাচনে তাঁকে জেতাবার জন্য দলের কর্মীরা চারদিকে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও কাজ করে চলেছে। উদাসপুরের ঘটনাও ঘটে গেছে। কিন্তু কেউই যেন ভীত নয়। চিতলগাঁয় হবে একটা জনসভা। সেখানে রাণীরা সঙ্গীতের স্কোয়াড নিয়ে গেছে।

সভাশুরুর আগে কবির লড়াই আর তরজা জমে গেল। তার আগে একটা দারুণ সাড়া জাগানো গণসঙ্গীত গেয়ে শোনাল রাণী। সন্দীপ চারপাশটা ঘুরে দেখে নেয়। সভায় লোকসমাগমও কম হয়নি। তবু একটা ভয়ের ভাব। সভাটা সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে কিনা সেটাই বড় ভাবনা। কবির লড়াই শুরু হল।

এক কবি বল্লেন—'তোমার আমার সবার বাবা আদিম যুগে বানর ছিল।' জমে গেছে লড়াই। সন্দীপের চোখে পড়ে বিন্টু, কাশী, মণ্টু, মান্টি চারজনে এক জায়গায় চুপিসারে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

সন্দীপের এক দাদা তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে সোজাসুজি বেশ কড়া গলায় বলে—"হয় তোমরা শোনো আর না হয় ডিসটার্ব না করে চলে যাও, আমরা যারা 'কবির লড়াই' শুনতে চাই তাদের শুনতে দাও।"

সুবোধ বালকের মতো ওদের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিল—কৈ আমরা তো কিছু ক্ষতি করিনি।

তবু সন্ত্রাসে আবহাওয়া অনুষ্ঠানের সারা এলাকাটা জুড়ে। একটা নয় গোটা চারপাঁচ ঢিল পড়ল মঞ্চের ওপর আশপাশে। রামবাবুর সামনেও একটা পড়ল। প্রার্থীর বক্তৃতা ছাড়াই কোনরকমে অনুষ্ঠানটি শেষ হল। নির্বাচনী গাড়ীতে উঠে বসলেন যত জন সম্ভব। ভিতরে প্রার্থী। গাড়ী সশব্দে ষ্টার্ট দিতেই সামনের দিক থেকে বিন্টু, কাশী গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। বিন্টুর হাতের শাণিত দায়ের ঘা পড়ল গাড়ীর বনেটে। কাশীর হাতে বড় সাইজের আসল তাজা একটি বোমা। মণ্টু, মান্টিও সামনে অপেক্ষমান। থেমে গেল গাড়ীর গতি। কেউ গ্রাম ছেড়ে না গিয়ে সেই রাত্রিটা কেটে গেল ঐ গ্রামেই। গাড়ী পিছিয়ে সন্দীপদের বাড়ি রইলো শ্যামল। চোখের সামনে সব ঘটতে দেখলো। রাণী শ্যামলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—কাকু, আপনি বাড়ী যান। আপনাকে ওরা খুন করতে পারে। শ্যামল উত্তর দেয়—"তা কি হয় রাণী। আমি রামবাবু সবাই এক সঙ্গেই থাকবো। রাত্রেও তো কোন অঘটন ঘটতে পারে। তবে আজ রাত্রে কেউই ঘুমুতে পারবে না।"

শেষরাত্রে আওয়াজ উঠল—'আগুন', 'আগুন', ওরা একটা চায়ের দোকানের খড়ের চালে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সত্যিই একটা অঘটন না ঘটিয়ে ওরা ছাড়বে না। দোকানদার দত্তবাবু জাতীয়তাবাদী দলের ভক্ত। বাড়ীতে আরামে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। স্ত্রী ঠেলে বিছানা থেকে তুলে দিয়ে বলে—"শোনো, দোকানে আগুন লেগেছে শুনছি। তাড়াতাড়ি যাও। নিশ্চয়ই লাল ঝাণ্ডার ঐ ছোটোলোক

গুলোর কাজ। কাল তো ওরা ফাংশান না কি ছাই করেছে।" দত্তবাবুর কাঁচাঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় স্ত্রীর ওপর চটে লাল। বিছানায় বসে বসেই চেঁচাতে লাগলেন— তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি। লালঝাণ্ডার লোকেদের এতো সাহস হবে না আর তাছাড়া তারা এই ধরনের অপকর্ম করবেই বা কেন? ধুর, আমি যেতে পারব না। ওসব বাজে হৈ চৈ। বলে তিনি যথারীতি সটান শুয়ে পড়লেন। স্ত্রীও নাছোড়বান্দা। তাঁর স্থির বিশ্বাস দোকানে একটা কিছু ঘটেছে। কারণ ঐদিক থেকেই হৈ চৈ-এর শব্দ আসছে। ইতিমধ্যে এক যুবক দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বলে গেল—"দত্তদার দোকানে আগুন জ্বলছে। তাড়াতাড়ি যেতে বলুন। নয়তো সব শেষ হয়ে যাবে।"

স্ত্রীর মাথায় দেখা দিল গোলমাল। তিনি চীৎকার জুড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে এমন কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে বসলেন যে, দত্তবাবু অতিষ্ঠ হয়ে বাইরে বেরিয়ে রাতটা কাটানোই শ্রেয় মনে করলেন।

ঘরের বাইরে বের হতেই দত্তবাবু দেখলেন সত্যি পুকুরটার ওপারে তাঁর যে চায়ের দোকানটা আছে সেটার চালে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর মুহূর্ত অপেক্ষা না করে তিনি চলে গেলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন আগুন লেগেছে এবং দাউ দাউ করে জ্বলছে ঠিকই। কিন্তু পিছনে পুকুর এবং এতো পাড়ার লোক সমাগম সত্ত্বেও কেউই কেন আগুনটা নেভানোর চেষ্টা করলো না। দত্তবাবু বসে পড়লেন মাথাটা চেপে ধরলেন। কেউ কিছু করছে না, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, অথচ চালা ঘরটা পুড়ে ছাই সবাইয়ের সামনে।

ধীরে ধীরে আগুনের লেলিহান শিখা কমতে থাকে। দত্তবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে? বিন্টু আর কাশী একসঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দেয়—যার দোকান তিনি রইলেন বাড়ীতে ঘুমিয়ে, আর আমরা আগুন নেভাবো আর কী?

—কিন্তু আমাকে তো একটা খবরও দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল, নাকী?

—তা ছিল। কিন্তু মাথায় অতোটা আসেনি।

—কিন্তু আগুন লাগালো কে? কি ভাবেই বা লাগলো?

বিন্টু বললো—কম্যুনিষ্টদের কাজ। কাল রাতে ওরা এখানে ফাংশান করেছিল। সব গ্রামেই আছে।

দত্তবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিন্টুর কথা শুনে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বল্লেন—এ পাড়াটা আমাদের দখলে। ওদের সাহস কি

এ-পাড়ার এতোবড় অপরাধ করে। এসব আমি বিশ্বাস করি না। কাশী দাঁত ভেংচে বলে—তবে কি আমরা আগুন লাগিয়েছি।

—কারা লাগিয়েছে আমি যখন দেখিনি বলতে পারবো না। তবে ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ হবে না। আমি থানায় যাবো। কেশ হ'ক।

এক অর্ধবৃদ্ধ ব্যক্তি দত্তবাবুর কানে কানে কি বলছিল। তার কথাশুনে দত্তবাবু চীৎকার করে ওঠেন—"হতেই পারে না। আমি মিথ্যা জীবনে বলিনি আর বলতেও পারবো না। তাতে তোমরা আমাকে দলে রাখো আর ছাই না রাখো। আমার ঘরে যে আগুন দিয়েছে তার কাছ থেকে আমি সুদশুদ্দ, আসল আদায় করে তবে ছাড়বো।" দত্তবাবু বেই উত্তেজিত। হন হন করে বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন। পিছন পিছন বিল্টু-কাশী দৌড়াতে থাকে। ওরা হাত পা নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতে দত্তবাবু তারস্বরে চীৎকার করে সকলে যাতে শুনতে পায় এমন করে বল্লেন—"তোমরা নিজেরা নিজেদের দলের লোকের ঘরে আগুন লাগালে ? আমার এভাবে সর্বোনাশ করলে ? ওদের কিছু ক্ষতি হল না। কিন্তু আমার সংসার কাল থেকে চলবে কি করে ভেবেচো একবারটিও।" দত্তবাবু আর না দাঁড়িয়ে বাড়ী চলে গেলেন।

শ্যামলরা যে বাড়িতে রাত্রে আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকে এসব দৃশ্যই স্পষ্ট চোখে পড়ে। রামবাবু পরদিন থানায় উপস্থিত হয়ে সব কিছু উল্লেখ করে প্রতিকারের দাবী তুলতে অফিসার ইনচার্জ কিছু করার অক্ষমতা জনিয়ে বল্লেন—"ডায়েরী আমি লিখে নিচ্ছি। কিন্তু—কিছু হবে না এটা জেনে রাখুন। এটাই নির্দেশ। আমরা অসহায়।"

জমিদার বিশ্বনাথ চৌধুরী ইদানীং পূর্বের তুলনায় একটু বেশী ফ্রি হয়েছেন বলে সকলেই মনে করে, কেন না পূর্বে তাঁকে এতো হাসিখুশী দেখা যেত না। এতো ঘন ঘন ঘোড়ার গাড়ী চাপতেন না। ইদানীং আর অটল ক্ষেত্রপাল আর তার দলবলসহ নিয়তই 'জোতদারের বেনাম জমি ছিনিয়ে নাও, বিলিয়ে দাও' শ্লোগান দিতে দিতে মুহূর্তের মধ্যেই পাঁচশ' লোক জড়ো করতে যায় না। হয় তো বা পারেও না। আন্দোলনে ভাঁটার টান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা এখন অনেক সক্রিয়। জোতদার ডাক দিলেই ছুটে আসে। তবে বড় ছেঁচকা। ফিরে এসেই হাত পেতে বসে।

বিশ্বনাথের হিসেবে কিছুটা গরমিল তো ছিল। নাহলে আবার সেদিন মিছিল বের হয়। আর কেউই খালি হাতে নয়। আর নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই অটল

ক্ষেত্রপাল আর খালেক। তাদের নেতা রঞ্জিত। বিশ্বনাথবাবু যেমন বুনো ওল, রঞ্জিতবাবু তেমনি বাঘা তেঁতুল। বিশ্বনাথবাবুদের বেনামী জমির হিসেব রঞ্জিতবাবুর কাছে সব আছে। ওদের ঠিকুজি কোষ্ঠিও পাওয়া যাবে। সরকারের সঙ্গে এ-নিয়ে অনেক লড়াইও হয়ে গেছে। বিশ্বনাথবাবু জমি বাঁচানোর তাগিদে তাঁর নিজের গ্রামেই এক সময় সেটেলমেণ্ট বিভাগকে ক্যাম্প করতে দিয়েছিলেন।

ভাগচাষী রেকর্ড করানো। প্রাপ্য মজুরী দেওয়া আর সর্বশেষে চৌধুরী পরিবারের বেনামী জমি দখলের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এক বিশাল মিছিল বেরিয়ে পড়ে। রঞ্জিতবাবুও সেদিন সেখানে উপস্থিত।

মিছিল চৌধুরী পরিবারের প্রাসাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় চৌধুরীদের কেউ হঠাৎ গুলী ছুঁড়ে বসল। মিছিলে অংশগ্রহণ কারী প্রথমে ছিল কয়েকশ'জাত, এখন কয়েক হাজার। বন্দুক কেড়ে নেওয়ার দাবী উঠল। মিছিল গ্রাম ঘুরতে থাকে। এ-গ্রাম ছেড়ে পাশের গ্রামে যাবার উদ্যোগ নেয়।

ঘুরপথে রঞ্জিত শুনলো অটলের বাড়ি আক্রান্ত। চৌধুরীদের ভাড়াটে লোকেরা অটল বাউরীর মায়ের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। প্রহারের চোটে তিনি অজ্ঞান। ঘরের চালের টালি দুমদাম ভাঙ্গছে রঞ্জিতরা ঘুরে দাঁড়ায়। মিছিলের স্রোত বাঁকা পথে ঘুরে এলো। হাতে টাঙ্গী আর মোটা লাঠিসহ ঝাণ্ডার দৌড় দেখে ভাড়াটেদের অবস্থা 'যঃ পলায়তি স জীবতি'।

শান্তিরক্ষাকারীর একটা দল নিয়ে থানার মেজকর্তা বটতলায় চলে এলেন। রঞ্জিতকে পেয়ে অনুরোধের সুরেই বল্লেন—রঞ্জিতবাবু, ঘটনা যাই হোক, আপাততঃ দু-পক্ষ বসে একটা মীমাংসা করে নিন।

—কিন্তু মীমাংসা কোথায় হবে?

—আপনার আপত্তি না থাকলে থানায়। আপত্তি নেই তো, চলুন তাহলে। জীপে রঞ্জিতকে তুলে নিয়ে মেজকর্তা সিগারেটটা ধরিয়ে নিজেই ষ্টার্ট দিতে যাবেন এমন সময় সদর প্রেরিত একদল সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে ডি. এস. পি. মিত্র এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। ছটপট গাড়ী থেকে নেমে কোমরে হাত দিয়ে নায়কের ভঙ্গীতে কথা বলে—অনেক দেরী হয়ে গেল। কি মেজবাবু, লালঝাণ্ডার চামুণ্ডারা কোথায় গেল। পুলিশ দেখেই ফুড়ুৎ।

মেজবাবু স্যালুট করে আগে থেকেই। মিত্তির সাহেবের সামনে জড়োসড়ো অবস্থা। গলা দিয়ে অনভ্যাসের স্বর বেরিয়ে এল।

—না স্যর, পেয়েছিলাম স্যর, চলে কিছু গ্যাছে স্যর। ওরা স্যর, মীমাংসা চায় স্যর।

আগুন যেন এ-কথাতে দপ্ করে জ্বলে উঠল। ঘোঁত ঘোঁত করে ডি. এস. পি. হুঁঙ্কার ছাড়ে—কিসের মীমাংসা? সব আরেষ্ট করো। লালঝাণ্ডাগুলো কেড়ে নাও, ওগুলো সব আগুন ধরিয়ে দাও। গাড়ী ঘোরাও, চল পাড়ার মধ্যে। সব পাকড়াও করা হবে।

গাড়ী ঘোরাতেই মিত্তিরের চোখে পড়ল কে যেন জীপের মধ্যে বসে।

—কি মেজবাবু, আপনার জীপের মধ্যে পাজামা পরা লোকটি কে?

—আজ্ঞে স্যর, রঞ্জিতবাবু।

—কে রঞ্জিতবাবু, ওঁকে কি অ্যারেষ্ট করা হয়েছে?

আজ্ঞে না। ঐ যে বলেছিলাম মীমাংসার কথা। ওঁকে থানায় নিয়ে যাচ্ছিলাম।

—এ্যাই, ভেতরে কে? চলে আসুন তো দেখি। মুখটা নিদেনপক্ষে বাড়ান। রঞ্জিত মুখটা বাড়ায়। ওকে দেখেই মিত্তির চীৎকার করে ঘোষণা করে, ওকে অ্যারেষ্ট করা হল।

—কিন্তু স্যর, ওকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ওঁকে গ্রেপ্তার করা—

—চোপরও শালা শো'র বাচ্চা। অফিসার হয়েছো—কাজ জানো না, বলে সকল পুলিশ কনষ্টেবল আর বন্দীদের সামনে ঠাস করে চড় মেরে বসল। মেজদারোগার টেম্পারেচার যেন শূন্য তাপাঙ্কে'রও নিচে চলে গেল।

—তোল। ওকে আমাদের ভ্যানে তোল, শালা গান্ধী হবার ইচ্ছা হচ্ছে। শালা মার্কসেরও দিন নেই, গান্ধীরও দিন নেই। রাজনীতিতে সব শালাই সমান। রঞ্জিত আর তার দলবলকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হল। মুহূর্তের মধ্যে ভ্যান উধাও। কোন দিকে কোথায় যে গেল কেউ জানে না। কিছুকাল পর সকলেই প্রত্যেকে চারহাজার টাকার জামীন বণ্ডে সই করে হাজত থেকে বেরিয়ে এল।

নির্বাচনী ঢাকের আওয়াজে আকাশ-বাতাস মুখরিত। রঞ্জিতরা মুক্তি পেয়ে একটা নির্বাচনী কাজে নেমে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল। ডাক্তারপাড়া, নবাবপুর তারপর বিলাশপুর। বিলাশপুরে কৃষকসমিতির অফিস থেকে গুণ্ডারা লালঝাণ্ডা নামিয়ে তেরাঙা ঝাণ্ডা তুলেছে, অফিস সম্পূর্ণ ওদের দখলে। এই অফিস পুনরুদ্ধার করতে 'লংমার্চ' করার সিদ্ধান্ত হল।

সমিতির ঝাণ্ডার নিচে কয়েক হাজার কালো মানুষ উস্কো খুস্কো চুল আর

সাতজন্মের ময়লা কাপড় টুকরো কোমরে জড়িয়ে বিলাশপুরের বেদখল হয়ে যাওয়া সমিতির অফিসের সামনে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ঘনঘন শ্লোগান দিচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল ঢ্যাঙ্গা চেহারা লম্বা চোঙা প্যান্ট পরা, একমাথাচুল নিয়ে মন্টু, মান্টি, বিল্টু আর কাশী একটা দলবল নিয়ে জীপে চেপে দৌড়ে এল। জীপ থামলে তা থেকে নেমে আসে উগ্রমূর্তি নিয়ে পার্বতী। তার কোমরে নাকি সবসময় রিভলবার থাকে। গলার স্বরে বিন্দুমাত্র মেয়েলীভাব নেই।

ওদিকে সমিতির লোকজনের সঙ্গে আছে রঞ্জিত, রামলোচন, দেবব্রত, মাধুরী আরও অনেক নেতা। আছে দুজন বেশ ভারীদরের সংসদ সদস্য। সবাই একটা ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করছে। ওদিকে চীৎকার করে নাচানাচি চলছে—"ধোলাই হবে, পেটাই হবে।" আর সমিতির লোকজনের সরব আওয়াজ—"আমাদের সংগ্রাম চলছে। পার্বতী সত্যি বুঝি পাগলিনী। নিরাবরণ দেহে নৃত্য করছে। তার সঙ্গে ছেলেরদল শরীরের অঙ্গভঙ্গী করে তাল মেলাচ্ছে। পার্বতীর হাতের অস্ত্র উর্ধে তুলে ধরেছে। ওদিকে সমিতির লোকজন ধনুকের গুনে টান দিচ্ছে। অনেকক্ষন এইভাবে চললো। হঠাৎ একটা গুলী একজনের চোখ আর কানের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। এ-থেকেই উত্তেজনার আগুনে দাবানল শুরু। হঠাৎ উভয়পক্ষের মাঝখানে থানার সেই মেজদারোগার উপস্থিতি আর দাঙ্গা থামাতে অমানুষিক প্রয়াস আগুনে জল ঢেলে দেয়।

ঘটনার প্রতিবাদ করতে মন্ত্রণা সভা আহ্বান করা হল। রাত্রে সকলে একত্রে বসলেন। চূড়ান্ত হল নতুন কর্মসূচী। এবার জনসভা ডাকা হ'ক। সকলেই একমত। কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত করা হবে। রঞ্জিত, রামলোচন, সন্দীপ, একত্রে বসে স্থির করে দিনক্ষণ। রামলোচন প্রস্তাব করলো একজন বক্তার নাম। সকলেই বললো—এমন বক্তাকে পাওয়া গেলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে কি? এ-দুঃখের রঞ্জিতের মনের কোণে বারংবার উঁকি দেয়। শেষে স্থির হল—ওঁকে পাওয়া যাক আর নাই যাক, বিশাল একটি জনসভা আমাদের অর্গানাইজ করতেই হবে। জনসভা হ'ল। জনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রামলোচন। প্রথমে রঞ্জিত কিছু বল্লেন। তারপর প্রধান বক্তা উঠতেই রাস্তার ওপর থেকে জোর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

বক্তা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন একটানা জোরালো ভাষা। শত্রুপক্ষের হাড়ে কাঁপুনি দেওয়ার কথা। ঘনঘন হাততালি। বক্তৃতার তোড়ে কখনও প্রবল উত্তেজনা সারা মাঠে উথালপাথার, আবার কখনও বা স্তিমিত ভাব। কখনও

শ্রোতাদের চোখে ঘৃণার আগুন। কখনও বা সহকর্মীতার ভাব বক্তার দুহাত কখনও বুকের সামনে, কখনও সামনে। কখনও শ্রোতাদের কাছে জিজ্ঞাসা, কখনও আত্মজিজ্ঞাসা, কয়েক সহস্র মানুষের জনসমুদ্র। উত্তাল উত্তপ্ত জলরাশি।

বক্তার ভাষণের মাঝপথে বারংবার বাধা দান। "জনসমুদ্রের শেষে বড় পিচঢালা রাস্তায় উপচে পড়েছে মানুষের ভীড়। তার ওপারে একদল ষণ্ডামার্কা তাগড়া তাগড়া চেহারার যুবকদের নিয়ে ঘনঘন শ্লোগান দিচ্ছে নেত্রী পার্বতী। পার্বতীর পোষাকে আঁটা দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তিসম্বলিত ব্যাজ। পার্বতীরা শ্লোগান দিচ্ছে—'এশিয়ার মুক্তিসূর্য জিন্দাবাদ' 'মার্কসবাদ ধ্বংস হ'ক।" কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল বিকট আওয়াজ। কর্ণবিদারী শব্দ। বোমা ফেটেছে কাছাকাছি কোথাও।

জনসভার প্রধান বক্তা গর্জে উঠলেন মঞ্চ থেকে—কে পুলিশ অফিসার আছেন ওখানে? কয়েকটা গুণ্ডাকে থামাবার মুরোদ যদি আপনাদের না থাকে, তবে আমি আমার দলের ভলান্টিয়ারদের বলি ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিতে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন। শুরু হল পুনরায় বক্তার ওজস্বিনী ভাষণ।

জনসভার সকলে উৎসাহিত হয়ে রঞ্জিতবাবু, রামলোচনবাবুরা পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করলেন বিলাশপুরে প্রবেশ। ডাক্তারপাড়া আর নবাবপুরের মাঝামাঝি। যে জয়নাল সাহেবের স্মৃতিবিজড়িত বিলাশপুর, নিষিদ্ধ গ্রাম।

রঞ্জিতবাবু রামলোচনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন—বিলাশপুরে আমাদের যেতে হবে। ও গাঁয়ের মানুষ কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে। বিলাশপুর ঘুরে আমাদের যেতে হবে নবাবপুরে।

—নবাবপুরে গিয়ে কি করবেন? বিলাশপুর যখন ধরছেন সেটাই ভালো করে ধরুন।

রঞ্জিতবাবু সংশোধন করে দিলেন রামলোচনবাবুর ধারণা। বল্লেন—এটা বোধহয় ঠিক হবে না। দুটো গ্রামের অবস্থা মোটামুটি এক। এক কাজ করা যাক। দু-একজন পার্লামেণ্টের মেম্বরকে বলুন ঐ গ্রামগুলোর প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখে যেতে।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন দুজন পার্লামেণ্টের মেম্বর। তাঁরা ঢুকতেই বুঝলেন কেমন যেন দমবন্ধ অবস্থা। রঞ্জিত, রামলোচন সঙ্গে আছেন। আর আছেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছুটে আসা কয়েক হাজার মানুষ। ওঁরা গেলেন জয়নালের বিধবা পত্নীর প্রতি সমবেদনা জানাতে। প্রবল ঝড় বয়ে গেছে তাঁর শরীর ও মনের ওপর

দিয়ে। তবু নিজেকে মানাতে পারলেন না। আবেগে হাউ হাউ কান্না।
ফিরোজা দুই শিশুপুত্রের হাত ধরে দরজা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে বিদায় দিলেন ওদের।
হাত নেড়ে ফিরজা কথা বল্লেন—দেখবেন। আমার মতো কেউ যেন আর এইভাবে বিধবা না হয়। চোখে জল নেমে আসে। হাত দিয়ে মুছে দীর্ঘক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন পাঁচ সন্তানের জননী, যতক্ষণ না সকলে চলে যায় দৃষ্টির অগোচরে।

নবাবপুরে হাজির যে কয় হাজার মানুষ তাদের অনেকে এসেছে দূর দূর গ্রাম থেকে। কেউ চিতলগাঁ, কেউ হুগলীগেড়ে, কেউ বা শাম্পকপোঁতা, তেজপুর, বিলাশপুর, বা রামগড় থেকে। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, ট্রেনে চড়ে, বা বাসে। জয়নালের লাশ হয়ে যাওয়া সকলকে পাগল করে তুলেছে। হাতে ওদের লালঝাণ্ডা।

নবাবপুরে এসেছিল রামগড় থেকে বৃদ্ধ ইসলাম যে একজন চারবিঘার ভাগচাষী। প্রশ্ন জেগেছে মনে তার, তাই একটু সাহস করে এগিয়ে এসে পার্লামেন্টের মেম্বরকে সোজাসুজি বলে বসলো—আচ্ছা, সরোজবাবু, ট্রেনের গায়ে ছাপা পোষ্টাব দেখলুম বিস্তর। তাতে লেখা আছে—'হিংস্রতা বর্জন করুণ, বেঁচে থাকুন, বাঁচতে দিন'। দেখলাম সরকার ছাপিয়েছেন ঐ পোষ্টার। তাহলে কেন জয়নাল বাঁচতে পারলো না? কেন তাকে যারা বাঁচতে দিল না তাদের নামধাম জানা সত্ত্বেও এখনও ধরা হলো না?

সরোজবাবু জানেন সবই। কেন জয়নালের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল তার কারণ তিনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু এই মুহূর্তে সবিস্তারে বৃদ্ধকে তিনি কি বোঝাবেন?

বৃদ্ধ এবার সরোজবাবুর কাছে ঘেঁসে আসে। মুখটা তুলে অনুরোধ করে বলে—শুনেছি। আপনারা দু'জনে নাকি একেবারে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন? জয়নাল কেন বাঁচতে পারলো না তার উত্তর নিশ্চয়ই তাঁকে প্রশ্ন করলে পাওয়া যাবে? তাঁকে কি একবার জিজ্ঞেস করতে পারেন না? সরোজবাবুর পাশ থেকে এবার উত্তর দিলেন দীপেনবাবু, শ্রমিকনেতা দীপেন ভট্টাচার্য—'ইসলাম সাহেব, তাঁকে আমরা প্রায়ই এসব ঘটনাই জানাই, কিন্তু তিনি তো সব অবাস্তব আর ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন।"

এ-কথায় ঘাড় নাড়ল ইসলাম সাহেব। অনুচ্চ-কণ্ঠে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে বলল—"কিন্তু শুনেছি উনিই নাকি একমাত্র মানুষ যিনি ইচ্ছা করলেই এই রক্তঝরা পারেন বন্ধ করতে।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধের।

চলেছে সেই মিছিল, কর্ণবিদারী সহস্রকণ্ঠের আওয়াজ। সংগ্রামকে দীর্ঘজীবী করার আওয়াজ। চলেছে কয়েক হাজার লোক। হাতে লালপতাকা। হঠাৎ গুলীর আওয়াজ। একজনের কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। সরে দাঁড়াতে প্রাণে বেঁচে গেল লোকটা।

ভোটের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা কারাগারের মধ্যেও। ভোট দেবেন বন্দীরাও। যারা বিনাবিচারে বন্দী। পরীক্ষা হচ্ছে ভোটদানের গণতান্ত্রিক অধিকারের।

একনম্বর ওয়ার্ডে কমছে নেতাদের ভীড়। হাইকোর্টের আদেশে ছাড়া পেয়ে চলে গেছেন সঞ্জয়, বিকাশ, রুগ্নকবি সুখেন্দু। সুখেন্দুর 'চ্যালেঞ্জ, এ ওপেন্ চ্যালেঞ্জ, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন ধ্বনিত হচ্ছে চারদেওয়ালের মধ্যে। দেবব্রত অনেকদিন মুক্তি পেয়ে চলে গেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরীরা ঢুকতে দেয়নি তাঁর ইস্কুলে। চলে গেছেন নেতা মণি সেনও। ভোটযুদ্ধে সৈনিক হতে পারবে না বলে মুক্তি পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে কেউ কেউ। কখন কে যে ছাড়া পাবে কেউই বলতে পারে না। অবশ্য যার কেশ অগ্রাহ্য করেছে হাইকোর্ট একমাত্র তিনিই নিশ্চিন্ত।

নির্বাচনের সকালে ভোট দেওয়ার জন্য ডাক পড়ল প্রথমেই শ্যামলের। গোপন ব্যালটে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এখানেও। একই ধরনের গোপনব্যবস্থা।

শ্যামল অফিস ঘরে ঢুকতেই হাতে তুলে দেয় ব্যালট পেপার। সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে কালির ছাপ দেওয়াব জন্য জেলরবাবু বামহাতটা চাইলেন। ঘরের মধ্যেই একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে সীলছাপ আর ব্যালটপেপার নিয়ে দাঁড়াল শ্যামল। ছাপ মেরে জেলরের সম্মুখে রক্ষিত একটা বাক্সে গুঁজে দিয়ে সে চলে আসে ওয়ার্ডে। আবার একজনের ডাক আসে। এইভাবে চলে ভোট গ্রহণ। আটজনের ভোটদানের পর আর তো কারুর ডাক আসে না। হলের মধ্যে একজন মন্তব্য করে—হয়ে গেল ভোট গ্রহণ? আমরা যে বাকী রইলাম। তখনও বাকী একশ ত্রিশজন।

ছুটে গেল শ্যামল জেল অফিসে। সুপারের কাছে সোজা প্রশ্ন—কি হ'ল. দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল আপনারা যে আর কাউকে ভোট দিতে ডাকছেন না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নরম সুরে উত্তর দেন—"আমাদের কাছে যাদের নামে ব্যালট পেপার এসেছিল তাদেরই ডেকে ব্যালট পেপার দিয়েছি। আর কারুর

নামে আসেনি ?"—প্রশ্ন করতেই সুপারের পাশের চেয়ারে বসা জেলরবাবু চটপট উত্তর দিলেন—"না। যাদের নামে এসেছিল তাদের প্রত্যেককে ডাকা হয়েছে।"

—কিন্তু আমরা এক নম্বরে যে একশ ত্রিশ চল্লিশজন বিনাবিচারে আটক আছি প্রত্যেকেই তো ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেছিলাম।

—ডি. আই. বি. অফিসার আমাদের হাতে ঐ আটজনের নামেই ব্যালট পেপার দিয়ে গেছেন আজই সকালে।

ব্যর্থ চেষ্টা করে গেটে দরজা গলিয়ে অফিস পার হতেই আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামল। পাশেই 'অতি বিপ্লবী'দের কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে—"ভোটযুদ্ধ বানচাল করুন।" সেলের বারান্দায় দাঁড়িয়েই চীৎকার করছে ওরা। শ্যামলকে দেখতে পেয়ে বেড়ে গেল যেন ওদের গলার জোর। অবস্থা দেখে সন্ত্রস্ত জমাদার তাড়াতাড়ি শ্যামলকে নিজ ওয়ার্ডে চলে যেতে অনুরোধ করল।

একরকম জমাদার তাকে টেনেই নিয়ে চলে গেল।

রোজকার মতো আজ আর সন্ধ্যায় 'হাউস' বসেনি, এক একটা কমিউনে দু-তিনজন করে খুবই নিচুস্বরে গল্প-গুজব করছে। চোখমুখ দুশ্চিন্তার ছাপ সবারই। কানে এল বাইরে রাস্তায় কয়েকবারই গুলী চলার আওয়াজ। তবে রোজকারের একটা ছবি আজও দেখা গেল। সেটা হ'ল 'চা তৈরী করা'। প্রত্যেক কমিউনেই সন্ধ্যার সময়ে চা তৈরী হচ্ছে। সকলেই গেলাসে চাযে চুমুক দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অন্যমনস্ক চোখেমুখে উদ্বিগ্নের ছাপ আছড়ে পড়ল।

ওয়ার্ডের বাইরে চাতালে একটা কিছু আছড়ে পড়ল। সঙ্গে বিকট কর্ণবিদারী আওয়াজ। বোমা ফাটার আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। বাতাসে বারুদের গন্ধ।

জেল অফিসে কেউ আছে বলে মনে হয় না। এইরকম প্রবল শব্দ শোনার পর তাহলে কেউ না কেউ ছুটে আসতো। কিন্তু কাউকেই খোঁজ-খবর করতে আসতে দেখা গেল না। একনম্বরের সামনেই কারা প্রাচীর। যদি এই ধরনের বোমা খোলা জানলা দিয়ে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে ঘরের মেঝেয় তাহলে পরিস্থিতিটা কি হবে সেটা ভেবেই সকলে শিউরে উঠল। কেউ হয়তো জানবে না এ-রাজত্বে কারাগারে বন্দীদের ওপর বাইরে থেকে আক্রমণও বাদ যায় না। বন্দীরা 'জেলরবাবু', 'জেলরবাবু' বলে হাজার চীৎকার করেও কোন সাড়াশব্দ পেল না।

শ্যামলের মনে পড়ে একবার রাজবন্দীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে জেলর, সুপারের

সঙ্গে যখন সুপারের অফিসে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছিল তখন জেলর উত্তেজিত হয়ে মুখ ফসকে মণি সেনকে বলে ফেলেছিলেন—আপনারাও তো সরকার চালিয়েছিলেন, তখন কারো সংস্কার করেননি কেন? কি করে করেছিলেন তখন?

মণি সেন ঝটিতি উত্তর দেন—"ফ্রন্টের আমলে আমরা আর কিছু করতে পারি আর না পারি কয়েকজন উদ্ধত অফিসারকে শায়েস্তা করেছিলাম।" আর এরপরই ভেস্তে গেছলো সমগ্র আলোচনা। পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে আলোচনা আর এগোয়নি। শ্যামল পাশে বসা বন্ধুর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে—এই আড়াই বছরে বহু অফিসার হয় ভীত, সন্ত্রস্ত আত্মসমর্পিত হয়ে গেছে। নাহলে জেলেরমধ্যে রাজবন্দীদের হত্যা করার জন্য বোমা ছোঁড়া হচ্ছে এটা জেনেও কেউ খবর নেয় না কেন? জেলের মধ্যেই যখন এ-অবস্থা তখন বাইরে তো নিশ্চয়ই প্রলয়ঙ্করী সব কাণ্ড ঘটছে। এভাবে নির্বাচন এদেশে কখনও হয়নি।

নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর দুদিন পরে একজন সাফাওয়ালা এসে চুপিসারে কোমর থেকে বার করে শ্যামলের হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়েই দ্রুত পায়ে ময়লা সাফ করতে চলে গেল। শ্যামল খোলা জানলার ধারে বসে একমনে কি একটা বই পড়ছিল মেয়াদী যাবার সময় বলে যান—"চিরকুটটা জেল সেপাই কুণ্ডুবাবু বয়ে এনেছে। সবদিক সামলে তারপর আপনাকে দিতে হবে বলে দিয়েছে, আমি চল্লুম, কাজ পড়ে আছে অনেক।"

চিরকুট বলে যা এসেছে আসলে তা এক বিরাট চিঠি। রঞ্জিত লিখেছে। এমন সেটা দলা পাকিয়েছে যে, লেখা উদ্ধার করতে হিমসিম খেতে হবে। চিঠিটা এই রকম।

"প্রিয় শ্যামল, আশাকরি তুমি ভালো আছো আর সহবন্দীরা ভালো আছেন। নিবাচন পর্বটা শেষ হয়ে গেল। তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। পৃথিবীর কোন স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে এমন অবাধ ও ন্যায় নির্বাচন হয়েছে কিনা জানি না। চারদেওয়ালের বাইরে কেমন ভোট হল তা জানতে নিশ্চয়ই তোমরা চাও।

নির্বাচনের দিন আগে আগে মুখের সামনে ভোটারদের ভোটদানের জন্য বিরাট লাইন পড়তে দেখতাম। এবার সেটা চোখেই পড়ল না। আগে ভোট দিতে দিতে রাত হয়ে যেতো। এবার রাত তো দূরের কথা, বেলা দশটার মধ্যে ভোট গ্রামে শেষ। কষ্ট করে ভোট দিতেই হয়নি অনেককে। তাদের ভোট তাদের আসার আগেই ছাপ মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভোট

গণনাকেন্দ্রে যখন ঢুকেছিলাম তখন কেমন যেন গা-ছমছম করছিল। শেষ পর্যন্ত গণনাকেন্দ্রে টিকতেই পারিনি। বাঁচার জন্য পালিয়ে এসেছি। তোমরা চারদেওয়ালের মধ্যে আছ, আমাদের অবস্থাটা নিশ্চয়ই কল্পনা করছো।

তোমার মেয়াদ তো শেষ হয়ে এলো। সাক্ষাতের জন্য সকলে অধীর হয়ে উঠেছে।"

অভিনন্দনসহ

তোমার রঞ্জিতদা।

রঞ্জিতের লেখা চিঠিটা ঘুরিরে-ফিরিয়ে পড়ে নেয় শ্যামল। পড়া শেষ হলে সেটা যত্ন করে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেয় রাত্রে হাউসে পড়া হবে। সকলে জানুক কারাগারের বাইরে কি বেগে ঝড় চলছে।

চিতলগাঁয়ে ভোট শুরু হয়েছিল সকাল সাড়ে আটটায়। যদিও নিয়মমতো সকাল সাড়ে ছটা থেকেই পোলিং ষ্টেশনে ভোট নেওয়া শুরু করার কথা। তা হয়নি। সাড়ে আটটা থেকে বেলা বারোটা, ব্যস, তারপর আর কেউ নেই লাইনে। আর এই কেন্দ্রেই গতবছর ভোট নেওয়া চলেছিল রাত আটটা পর্যন্ত।

চিতলগাঁয়ের হাইস্কুলে ভোট নেওয়া হবে স্থির হয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহন চট্টরাজ মশায় আগের দিন সন্ধ্যায় বিল্ডিংয়ের বারান্দায় বসে কিছুটা হাওয়া খাচ্ছিলেন। খুব গরম পড়েছে সেদিন। ভাবছিলেন আগামীকাল সারাদিন ভোট নিতে হবে। সকাল ছটা থেকেই সব দলে দলে ভোট দিতে লাইন দেবে। ভোট নিতে বিকেল গড়িয়ে হয়তো বা হবে রাত কাবার। সেই চিন্তা মাথায়। হয়তো সারাদিন তাঁর খাওয়া-দাওয়ারই সুযোগ হবে না। তারপর নানা ঝামেলা পোহানো। কে লাইনে তার দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য ফিসফাস করে প্রচার করছে তার বিরুদ্ধে নালিশ। কে ভোট দিতে এসে দেখে পুরুষের জায়গায় তাকে স্ত্রী করা হয়ে গেছে, এই অপরাধে তাকে ভোট দিতে দেওয়া নিয়ে কোন পোলিং এজেন্টের প্রবল আপত্তি। আর তা উপেক্ষা করে তাকে ভোট দিতে দেওয়ানো। কার বয়সে গোলমাল, কার পার্ট পরিবর্তন হয়ে গেছে। এইরকম হাজারো অভিযোগ শোনা আর যথাযথ প্রতিকার করা। আবার তা করতে গিয়ে অন্যপক্ষের বিরাগভাজন হওয়া। বলবে হয়তো প্রিসাইডিং অফিসার 'পারশিয়ালিটি' করছেন। মোহনবাবু অন্যমনস্ক হয়ে এসব চিন্তায় মগ্ন, এমনসময় আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় উঠল, ধূলিঝড়। পোলিং

অফিসার সবাই এসে পৌছাননি এখনও। যিনি এসে গেছেন, তিনিও বাইরে গেছেন, ফিরবেন হয়তো রাত্রিতে। ইস্কুলের বেয়ারাও গেছে নিজের বাড়িতে। খেয়ে এসে আজ ঐ স্কুলবিল্ডিংয়েই রাত কাটাবে। সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর লোকেরা হাজির। তাদের ছাউনি ফেলেছে ইস্কুল গেটে ঢোকবার মুখেই।

ঝড়ের মধ্যেই ফুলশার্ট জামা প্যান্ট পরিহিত ছুটি যুবক ঢুকলো ইস্কুলের মধ্যে। একেবারে হেডমাস্টারের কাছে। চমকে উঠলেন মোহনবাবু। কাউকে চিনতে না পারায় জিজ্ঞেস করলেন—কে, কে আপনারা, কি চান ?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন উত্তর দিল—স্যর, আমি কাশী, উদাসপুরে বাড়ি চিনতে পারছেন না। আমি তো আপনার ছাত্র, স্যর।

অপরজন তার কথায় জের টেনে বলে—হ্যাঁ স্যর আমিও তো পড়তাম, পাশ করতে পারিনি অবশ্য ফাইনালে আমার নাম বিল্টু।

কিছু একটা আশঙ্কা অনুভব করে প্রিসাইডিং অফিসার কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—তা কি চাও তোমরা এই সন্ধ্যাবেলায় ? কি করে ঢুকলে ভেতরে ? সিপাই পাহারা নেই ?

কথাগুলো শুনে ওরা দুজনেই একচোট হেসে নিল। হেডমাস্টার মশাইয়ের গুরুগম্ভীর স্বর। কাশী বলল—স্যর, আপনার সঙ্গে আমাদের কয়েকটা কথা আর কিছু সামান্য কাজ আছে।

মোহনবাবু বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লেন—এখন এসময়ে এখানে কি আবার কথা তোমাদের ?

স্যর, ব্যালট পেপারগুলো কোথায় ? ওরা ব্যালট পেপারের খোঁজ নিতেই মোহনবাবুর পূর্বের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হতে থাকে। তিনিও পাল্টা প্রশ্ন করেন—কেন ? ব্যালট পেপার দিয়ে কি হবে ? সেসব পুলিশ অফিসারের হেফাজাতে।

কাশী দৃঢ়স্বরে বলে—না, পুলিশ অফিসার জানিয়েছে, ব্যালট পেপারের খোঁজ তারা জানে না। ও খোঁজ আপনি রাখেন।

মোহনবাবু কপালকুঞ্চিত করে বল্লেন—"ও, তাহলে কি হবে ব্যালট পেপার ? কালতো ভোট।"

কাশী—হ্যাঁ, তা জানি আমরা। ভোটদানপর্ব এখনই শুরু হবে। এ বুথে ভোট আজ এই রাত্রে এই মুহূর্তেই শুরু হবে। চটপট ব্যালট পেপারগুলো বের করে দিন, আর নাহলে বলুন কোথায় আছে। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। হতভম্ব

বৃদ্ধ মোহন চট্টরাজ বুঝে উঠতে পারছেন না—কি করবেন তিনি এই পরিস্থিতিতে। পুলিশের কাছে যাবেন ? তবু প্রশ্ন করলেন তাদের—কি করবে নিয়ে ?

বিন্টু সোজা উত্তর দেয়—আমরা ভোট দিয়ে যাবো, মানে সবগুলোয় ষ্ট্যাম্পা মেরে দিয়ে যাবো।

মোহনবাবু কিছুক্ষণ থেমে বল্লেন—কিন্তু কাল সাড়ে ছটা থেকে যখন দলে দলে লোক ভোট দিতে আসবে তখন কি করবো আমি ? ভোটারদের কি উত্তর দেবো ? বিন্টু যেন সহজ সমাধানের পথ বার করে দিল। বিন্টু বলে—সে দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। তবে গেটের তালা সাড়েনটার আগে খুলতে নিষেধ করবেন, তারপর আমরা এসে যাবো। যা করার আমরাই করবো। তবু রাজী হলেন না হেডমাস্টার। বল্লেন—এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। সমস্তটাই তো বেআইনী। দেশের লোকের একটা অধীকার কেড়ে নেওয়া, না না তা আমি পারবো না।

ধমকানির সুরে কাশী বলে ওঠে—দেখুন, আইনী কি বে-আইনী সে-ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে হবে না, ভাবতেও হবে না। আমাদের দায়িত্ব জমিদার বাবুকে জিতিয়ে দেওয়া। রামলোচনবাবু ফের জিতলে ছোটোলোকগুলো তো মাথায় উঠে নাচবে। ব্যালট পেপারগুলো দিন, আর দেরী করবেন না।

মোহনবাবুও জিদ ধরেন, বলেন—না। ব্যালট পেপার একটাও তোমাদের দিতে পারবো না। আমার ওপরওলার নির্দেশ ছাড়া আমরা কিছু করতে পারি না। বিন্টু বলে ওঠে—তাতো বটেই, তাতো বটেই। ও কাশী বার করতো তোর পকেট থেকে চিঠিখানা, যেটা তোর আমার পরিচয় দিয়ে লেখা। মাস্টার-মশাইয়ের হাতে দে। চিঠিখানা খুলে ধর্।

কাশী বুক পকেট থেকে একটা চিঠি তুলে দেয় মোহনবাবুর হাতে। চিঠিটার ওপর একবার চোখ বোলাতেই অবাক হয়ে পড়েন। পত্রলেখক যেসে নন। এটা কি করে সম্ভব হল এই ভাষায় একজন প্রিসাইডিং অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া। সজোরে গোড়ালীটা ঠোক্কর দিয়ে বিন্টু বলে—"মাস্টারমশাই, এদিকে তাকান, আর মোটেই দেরী করবেন না। ঝড় থেমে গেছে আমরা কাজ সেরে চলে যেতে চাই। এমনকাজ আমাদের আরও আছে। এই রাত্রের মধ্যে যতগুলো সম্ভব বুথে তা শেষ করতে হবে। নিন, নিন উঠুন দেরী করবেন না, জলদি।"

মোহনবাবু এতদ্‌সত্ত্বেও ইতঃস্তত করছেন দেখে ওরা দুজনেই নিজের নিজের পকেটে হাত দিয়ে নিজ নিজ রিভলবার বার করে ধরল উঁচু করে একেবারে মোহন-

বাবুর মাথার খুলির দিকে তাক করে। থরথর করে সারা শরীর কেঁপে উঠল মোহনবাবুর. একপা একপা করে উনি এগিয়ে যান ঘরের দিকে আর ওরাও খোলা রিভলবার হাতে পা পা করে এগিয়ে যায় সেদিকে। মোহনবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠলো স্ত্রী, পুত্র কন্যার মুখের ছবি।

দুটো জায়গায় সীলকরা ছিল ব্যালট পেপারগুলো। প্রত্যেকটায় দু'হাজার করে চার হাজার। মোহনবাবু একটা প্যাকেট বার করে দিলেন। ভাবলেন তার একটা অন্তত রক্ষা পাবে। ওরা দুটো প্যাকেটই টেনে বার করে নিয়ে সরে পড়ল। সেই একই পথ দিয়ে যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল ততক্ষণ ঝড় থেমেছে কিন্তু ঝিমঝিম বৃষ্টি বন্ধ হয়নি, গুমোট গরম। আকাশে জলভরা মেঘ মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ঝলসানি ও মেঘের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। এক পশলা জোর বৃষ্টি হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবলবেগে নামল বৃষ্টি। বাইরে থেকে চেয়ারটা তুলে ঘরে ঢোকালেন মোহনবাবু। চিন্তা-ভাবনা সব কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে শিক্ষকের মাথা লক্ষ করে রিভলবার তাক করা। উঃ, ভাবাই যায় না। অবসন্ন-দেহে শুয়ে পড়লেন খাটিয়ায়। নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে নিজ ছাত্রদের উদ্যত রিভলবারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো। হায়, ঋষি কলহন! তুমিও যুগে যুগে জন্মাবে আর সম্রাট সমুদ্রগুপ্তও যুগে যুগে জন্মাবে। মোহনবাবুর সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটল। সেই রাতেই সশস্ত্রবাহিনীর ক্যাম্প অফিসার-ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর কাছে খুলে সব কথা বল্লেন। ও-সি কিন্তু শুধু শুনেই গেলেন বিশেষ কিছু মন্তব্য করলেন না। নীরব হয়ে রইলেন।

শেষে মোহনবাবুই বাধ্য হয়ে নীরবতা ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আমাদের সকাল সাড়ে ছটা বাজলেই তো পোলিং ষ্টেশনের কাজ শুরু করে দিতে হবে? দলীয় পোলিং এজেন্টরা এরপর আসতে শুরু করে দেবে। পোলিং অফিসারদের দায়িত্বভার দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া খুঁটি নাটি কাজ আছে। সকাল সাতটা থেকে ভোট নেওয়া শুরু হবে। ও-সি এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। তিনি বল্লেন—ঠিক আছে। সাড়ে ছটার মধ্যে এজেন্ট এবং অফিসারদের ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হবে। তারপর—

তারপর কি করবেন সেটা তিনি আর বল্লেন না। বিক্ষুব্ধ মোহনবাবু পোলিং অফিসারদের বিশ্রামঘরে ঢুকলেন। ওঁরা সব শুনেও আবার গা এলিয়ে দিলেন।

সকাল সাড়ে ছটা। নির্দিষ্ট সময় মতো তিন জন পোলিং অফিসারদের

নিয়ে বুথে প্রবেশ করলেন মোহনবাবু। ব্যালট পেপারই তো নেই। স্বাক্ষর-হীন শ' খানেক পড়ে আছে। কি করে এতে নির্বাচন শুরু করা যাবে। তবু ওঁরা ভোটের বাক্সগুলো ঠিক ঠাক করে নিলেন, এজেন্টদের সামনে বাক্স পরীক্ষা হলো। ভোট শেষ হলে দলীয় প্রতীক সীলমোহর যুক্ত করতে হবে তাঁদের সামনে। আনুসঙ্গিক পেপার ও ভোটারলিষ্ট সব গুছিয়ে ওঁরা টেবিল সাজালেন। এইভাবে প্রায় আধঘন্টা কেটে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ আসছে না বুথে। কি ব্যাপার! অফিসার ও এজেন্টরাও সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সবার সারা মুখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিন্টু-কাশীর প্রবেশ। এক ঘণ্টাও দেরী হয়নি জোর মিনিট চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। ওদের মুখ চোখ দেখে মনে হয় ওরা আজ যেন আরও একটু বেশী পেটে ঢেলেছে। শরীর কাঁপছে। চোখ লাল, মুখ দিয়ে গন্ধ। দাঁড়াতে পারছে না ওরা। নিশব্দে ঢুকলো বুথের মধ্যে। ওদের পিছনে ওদের দলীয় এজেন্টরা। কিন্তু অতো জন কেন? অবাক মোহনবাবু। ঘরে প্রার্থীর বা দলীয় এজেন্ট তো থাকবে একজন। তবে তাঁদের নামেও প্রার্থীর স্বাক্ষর যুক্ত ফরম ভর্তি করে জমা দিতে হবে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সবাই ওদের দিকে বিন্টু আর কাশী একটা হাই বেঞ্চে গিয়ে বসল। তারপর নিজেদের কোমর থেকে দুটো বড় বড় ছোরা বার করে রাখে টেবিলের ওপর। ছোরা দুটোই একহাতের বেশী লম্বা। ক্ষুর ধার একটার হাতলে লাল কালো রঙের কিছু জমাট বাঁধা, মনে হচ্ছে রক্ত। শিউরে ওঠেন মোহনবাবু। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন পোলিং অফিসাররা। এসব কি কাণ্ড! পাঁঠা কেটে এল নাকি ওরা সদ্য সদ্য। সবাই নির্বাক? স্তব্ধতা ভেঙে বিন্টু বেঞ্চি থেকে খানিক লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বলল—কাশী, তুই থাক এখানে আমি একটু দেখি বাইরেটা। আর মোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে—তাহলে শুরু করে দিন আপনার কাজ তারপর নিজের ব্যাগ থেকে এক গাদা ব্যালট পেপার বার করে বলে—নিন। এগুলো বাক্সে ফেলেদিন। আপনাকে আর ভাবতে হচ্ছে না ব্যালট পেপারগুলো কোথায় গেল বলে? ব্যালট পেপার-গুলো দেখে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন মোহনবাবু। চোখগুলো বড় বড় করে বলে ওঠেন—কৈ কৈ দেখি পেপারগুলো। এনেছো, এনেছো, দেখি দেখি। বলে বিন্টুর হাত থেকে ওগুলো নিয়ে রাখেন টেবিলে সংরক্ষিত আরও ব্যালট পেপারের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে কাশী দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—না, না, ওগুলোয় ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। দেখছেন না ওগুলো ষ্টাম্প মারা। ও শালা ষ্টাম্প মারতে আমাদের

কম কষ্ট হয়েছে। কত কি করতে হবে শালা একটা চাকরীর জন্যে।

মোহনবাবু শুনে বল্লেন—তাহলে ওগুলোয় সব ষ্ট্যাম্প মারা হয়ে গেছে? উত্তর এল—হ্যাঁ, ওগুলো রেকর্ড করে ভোট দেওয়া হয়ে গেছে বলে বাক্সে ফেলে দিতে হবে।

কিটু গট গট করে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওখানে তার দলবল আছে। কাশী রইলো তার দলবল নিয়ে বুথের মধ্যে। স্বেচ্ছাসেবকরা গলায় সবুজ রুমাল বেঁধে বারান্দায় পায়চারী করে বেড়াচ্ছে হাসছে, গল্প করছে, বাদাম মুখে ফেলছে। প্রত্যে-কের বুকে বব-ছাঁটা চুল-বিশিষ্ট এক মহিলার ছবি আঁটা। প্রত্যেকের গায়ে একই রঙে রঙিন ববী জামা ও সরু প্যাণ্ট।

পোলিং এজেণ্ট অরুণ নাছোড়বান্দা। তার রিলিভারকে সঙ্গে নিয়ে বুথের মধ্যে ঢুকে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে নিজেদের পরিচয় পত্র রাখে। মোহনবাবু ভোটারলিষ্ট দেখে কি মোটা খাতায় কি নোট নিচ্ছিলেন। চোখ তুলে দেখেন সামনে অরুণ ও তার একসঙ্গী দাঁড়িয়ে। এজেণ্টের পরিচয় পত্রদুটো গ্রহণ করে বেঞ্চিতে বসতে ইঙ্গিত করলেন। অরুণ তাঁর পুরোনো ছাত্র। একসময় সন্দীপের সহপাঠী ছিল।

অরুণ তার সঙ্গীকে নিয়ে একটু তফাতে রাখা চওড়া বেঞ্চিটাতে বসে পড়ে। কাশীও তাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে দেখছে। ভাবখানা যেন এখুনি গিলে ফেলবে। দরজার কাছে, ববছাঁটা চুল মহিলার ছবি বুকে আঁটা স্বেচ্ছাসেবকরা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, যেন কোন নির্দেশের অপেক্ষায়। এদিক-ওদিক তাকাতে অরুণ আর তার সঙ্গীর চোখে পড়ে কাশীর সামনে টেবিলটার ওপর পড়ে রয়েছে দুটো চকচকে ছোরা। একটার বাঁটে লাল ছোপ। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে ওদের চোখ। আর হা হা করে হেসে ওঠে কাশী, তার সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেয় দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো স্বেচ্ছাস্বেবকরা। কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিবাদের স্বরে বলে—স্তর, ভোট দেওয়ার ঘরে ছোরা আমদানী কে করল? এখুনি যদি পুলিশের কাছে এগুলো সমর্পণ করা না হলে আমি এই বুথে অন্ততঃ ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখার দাবী করবো। মানুষ ভোট দিতে আসবে, আর তাদের সামনে পাতা থাকবে ধারালো ছোরা। এ আমি কিছুতেই ঘটতে দিতে পারি না। অরুণের ছট-ফটানির মাঝে কাশী দরজায় অপেক্ষমান যুবকদের ইসারায় কি ইঙ্গিত করে। আর ওরা তৎক্ষণাৎ অরুণ আর সঙ্গীটিকে আর একটা কথা বলতে না দিয়ে ঘাড়

ধরে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে বুথের বাইরে বার করে দিয়ে আসে।

অরুণ ও তার সঙ্গীটি বুথের বাইরেই প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু কে শোনে তার কথা। যারা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকেই সেই বুকে ছবি আঁটা সবুজ রুমালধারী আব তাদের আমলের পুলিশ। যুবকদের দল। দু-চার জন ভোটার কিছুদূর বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা কয়ে চলেছে। দেখে মনে হয় ওরা ঘেঁসতেই পারেনি এদিকে। হঠাৎ কানফাটানো তীব্র আওয়াজ। দুটো বোমা ফাটল। একটা অরুণ আর তার সঙ্গীটি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। সেখানটায় আর একটা তার থেকে হাত চল্লিশেক দূরে, যেখানে দু-চারজন ভোটার তখনও দাঁড়িয়েছিল। প্রচণ্ড আওয়াজ, চারদিকের বাতাস উঠল কেঁপে ধুলো আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন, তেঁতুল, বট, শিমুলগাছের ডগা ডালে ডালে যে সমস্ত পাখী চুপচাপ বসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ডানা মেলে দ্রুত উড়ে চলল। সামনে পুকুরের হাঁসগুলো সেই যে একবার ডেকে উঠেছে, এখনও থামছে না। কয়েকটা গরু ছাগল দড়ি টান মেরে উর্ধ্বশ্বাসে ফাঁকা মাঠের দিগ্বিদিকে দিল দৌড। ওরা সবাই হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। চীৎকার করছে আর নাচছে আর বুকে আঁটা দেবীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সামনাসামনি চলেছে শূন্য বোতল নিয়ে যেন 'গদাযুদ্ধে' প্রবৃত্ত হওয়াব মহড়া।

অরুণ, তার সঙ্গীটি ও ভোটার কয়েকজন পরক্ষণেই স্থানত্যাগ করে চলে যায়।

বিন্টু তার বন্ধুদের নিয়ে ঘাসের ওপর বসে ঢকঢক করে মদ গিলছিল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বোতল হাতে নাচতে শুরু করে দিলে। তাকে ঘিরে আরও চার পাঁচ জন নাচতে থাকে। ওরা মধ্যমণির প্যাণ্ট খুলে নেয়, মধ্যমণি উলঙ্গ হয়েই নাচতে থাকে। বিন্টু লক্ষ্য করে কে একজন সাইকেলে চেপে আসছে। মাতাল অবস্থায় সে দূরে ঠিক লক্ষ্য করতে পারছিল না। সাইকেলারোহী কাছে আসতেই চেঁচিয়েই সবাইকে জানিয়ে দেয়—এ্যাই, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু বোধহয় ভোট দিতে আসছেন। এ্যাই তোরা সবাই আমার কাছে আয়।

ডাক্তার নালিনী চ্যাটার্জী আসছিলেন নিজের ভোটটা নিজে দিতে। উনি বুথের কাছে আসতেই তাঁর সাইকেল ঘিরে ধরে নাচতে থাকে। ডাক্তারবাবু প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির হয়ে কঠিন স্বরে জানতে চাইলেন—'কি ব্যাপার কি চাও, তোমরা? উত্তর এলো—না, আপনি ভোট দিতে যেতে পারবেন না। আমি ভোট দিতে যাবো, ছেড়ে দাও আমাকে।' ডাক্তারবাবু

জিদ ধরলেন।

ওরা পাল্টা নাচতে থাকে। হাসতে থাকে, গান গাইতে থাকে সুর করে করে গলা জড়ানো স্বরে বলে—"ডাক্তারবাবু, আপনি ভোট দিতে যেতে পাবেন না।"

ডাক্তারবাবুর পাল্টা প্রশ্ন, কেন? আমি তো বরাবরই তোমাদের দলকে ভোট দিয়ে এসেছি। আমিতো গান্ধীবাদী। বিল্টু এবার একটু সোজা হয়ে উত্তর দেয়—কিন্তু আপনার ভোট আমরা তো অনেকক্ষণ আগেই দিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। এই দেখুন প্রমাণ। বলে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা ডাক্তারবাবুর চোখ-মুখের কাছে তুলে নাচাতে থাকে। উত্তেজিত ডাক্তারবাবু গলা চড়িয়ে বলতে থাকেন—"কি পেয়েছ তোমরা। আমার ভোট অন্যে দিয়ে দেবে? একি, তোমরা গুণ্ডামী করবে, মাতলামো করবে? পথ ছাড়ো। আমি শেষ দেখবো।" ডাক্তার-বাবুর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা জোর করে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে ধরে বিল্টু বলে—"যান, চলে যান বলছি। ভীমরতি হয়েছে বুড়োর। বেশী বকবক করে জ্ঞান দিলে টের পাবেন।" ডাক্তারবাবুর স্টেথিস্কোপটা পকেট থেকে পড়ে গেছলো। একজন সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দিল দৌড়।

এইভাবে চললো বেলা বারোটা পর্যন্ত। সারাক্ষণই প্রিসাইডিং অফিসার চুপচাপ চেয়ারে বসা। পোলিং অফিসারও। ভোটারলিষ্ট কালি-কলম সব পড়ে রইলো। একসময় বিল্টু সদলবলে ঢুকে পড়ে বুথের মধ্যে। গর্বিত যুদ্ধবিজয়ীর ভঙ্গীতে বলে—স্যর, আর না। এবার উঠে পড়তে পারেন আপনারা। সব গোছাগুছি করে ফেলুন। ভোট দিতে আর কেউ আসবে না। সিল মেরে দিন। নিন, নিন, চটপট নিন। আপনারা উঠুন,—বলে পোলিং অফিসারদের কাছে একবার গা ঘেঁসে ঘুরে আসে। টেবিল থেকে উন্মুক্ত ছোরা দুটো তুলে নেয়। তুলে দেয় একটা কাশীর হাতে।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষা করছিল একটা ক্যারেজভ্যান। ওতে ভোটের বাক্স উঠবে। গাড়ীর সামনে কাচে ছাপা কাগজ আঁটা—"অন্ ইলেকশান ডিউটি।" গাড়ীর মধ্যে ড্রাইভার নিদ্রালু। সারাদিন হয়তো অনেক খাটুনি হয়েছে ওর।

বিল্টু আর কাশী গাড়ীর ড্রাইভারকে খোঁচা মেরে একটা জোর খিস্তি দিয়ে তুলে দিল। গাড়ীর দরজা খুলে দিতে ওরা গাড়ীর মধ্যে উঠে বসল। তারপর উঠে এলো ব্যালট বাক্স। পুলিশের লোকেরা। গাড়ী সদরের দিকে রওনা হল। যেখানে ভোট গণনা হবে।

ভোট গণনা হবে। প্রাসাদোপম কোর্ট বিল্ডিংয়ের বিশাল বারান্দায়। কাউন্টিং এজেন্ট হয়ে এসেছেন সরোজ, বিকাশ, দেবব্রত মণি সেন, মানিক চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ওঁরা প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু। ওঁদের সকলের জন্য বসার টেবিল কই? কাউন্টিং টেবিল ও চেয়ার সব তো শাসক দলের পুরানো পরিচিত লোকেদের দখলে।

মণি সেন, সরোজ ও বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে একবার ঘুরে আসেন রিটার্নিং অফিসারের ঘর থেকে। এস. ডি. ও.-র কাছে মণি সেন বেশ উত্তেজিতভাবেই নালিশ জানিয়ে বল্লেন—"আমাদের এজেন্টরা কাজ করবেন কি করে? প্রত্যেকটি চেয়ারে টেবিল যদি দখল হয়ে থাকে তবে আমাদের নেমে যেতে হবে।"

উত্তরে এস. ডি. ও. বললেন—এরকম অবস্থা যে হতে পারে তা আমাদের আগে থেকেই উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

বেরিয়ে এলেন মণি সেনেরা সদলবলে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় চোখে পড়ল কয়েকটা ব্যালট বাক্সের ওপর। এগুলো তো এখানকার নয়। নৈহাটি-কেন্দ্রের ছাপ দেখা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সকলে রাস্তায় এসে দেখে পাঁচ-সাতশ' লোকের জমায়েত। সকলেই যুবক-যুবতী, সকলের হাতেই লাঠি অথবা পাইপগান, নয়তো রিভলবার দেখা যায়। অনেকের হাতেই বোতল। সকলেই নৃত্যরত। উল্লাস ধ্বনি—'বন্দেমাতরম্'। ওদের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে পার্বতী। প্রায় উন্মাদিনীর মতো নৃত্য করছে। পরিধানে শায়া আর ব্লাউজ ছাড়া কিছু নেই। এদের বুকে আঁটা একটা স্বেচ্ছাসেবক ব্যাজ। তাতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বল মুখ দেখা যায়।

ভোটের পরেই দিনই ডাঃ নলিনী চ্যাটার্জীর লাশ পাওয়া গেল নিজের গ্রামে ঢোকার নির্জন প্রান্তে। দেহে সর্বমোট তেত্রিশটা ক্ষতচিহ্ন। নিজের ভোট নিজে দিতে না পারায় বিল্টু, কাশীদের 'গুণ্ডা', 'মাতাল' বলে গালি দেওয়ার শোধ হয়ে গেল। মৃতদেহের পাশে পড়েছিল একটা চিরকুট—'গুণ্ডা, মাতাল বলার এটাই উপযুক্ত জবাব'। ডাক্তারবাবুর শরীরের ধমনীতে প্রবাহিত রক্তধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে চারপাশের বালিমিশ্রিত ধুলো। দেহটা বিকৃত অবস্থায় বীভৎস হয়ে উঠেছে।

বিকালে পুলিশের থানায় বেশ জমালো অভিযান। দূরদূর থেকে সব কচি-কাঁচার দল ছুটে এসেছে। ওরা থানার দারোগার কাছে অভিযোগ দায়ের করছে

ডাঃ নলিনী চাটার্জীর হত্যাকারির কম্যুনিষ্টদের কাজ। ওদের খুঁজে বার করতে হবে। এই এলাকায় কোন কুম্যুনিষ্টকে বাদ দেওয়া চলবে না। সকলকেই ধরতে হবে। অফিসার বিস্ফারিত নেত্রে একবার সকলকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন। তারপর ছোট্ট উত্তর এস. পি.-ই যা করার করবেন। আপনাদের বক্তব্য এস. পি.-কে জানিয়ে দিচ্ছি।

জেলখানায় শ্যামলের কাছে ডাঃ নলিনী চ্যাটার্জীর নিহত হবার সংবাদ গেল। এই ঘটনার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দায়ী করে মিছিল বের হওয়ার সংবাদও বাদ গেল না। সেদিন রাত্রিবেলা কেটে গেল ঘোর অনিদ্রায়। সকালবেলায় শ্যামলের চোখেমুখে কালো ছাপ। ডাক্তার নলিনী চ্যাটার্জীর চিকিৎসায় শ্যামলের কঠিন অসুখ সারার ঘটনা বারংবার তাকে দংশন করতে থাকে।

কদিন হল একনম্বর ওয়ার্ডটায় ঝাঁট পড়েনি। সকলে মিলে আজ সকালেই তাই পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত। প্রত্যেকটা কম্বল ঝেড়ে তোলা হল। ফিনাইল মিশ্রিত জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হল গোটা হল। বেশ কেমন পরিচ্ছন্ন ভাব। হলের একবারে বড বড় অক্ষরে চক দিয়ে লেখা—'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মনোবল বাড়ায়'। সেটা একজন আবার চক দিয়ে বুলিয়ে দিয়ে আসে। সকলেই ওয়ার্ডের চাতালে নেমে গেছে। হলটা শুকিয়ে গেলে আবার উঠবে। একজন কনভিক্ট ঢুকলো চাতালে। হাতে একটা নাম লেখা চিরকুট। চাতাল একজন ছোঁ মেরে কাগজের স্লিপটা নিয়ে একবার পড়েই লাফ দিয়ে উঠল। পরে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল শ্যামলকে। সকলেই বুঝল এবার মুক্তি পাচ্ছে শ্যামল বসু। এই দীর্ঘ কারাবাসের ফলে সকলের সঙ্গে শ্যামলের যেন একটা গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। এবার তাই এদের ছেড়ে একা একা চলে যেতে খারাপ লাগছে। সকলেই একসঙ্গে মুক্তি পেলে কি সুন্দর হতো। এদের মধ্যে কেউ শ্যামলকে 'দাদা' বলে ডাকে আবার শ্যামলও অনেককে 'দাদা' বলে সম্মান করে থাকে।

জেল অফিসে সমস্ত কিছু মিলিয়ে নিয়ে নানান জায়গায় সইসাবুদ করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে গেল। বাইরে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে গোরা। মণি সেন পাঠিয়েছেন ওকে। গোরা অপেক্ষা করছে গেটে অনেকক্ষণ।

করণীয় সব শেষ হলে প্রধান ফটকের একাংশ মুক্ত করে দেয় সিপাই। পাশে দাঁড়িয়ে জমাদার। ডেপুটি জেলর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বন্দীর চারদেওয়ালের বাইরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। আর ভিতরের ফটকের ফাঁক-ফোকর দিয়ে শ্যামলের মুক্তি দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে সহবন্দীরা যারা এখনও

আটক রইলো।

গেট পার হতেই দৌড়ে এসে গোরা অভ্যর্থনা জানিয়ে উষ্ণ আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে শ্যামলকে। তারপর এক সময় মুক্ত বায়ু, মুক্ত আকাশ, যানবাহন আর জনতার ভীড়ে ওরা দ্রুত মিলিয়ে গেল।

হিরু আগে বিড়লা কোম্পানীর একটা কারখানার মেসিনশপে কাজ করতো। মাইনেও বেশ ভালোই ছিল। রাতের অন্ধকারে কারখানার যন্ত্রপাতি সরানোর অপরাধে অবশেষে চাকরী থেকে ছাঁটাই। বসে আছে আজ কয়েকবছর হলো।

জ্যান্ত মানুষ জবাই করতে তার যে পারিশ্রমিক জোটে। ইদানীং তার কপর্দকও সংসারে আসে না। সবই যায় মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে। বাড়িতে বিধবা বুড়ি মা, বিধবা দিদি, নিজের হাতে সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া স্ত্রী আর তার গর্ভে চার সন্তান। এদের দিন কাটে অনাহারে। ছাঁটাই হওয়ার পর হিরু বাড়িতে প্রায়ই ফিরতো না। 'নিউ ফ্যাসান ক্লাব'-এর ঘরে আড্ডা মারে।

গোল পাকিয়েছে এর মধ্যে হিরুর স্ত্রী রাণী আর বিধবা দিদি অপর্ণা। এরা জানতো হিরু জান্ত মানুষ জবাই করে। কিন্তু ঘরে পয়সা আসতো বলে মুখ বুজে থাকতো। একথা সে-কথার মধ্যে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় স্ত্রীর সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে শুরু হল কথা কাটাকাটি। তাই থেকে ঝগড়া। ঝগড়ার মাথায় স্ত্রীর গলা টিপে ধরতে অপর্ণা দৌড়ে হিরুর হাতটা মুচড়ে ধরে। একঝটকায় হিরু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে উঠোন থেকে একটা হেঁসো তুলে চীৎকার করতে থাকে—শোন দিদি, তেইশটা পাঁঠা কেটেছি নিজের হাতে। আমাকে ছেড়ে দে। এটা চব্বিশটা হ'ক।

—"তোর মতো ভাই আমার বেঁচে থাকার থেকে শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো। বউটা কি দোষ করেছে।" বলেই আবার চেপে ধরে সজোরে হিরুর হাতটা। অপর্ণা আচমকা হিরুর কাঁধে একটা প্রবল চাপ আর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গোড়ালী দিয়ে চেপে ধরতে ছিটকে' পড়ে। এই সময় চকচকে হেঁসোটা চলে গেছে অপর্ণার হাতে। মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে মাটিতে আছড়ে পড়ে হু হু করে বমি করতে থাকে। আস্তে-আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লে দুহাত দিয়ে মেঝেটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে আর মুখটা ঘসতে থাকে। ঘর থেকে চলে গেছে রাণী, অপর্ণা এরই মধ্যে। যাবার সময় ঘরের শেকল তুলে দিয়ে গেছে বাইরে থেকে। সারা রাত রইলো এইভাবে।

সকালবেলা অপর্ণা এসে শেকল খুলে দেখে হিরুর পরিবর্তন। চুপচাপ বসে

আছে। অপর্ণা বেশ জোরগলায় বলতে থাকে তুই কাল থেকে আর বাড়ি ঢুকবি না বুঝলি। কত মেয়ের সিঁথির সর্বনাশ করে দিয়েছিস্। এবার ঘরে এসে নিজের বৌকে ধরেছিস তোর মুখ দেখাও মহাপাপ। যেভাবে পারি আমরা ভিক্ষেসিখ্যে করে সংসার চালাবো। তুই এবাড়ীর ছায়া মাড়াবি না। অপর্ণা দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে রাণীর কাছে যায়। বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলতে থাকে—শোন বৌমা, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো তোর কোন ভয় নেই। চোদ্দ বছরে বিয়ে হয়েছিল আমার পনেরোয় পা দিয়ে বিধবা হয়েছি। হিরুর তখন দু'বছর। ওকে মানুষ করেছি। বড হয়ে শেষে জানোয়ার হয়ে যাবে ভাবিনি। এখন ক্লাব হয়েছে। ও ক্লাবেই পড়ে থাক্।

হিরু আর বাড়ি ঢোকে না। ক্লাবের ঘরেই পড়ে থাকে। সেখানে হিরু ওরফে 'হারাধন' রাজার সম্মান পায়। সব সময় তার জন্য একটা চেয়ার নির্দিষ্ট আছে। ইমান তার এক বিশ্বস্ত চেলা। ইমান হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে হিরুর কানে কানে বলে—হিরুদা, পুলিশ রেড্ করতে পারে আজ রাত্রে।

—তাহলে তো মাল-ঝাল সব সরাতে হবে। কে খবর দিল বল্তো?

—মনে হচ্ছে—। বলেই থেমে যায়

—কি থামলি কেন? বল কি হচ্ছে?

—আমি একটা অনুমান করছি। পরে বলবো সব তোমাকে। এখন বলো কোথায় সরাতে হবে। ক্লাবে এখন তো দেখছি কেউ নেই তুমি আর আমি ছাড়া।

—শোন্, পিছনে জাম গাছটা আছে, সেখানে একটা বড গর্ত খোঁড়। সেখানে পুঁতে রাখতে হবে। আর হ্যাঁ, তাডাতাডি কর। কেউ এসে যেতে পারে। নিজেদের লোককেও তো বিশ্বাস নেই। মণ্টু-মাণ্টি চর ছেড়েছে?

—তাতে হয়েছে কি? শম্ভুদাকেও জেল থেকে বার করানো হয়েছে। বিল্টু, কালী, পার্বতীদি এরা তো তোমার দলে।

—দূর শালা, হরেনকেই তো আমার যতো ভয়। ওর কাছে ছটা ষ্টেনগান আছে।

শোন শোন হিরুদা। হরেন জেলে নকশাল নেতা ছিল। এখন আমাদের নেতা হয়েছে ওকে 'অনুপ্রবেশকারী' বলে চালাতে অসুবিধা কোথায়? তারপর একেবারে নিকেশ করে দেওয়া হবে।

—কথাটা মন্দ বলিস্নি। আচ্ছা এখন কাজে হাত ঝটপট। সমস্ত ষ্টককে দুভাগ করে ফেলবি। ঘরের কোণে কিছু লাঠি সোটা রেখে দিবি। ইটপাটকেল।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো হিরু। ইমান নির্দেশমতো চলে যায়। হিরু নিজে নিজেই বলতে থাকে—"শালা, এতকাল ঐ মাল দিয়ে যখন কম্যুনিষ্ট নিকেশ করে এসেছি তখন ঐ শালারাই সঙ্গে থেকে সাহায্য করে এসেছে বারবার। আসুক না ধরতে, সরকারী আদেশ দেখতে চাইবো। সরকারতো আমাদের। এখনও অনেক কম্যুনিষ্ট নিকেশ করতে হবে। এখন এইসময় ওসব নিয়ে গেলে দরকারে পাবো কোথায়? নিশ্চয়ই ওসব শালারা হরেনদের হাতে তুলে দেবে। দেখা যাক্। আসুক আগে তো। আসবে কিনা তারই বা ঠিক কী।" হিরু আপনমনে এইসব উক্তি করে আর ঘরের একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত পায়চারী করতে থাকে। তারপর একসময় বেরিয়ে যায়।

ইমানের খবর ছিল মোটামুটি সঠিক। দারোগা কনষ্টেবলরা এসেছে ভোররাতে। দরজায় কড়া নাড়তেই ইমান এসে খুলে দিতেই দারোগা চড়া গলায় বলে—হারাধনবাবু আছেন? ইমানের দৃঢ়গলা থেকে উত্তর আসে—না। কি প্রয়োজন বলুন?

—আপনি সরে দাঁড়ান আমরা ঘরে ঢুকবো।

—অনুমতি নেই।

—আমি পুলিশ অফিসার। ওয়ারেণ্ট আছে। বাধা দেবেন না।

—আর কেউ নেই। বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য।

—কনষ্টেবল শিউস্বরতের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে দারোগা হুকুম করে—"একে অ্যারেষ্ট করলাম। হাতকড়ি আর কোমর বাঁধো।" হুকুম মতো বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে শিউস্বরত ইমানের ওপর। হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বাঁধা পাঁচ মিনিটের বেশী লাগে না।

ঠিক এই মুহূর্তেই ক্লাবে ফিরে আসে হিরু। সঙ্গে জনা চারেক যুবক। প্রত্যেকের পকেট উঁচু কাঁপা কাঁপা গলায় হিরু দারোগার মুখের কাছে মুখ নিয়ে তর্জনী তুলে জিজ্ঞেস করে—দারোগাবাবু যে, সাতসকালে ক্লাববাড়ীতে কি উদ্দেশ্যে? তা দারোগাবাবু, ইমানকে বুঝি গেরেফতার করেছেন? কি চান্ বাবা? হঠাৎ সরকারের লোকদের ধড়পাকড়!

—সরকারের আদেশ আছে তাই। কথা আছে ভিতরে চলুন। সকলে ভিতরে গিয়ে চেয়ার টেবিল যে যেখানে পারল দখল নিয়ে বসে পড়ল। ইমানকে কিন্তু ছাড়েনি শিউস্বরত। সে ঠায় তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটা বেঞ্চিতে ওরা দুজন বসে।

দারোগাই এবার প্রথম প্রশ্নবানটি ছোঁড়ে—হিরুবাবু, আপনাদের মালবাল

সব কোথায় আছে? আপনি না বললেও বার করতে পারবো। তবু আপনি খবর দিলে ভালো হয়।

—সে খবরে আপনাদের কি দরকার?

—আরে মশাই চটছেন কেন। দরকার না হলে জিজ্ঞেস করবো?

—এতোকাল তো করেননি?

—এতোকাল সরকার বলেনি তাই।

—সরকার তো বদল হয়নি। সরকার তো আমাদের!

—তা ঠিক। কিন্তু আদেশ যাঁরা করেন তাঁরা রাইটার্সে বসেন।

—রাইটার্স থেকে কে আদেশ করেছেন?

—সে বলা যায় না। তবে জেনে রাখুন মন্ত্রীর আদেশ ছাড়া এটা হয়নি। আপনাদের ক্লাবে যত অস্ত্রশস্ত্র আছে সব নিয়ে যাবার আদেশ আছে।

—'আদেশ'-এর হুমকী দেখাবেন না।

—বাধা দিলে গ্রেপ্তার অনিবার্য। দারোগার কণ্ঠ এবার বেশ কঠিন। আর চড়া।

—সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যার কাছে যা অস্ত্রসস্ত্র আছে সব ফেরৎ দিতে হবে সরকারের কাছে।

—আমরা ঐসব পেয়েছিলাম একাত্তর সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। সে সময় যিনি এগুলো আমাদের দিয়েছিলেন তিনি বাহাত্তর থেকে এরাজ্যের একজন মন্ত্রী। আমরা তাঁর কাছে যাই, সবজিনিসটা জানি, বুঝি তারপর।

—সরকারী আদেশ, এস. পি-র. নির্দেশ আমরা অমান্য করতে পারি না। কোথায় সব আছে বলুন। কোনো বাধা না দিলে কাউকে গ্রেফতার করা হবে না।

—বলতে পারবো না।

দারোগা এই কথার পর সঙ্গের অন্য এক কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করতেই সে তাড়াতাড়ি হারাধনকেও বাঁধল, তারপর দুজনকে নিয়ে টেনে তুলল ভ্যানে। সঙ্গে বাইরে প্রবল পটকা ফাটার আওয়াজ। আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। হিরুর সঙ্গের যুবকরা তখন ক্রমাগত ঐ কাণ্ড করে চলেছে।

শুরু হল সার্চ। কোনো জায়গাই দৃষ্টির বাইরে যেতে পারল না। পিছন দিকে জামতলা কাঁচা মাটির উঁচু জমা দেখে সন্দেহ গভীর হল। খোঁড়াখুঁড়ি করতেই যা সব বের হল তার অনেক কিছু পুলিশরা ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে সামরিকবাহিনীর লোকেরা। দারোগার নিজের তত্ত্বাবধানে সব কিছু শেষ

হলে উদ্ধার করা অস্ত্রশস্ত্র ভ্যানে তোলা হল। বাইরে যারা পটকা ফাটাচ্ছিল তাদের দিকে লক্ষ করে চললো পুলিশের রিভলবারের গুলী। দৌড়ে পালাতে গিয়ে একজন শুয়ে পড়ে তার পিঠে গুলী লেগেছে। কাতরাতে থাকে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। রক্তস্রোত ছোটে শরীর থেকে, শেষে নিথর হয়ে যায়।

থানায় হারাধন আর ইমানকে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখা হয়। সেখানে ওদের চোখে পড়ে দারোগার সামনের চেয়ারটায় হরেন বসে। হরেনের সামনেই ওদের একসময় হাজতে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। হাজত থেকে হারাধনের কানে হরেনের গলার আওয়াজ পৌঁছাতে হাজতের মধ্যেই থরথর করে রাগে কাঁপতে থাকে। হরেন দারোগাকে বলছে—জানেন দারোগাবাবু, হিরুটা আমাদের দলে একনম্বর শয়তান। আপনি যে ওকে ধরে কাবু করে ফেলেছেন তার জন্য আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো। ক্লাবে যত অস্ত্রশস্ত্র আছে সব ওঁর গ্রুপই ভোগ দখল করবে। আমাদের কিছুই ছিটে-ফোঁটাও দেবে না। আমি তো দারোগাবাবু ক্লাবে ঢুকতেই পারতাম না। ক্লাবে আমি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জানেন নিশ্চয়ই। এখন আমাকে এই ক্লাবের আরেকটা ঘর করতে হয়েছে। সেখান থেকেই কাজ চালাই।

দারোগা হরেনকে পাল্টা ধন্যবাদ দিয়ে বলে—কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান আপনি না দিলে তো জানতেই পারতাম না। যাক্ আপনার সংবাদ সূত্র খুবই নিখুঁত।

হরেন কিং সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দারোগার হাতে তুলে দেয়। লাইটারটা জ্বেলে মুখের কাছে এগিয়ে দেয় তারপর নিজে একটা ধরিয়ে বলে—তাহলে দারোগাবাবু এখন যাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, যেতে পারেন। এসব কথাই হারাধন হাজত থেকে শুনতে পেলো বেশ স্পষ্ট। ইমানের গা টিপে বলে—কিরে শুনলি তো সব ইমান? ইমান ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুধু ঘাড নাড়ে।

মাস খানেক পরে জেল থেকে জামীনে খালাস পায় হারাধন আর ইমান। খালাস পেয়ে ধ্যান জ্ঞান হয় হরেন। হরেনের আক্রোশ বাড়ে হারাধনকে নিয়ে। হারাধন মাঝে মধ্যে রাত্রে বাড়ি যেতেও শুরু করে।

রাত্রে নিদ্রিত রাণীর মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। একটা অজ্ঞাত ভাবনায় সে তারপরের রাতটুকু বিছানায় ঠায় বসেই কাটিয়ে দেয়। কখন বুঝি কড়া নাড়ার শব্দ আসে এটাও একটা তার বড় চিন্তা। মত্ত অবস্থাতেই আসে হারাধন স্ত্রীর কাছে। একদিনও নয়। আজও নয়। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে খুলে দেয় রাণী।

রাণী মদের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে দু-পা পিছিয়ে যায়। ওকে পিছোতে দেখে হারাধন বলে—রাণী চলো বিছানায়।

—না। আমার শরীর ভীষণ খারাপ।

—বেশ আমিই শুয়ে পড়ি তাহলে কেমন? তুমি বাকী রাতটা দাঁড়িয়েই থাকো।

রাণী চুপ করে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় বিছানায়। রাণী একদৌড়ে উন্মুক্ত দরজাব কাছে চলে যায় বেশ গলা চড়িয়ে বলে—রোজ রোজ একই জিনিস ভালো লাগে না। বিছানা থেকে জড়ানো গলায় উত্তর আসে—ভালো লাগে না তো বিয়ে হয়েছিল কেন? বাপেরবাড়ি চলে যাও।

রাণীর চোখে পড়ে দবজার পাশে ফ্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে দাঁড করানো রয়েছে একটা বিরাট ভোজালী। ওতে রক্ত মাখানো। শিউরে উঠে বাণী। হারাধনেব কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে দরজার সামনে ওটা কে রাখলো?

হারাধন মুখটা বিছানায় রগড়ে ঘাডটা ঈষৎ বাঁকিয়ে উত্তর দেয় আমি। বিস্মিত বাণী আবার জিজ্ঞেস করে তুমি বেখেছো? কিন্তু ওটা রক্ত মাখানো কেন?

ঘাড়টা আরও একটু তুলে রাণীর চোখে চোখ বাখার চেষ্টা করে হারাধন বলে—একটা পাঁঠা—এইমাত্র—কেটে এলাম। হ্যাঁ কাছে এসো। এখন ভীষণ ঝোঁক ধবেছে মাইরী।

বাণীকে অতো চেষ্টা কবেও বিছানায় না পেয়ে হারাধন শেষে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ে। রাণীও বাকী বাতটা কাটিয়ে দিল একভাবে চৌকাঠে বসে। এরপর হারাধন বাড়িতে আসাই ছেড়ে দেয়।

কৃষ্ণপক্ষেব চতুর্দশীর রাত। উদাসপুরের পশ্চিমপাডায় বাঁশ ঝাডের আডালে খুব নীচু গলায় আলোচনাসভা চলছিল। হারাধন, বিল্টু আর কাশীর মধ্যে।

হারাধন বলে—জগন্নাথের ছেলে শংকর আর তার বউকে তুলে নিয়ে যেতে খুব বেগ পেতে হবে না। আমাদের এলাকা থেকে জন চারেক রিভলবার চালানোর বেশ ট্রেনিং প্রাপ্ত আসবে। কিন্তু তুলে নিয়ে যাবার পর ওদের কি করা হবে?

—খুন করা হবে। আবার কি? জগন্নাথকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বেটা বুড়ো হয়েছেন তবু বেআদপী যায়নি। আগে আমাদের পাড়ায় ভদ্দরলোকের সামনে দিয়ে ও চলতো না। জগন্নাথ আর শংকর দুজনায় কথায় কথায় তর্ক পর্যন্ত করে।

হারাধন মাথা দুলিয়ে বলে—"না তা হবে না। শুধু শংকরকেই নিয়েই কাজ করা হবে, ওর বউ হিরণ্ময়ীকে নয়। হিরণ্ময়ীকে আমি নিয়ে যাবো।" কাশীর সাহস হলো না একথার ওপর কোন মন্তব্য করতে। শুধু একবার মৃদু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়—ঠিক আছে গুরু।

বৃদ্ধ জগন্নাথ যতদিন বেঁচেছিল ততদিন বিন্দুর শোকেই দিন কাটিয়ে গেছে। বিন্দুর ইজ্জত হানি আর মৃত্যু জগন্নাথের মৃত্যুকে আগিয়ে নিয়ে আসে। পুত্রবধূ হিরণ্ময়ীকে পেয়ে মাঝে কিছুকাল চুপচাপ থাকতেন। হিরণ্ময়ীও শ্বশুরের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে সর্বদা সেবা যত্ন করতো।

হারাধন বিন্টুকে হুকুম করে—"তুই কালই ভোরে মতিডাঙ্গায় চলে যা। সঙ্গে আমি একটা চিঠি লিখে দেবো।" বলেই খসখস করে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে দুকলম লিখে ফেললো যাতে চারজনের দলটা বিকালের মধ্যে এসে যায় উদাসপুরে। তারপর আবার সতর্ক করে দিয়ে বলে—অ্যাই শোন্, হরেন যেন এসব ঘুনাক্ষরেও জানতে না পারে। হ্যাঁ শোন্। আমি থানার সঙ্গে কথা বলে রাখবো। সব প্ল্যানমাফিক চলবে। বিকালের মধ্যে মাল সমেত ওদের নিয়ে ফিরবে। মালসমেত না আনলে তোমাকেই নিকেশ করে দেবো, বুঝলি তো? বিন্টু সঙ্গে কাশীকে নিয়ে যেতে চাইলে অনুমতি মেলে। বিন্টু কাশী চলে যায়।

হারাধন গিয়ে ওঠে আবার সেই থানায়। বড়বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দারোগা মুখ তুলে বলে—কি ব্যাপার, হারাধনবাবু যে হঠাৎ থানায়?

—একটা ভীষণ দরকারী ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে।

—কেন জানের ভয়।

—না স্যর, ভয় করি কাকে।

—বেশ তাহলে একটু বসুন। যেটা হাতে নিয়েছি সেটা আগে শেষ করি। দারোগা তখন একটা ডাকাতি আর তার সঙ্গে খুনের ঘটনার এফ. আই. আর. নিতে ব্যস্ত। যে এফ. আই. আর করছিলেন তাকে আবার ঘটনার বিবরণ বলে যেতে নির্দেশ দেয়—হ্যাঁ তারপর বলুন কল্যাণবাবু। আচ্ছা ডাকাতরা সংখ্যায় কজন?

—ছ'জন মনে হয়েছে। অন্ধকারে কেউ লুকিয়ে ছিল কিনা বলতে পারি না।

—বয়স?

—বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে।

—কাউকে চিনতে পেরেছেন?

—চিনতে যদি পেরেছেন তবে 'নাম বলুন'। পিতার নাম বাড়ির নাম ঠিকানা

—নাম বললে কোন বিপদ হবে নাতো?

—তার মানে? বিপদ কেন হবে? থানা থেকে কি নাম বাইরে বলে দেওয়া হয়? আস্থা রাখুন মশাই থানার ওপর, এখন এটা রোজই আপনাদের প্রয়োজন হয়।

—না না, তা কেন হবে? আপনারা না থাকলে কবে আমাদের ভবলীলা শেষ হয়ে যেতো!

—তবে? নাম ধাম বলুন, দেরী করবেন না। আপনি তো মশাই নাম বলেই খালাস। এবার ধরতে যেতে হবে সেইতো আমাদেরই।

অভিযোগকারী খুব নীচু গলায় যেন অন্য কেউ শুনতে না পায় এমন করে বলে—ডাক্তারপুরের হরেন আর মান্টি। হরেনই গুলী করেছে প্রথম আমার বাবার পেটে!

নাম দুটো শুনেই চমকে ওঠে হারাধন। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে চুপচাপ। দারোগা কলমটা সচল রেখেই বক্রচোখে একবার হারাধনের মুখের চেহারাটা দেখে নেয়। কল্যাণবাবুর বিবৃত দেওয়া শেষ হলে তাকে চলে যেতে বলে দারোগা এবার হারাধনের দিকে মুখ তুলে চায়।

—তারপর বলুন হারাধনবাবু, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারটি কি? কোন মহিলা—

বাধাদিয়ে হারাধন বলে—গাঁয়ের একটা অবাধ্য চাষীকে শিক্ষা দিতে হবে।

—সেটা কি রকম?

—উদাসপুরের জমিদারদের বরাবর অনুগত জগন্নাথ আর জমিদারদের সেলাম করে না। উল্টে বরং তার ছেলে শংকরকে কৃষক সমিতির মিছিল মিটিংয়ে দেখা যাচ্ছে। এটা ঐ গাঁয়ের জমিদারদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

—ঠিক আছে সেটা দেখা যাবে। তার আগে আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই।

হারাধনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই দারোগার চক্রান্তে তার কত ক্ষতি হয়ে গেছে।

—বলুন?

—হরেনবাবু আর আপনি দু'জনে ডাক্তারপুরের দুটো গ্রুপের দু'জন নেতা।

হরেনবাবু শুনেছি আপনার গ্রুপের থেকে শক্তিশালী। অস্ত্রসস্ত্র ওরা কোথায় রাখে বলতে পারেন মানে ডাম্পটা কোথায় ?

—মনে কিছু করবেন না বড়বাবু। এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনি আমাদের দলের খবর আমাদের দলের কাছ থেকে নেবেন এটা কি রকম ?

—আমরা পুলিশের লোক। সরকারী নির্দেশ পালন করি মাত্র।

—আমি আমার দলের কোন লোকের বিপদ হোক চাই না।

—বেশ, ও মেজবাবু হারাধনবাবুর নামে একটা ওয়ারেন্ট পেণ্ডিং আছে বলে তো জানি।

মেজবাবু উত্তর দেয়—হ্যাঁ স্যর। হারাধনবাবুর নামে ওতো ভারতীয় বিস্ফোরক আইন ও অস্ত্র আইন এই দুই ধারায় ওয়ারেন্ট আছে।

—একটু আতঙ্কিত হয়ে হারাধন বলে—কিন্তু আমি যে জামীন নিয়ে এলাম

—তাতে কি আছে। হাওড়ার একটা কেশ—দারোগা বলে।

—অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার নামে হাওড়ার কেশ ?

—আপনি তো চারদিকে ঘুরে বেড়ান। হাওড়ার এস. পি. পাঠিয়েছেন।

একজন কনষ্টেবলকে ডাকলো দারোগা—আপনি শুনুনতো হারাধনবাবুকে হাজতে ঢোকান তো ? ওঁকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। অকস্মাৎ এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে হারাধনের সম্বিৎ বিস্মৃত হওয়ার উপক্রম। তাড়াতাড়ি বড় দারোগার হাত দুটো ধরে অনুনয়ের সুরে বলে—বড়বাবু আমাকে আর বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। আপনি যা যা জানতে চাইছেন আর আমি যা জানি বলে দিচ্ছি।

বড় দারোগা কনষ্টেবলকে সরে যেতে বলে। হারাধন বেঞ্চিতে বসে পড়ে। ঘাম ছুটছে গা দিয়ে।

—বেশ বলুন। আমাদের সাহায্য করলে আমরাও আপনাকে দেখবো। আমরা তো বিনিময় করেই বেঁচে আছি। কি বলুন মেজবাবু তাই না।

—মেজবাবুও—'হ্যাঁ স্যর ঠিকই বলেছেন'। হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বড়বাবু। চোখে মুখে বীভৎসতা।

সব মন দিয়ে শুনে বড়বাবু বলে—বাঃ এইতো ভালো ছেলের মতো কেমন সব বলে দিলেন। এসব খবর ভুল হবে না তো।

হারাধন জোর দিয়ে বলে—না স্যর। হরেন হচ্ছে ঐ যে বল্লাম ভীষণ শয়তান।

তারপর আমি যার জন্য এসেছিলাম তার কি হবে ?

—হবে, আবার কি হবে। শংকর না কি নাম বল্লেন, ঠিক আছে। অ্যাকশন করাতো আপনার সব জানা। করুন। অ্যাকশন করে আসবেন। এখন যান। কথা যখন দিলাম। কাজ হবে। যান। কিন্তু শুনুন টাকা লাগবে। অন্তত দু'হাজার। না দিলে আপনাকে বাঁধবো আবার।

বিণ্টু, কাশী ফিরে এল মতি ডাঙ্গা থেকে। সঙ্গে চারজন অতিথি আর চারটে আটঘড়া রিভলবার। চারজন বাড়তিও আছে। বিকালেই উদাসপুরে ওরা ঢুকে গেছে। মিস্ত্রির বাড়িতে বসেছে গোপন মন্ত্রণাসভা। হারাধনকে ঘিরে সকলে বসে আছে।

হারাধন বলে—তোরা শুরুতেই অ্যাকশন করিস না। ফাঁদ পাততে হবে। সেই ফাঁদে ফেলতে হবে বাছাধনদের। হ্যাঁ, আমি কিন্তু এই বাড়িতেই থাকবো। বের হবো না।

অতিথিদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—কিন্তু ফাঁদ পাততে পাততেই যদি পাখী উড়ে যায় তার জন্যে আমাদের ঠকানো চলবে না। আমরা কনট্রাক্ট বুঝে নেবো।

অপরজন তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে—এখানে সময় নষ্ট করা যাবে না খুব বেশি। আমাদের আরেক জায়গায় চুক্তি আছে। সেখানে পাওনা বেশি। আরেকজন বলে—ষ্টেজে নামবার আগে বোতল চাই। দু'বোতল একা আমারই চাই।

—আমারও দু'বোতল।

—আমারও।

বিণ্টু, কাশী আশ্বাস দিয়ে বলে—গোলমাল করিস্ না ভাই যা যা বলে এনেছি সব পাবি। কিছু বাদ যাবে না। বোতল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে।

ঐদিন সকালে হিরণ্ময়ী একবার মাত্র বের হয়েছিল প্রকৃতির টানে। গরীবের কুঁড়েঘর। বাড়িতে সেরকম ব্যবস্থা নেই। কুঁড়েঘরের মেয়ে লোকেরা কাছাকাছি ঝোপে-ঝাড়ে প্রকৃতির টানে বসে পড়ে। বিণ্টুদের বাড়ির কাছেই হিরণ্ময়ীদের বাড়ি। জানলা দিয়ে বিণ্টু হিরণ্ময়ীকে দেখে চীৎকার জুড়ে দেয়। অশ্লীল মন্তব্য করে গালি-গালাজ করতে থাকে। লজ্জায় হিরণ্ময়ী মাঠ থেকে দৌড়ে উঠে আসে। লজ্জিত অপমানিত হয়ে বাড়িতে বসে কাঁদতে থাকে।

এই ঘটনার কয়েকঘণ্টা বাদে বিণ্টুর এক ভাইয়ের সঙ্গে শংকর আর তার দাদার

মুখোমুখি সাক্ষাৎ। সকালের ঘটনার জের স্বরূপ শুরু হয় কথা কাটাকাটি। তাই থেকে ছোটখাটো সংঘর্ষ। হঠাৎ শংকরের দাদা বিন্টুর ভাইয়ের গালে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দেয়। ঘটনা দেখতে ছোটখাটো জনতাও জড়ো হয়ে গেছলো। ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। শংকররা জাতিতে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত। এতো বড় স্পর্ধা। সহজে ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে না নিশ্চয়ই।

শংকরদের ঘরের কাছাকাছি আরও কয়েকজনের মাটির ঘর দেখা যায়। মাঝখানে গ্রাম থেকে বের হবার রাস্তা। কিছুদূরে অশ্বত্থ গাছের তলায় ছোটলোক-পাড়ার লোকেরা গরুর গাড়ির ওপর বসে রোজই গল্প-গুজব করে। একটা পুরানো টিউবওয়েল আছে। কখনও জল বের হয়। কখনও বা অচল। আজও জল তুলছিল হিরণ্ময়ী টিউবওয়েলের মুখে জল ঢেলে। কৃষকদের মধ্যে সকলেই ভূমিহীন। ওদের মাঝে বসে আছে ওদের নেতা খালেক। কিছুক্ষণ আগেই কয়েকজন অপরিচিত যুবককে নিয়ে পাশ করেছে বিন্টু আর কাশী। একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে আজ এটা অনুমান করেই অশ্বত্থতলায় বসে সকলে আলোচনা করছিল নিজেদের মধ্যে।

সেদিন উদাসপুরের সংলগ্ন একটা পাড়া থেকে মিটিং করে ফিরছিল শ্যামল। অশ্বত্থতলায় এসে জটলা দেখে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে জিজ্ঞেস করে—কি খালেক ভাই। তোমরা সব মিটিংয়ে যাওনি কেন? এখানে কি করছো সব।

খালেক উঠে কানে কানে চুপিসারে বলে—শ্যামলদা, পাশে চলুন কথা আছে দু'জনে একটু দূরে সরে গেলো।

পাড়ার কৃষকসমিতির একজন কর্মী শ্যামলকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে—শ্যামলদা, ভালই হয়েছে। সব শুনুন, আমরা পাড়া পাহারা দিচ্ছি।

শ্যামল বেশীকথা না বলে একটা কথাই বলে চলে যায়—দেখো, যেন পড়ে পড়ে মার খেয়ো না। সামনে ঝোপের আড়াল থেকে বিন্টুর এক ভাই সে কথাটা শুনে নিল। শুনেই অন্ধকারেই দৌড়। কেউ বুঝতে পারলো না।

রাত তখন সাতটা। শীতের রাত। অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যা হয়েছে আটজন যুবক ঢুকলো হৈ চৈ করে শংকরদের বাড়ি। বিন্টুর ভাইয়ের গায়ে কে হাত দেওয়া হয়েছে তার জবাব দিতে হবে।

চারজনের হাতে রিভলবার। একজন শূন্যে একটা গুলী ছোঁড়ে। ওরা ঢুকেই শংকর আর হিরণ্ময়ীকে খুঁজতে থাকে। মতিডাঙ্গার একজনকে চিনিয়ে দিল

বিল্টু ইসারা করে—ঐ যে শংকরের বৌ।

অশ্বত্থগাছের নিচে গরুর গাড়ির ওপর যারা বসেছিল তারাও ঢুকে গেছে শংকরদের বাড়ির মধ্যে। পাড়া থেকে দৌড়ে এসেছে অনেকে। মজুরদের হাতে লাঠি।

কথা কাটাকাটি আর চীৎকারের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় ধ্বস্তাধ্বস্তি। শংকরের বাবা, কাকা, দাদা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গুণ্ডাদের ওপর। শংকরও একজনের সঙ্গে হাতাহাতিতে লেগেছে। হিরণ্ময়ী নামেনি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে। সে একটু দূরে দূরে সরে যায়।

মজুররা ঢুকে বেধড়ক পেটাতে থাকে বাইরের গুণ্ডাদের। বিল্টু কাশীদের হয়ে দেখা গেল কেউ আসেনি। এমনকি ওদের দলের লোকেরাও না। হয়তো এ-ঘটনায় ওদের সমর্থন মেলেনি। মজুরদের লাঠি হাতে দলে দলে আসতে দেখে কয়েকজন দৌড়ে পালিয়ে যায়। ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল এমন একজনের হাত থেকে হিরণ্ময়ী হঠাৎ তার রিভলবারটা কেড়ে নেয়। আচমকা কেউ টান মারবে এরকম কিন্তু গুণ্ডাটি ভাবতে পারেনি। বিশেষ করে একজন মহিলা। হিরণ্ময়ী অস্ত্রটা পেয়ে তার বাঁটটা দিয়েই গুণ্ডাটাকে প্রহার করতে থাকে। তাকে সবাই ঘিরে ফেলেছে। হিতেবিপরীত দেখে অন্যরা সকলেই বীরদর্পে প্রস্থান করেছে। কাউকেই দেখা গেল না।

প্রবল মারধোর খেয়ে আটক পড়া গুণ্ডাটি মাটিতে পড়ে যায়। সেও তো তখন মাতাল। কোনক্রমে দুহাতে মাটি খাঁমচে গড়িয়ে গড়িয়ে হিরণ্ময়ীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে। আর চীৎকার জুড়ে দেয়—দিদি, দিদি বাঁচান আমাকে রক্ষা করুন। হিরণ্ময়ীর হাতের রিভলবারের বাঁট আর মজুরদের ক্রমাগত লাঠির আঘাতে লোকটা শেষ পর্যন্ত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ওকে তখন উঠোনে ঐ অবস্থায় রেখে বাকীরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

যারা পালিয়েছিল তাদের হুঁশ হয়েছে এক সাকরেদকে তারা ফেলে এসেছে। ওরা সকলেই চৌধুরী আর মিত্তির বাড়িতে ঢুকেছিল। হঠাৎ প্রবল বিক্রমে বোমা ফাটাতে ফাটাতে এসে শংকরদের বাড়িতে ঢুকে জোর করে সাকরেদকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে দু'জন দৌড় দেয়। পড়ে থাকে তার রিভলবারটা। নিজেদের ভুলের জন্যেই সাকরেদকে ওরা তুলে নিয়ে যেতে পারল। রিভলবারটাকে তাড়াতাড়ি পাশে বিদুর দুর্লভের বাড়িতে সরিয়ে রাখে, যাতে ওটাও হাতছাড়া না হয়।

অবস্থাটা আয়ত্তের মধ্যে এলে করণীয় কর্তব্য নিয়ে সকলে আলোচনায় বসে।

খালেক প্রথমে বলে—শংকর, আমাদের বিরুদ্ধে ওরা থানায় বসে মিথ্যাকথা বলবে। মামলায় জড়িয়ে দেবে।

শংকর উত্তর করে—আমরাও চল থানায় যাই।

—কিন্তু ঐ ঐটার কি হবে? বলে সামনে পড়ে থাকা রিভলবারটা দেখায়।

—বিদুর বলে—ওটা থাক আমার কাছেই।

—থাক। তাহলে তোমাকে থানায় যেতে হবে না। খালেক বলে। চৌকিদার পাহারায় রাখা হ'ক। ওরা থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিল হাঁটাপথে। কিন্তু ওদের আগেই বিন্টু, কাশীরা চলে গেছে সাইকেলে। থানা অন্ততঃ ছয় মাইল পথ।

খালেক শংকর আর তাদের দলবল সেই রাত্রেই থানায় পৌঁছে দেখে থানা থেকে পুলিশের জীপটা ষ্টার্ট দিচ্ছে। খালেকরা দৌড়ে জীপটাকে থামায়। ভিতরে ছিল থানার বড় দারোগা। মুখটা বাড়াতেই খালেক এগিয়ে গিয়ে বলে—আমরা উদাসপুর থেকে আসছি। একটা বাড়ির ওপর হামলা হয়েছে।

শংকর আর একটু এগিয়ে এসে বলে—স্যর, বিন্টু, কাশীরা আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তুলে নিতে এসেছিল।

দারোগা কথাটা শুনেই বলে—ওঃ, তাই নাকি তোমাদের ব্যাপার। আচ্ছা, আচ্ছা চলো অফিসে সব শুনি আগে। সকলে চললো থানা অফিসে।

থানায় বসে দারোগা সব শুনলেন কিন্তু কিছুই নোট করলেন না। এসেছিল তাদের নামগুলো লিখে নেয়। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করে- 'মালটা' কোথায় রেখেছো তাই বলো। 'মাল'টা কোথায়? এখন গেলে পাওয়া যাবে? রিভলবারটা কোথায় আছে একজন পাশ থেকে সেটা বলে দেয়।

দারোগা শংকরকে উদ্দেশ্য করে বলে—শংকর চলো আমার সঙ্গে। তুমি চিনিয়ে দেবে সে জায়গাটা। তোমার বাড়িটা। আমরা ঘুরে আসছি। তোমরা সকলে ষ্টেশনে থাকো। সকাল হলেই আবার থানায় দেখা করবে আমার সঙ্গে।

শংকরকে জীপে তুলে পুলিশ ঢুকলো উদাসপুরে। দারোগা সবকিছু দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শেষে বিদুরের ঘরে গিয়ে চাইলো ফেলে যাওয়া রিভলবারটা। বিদুরের স্ত্রী রিভলবারটা হাতে তুলে দেয়। দারোগা বলে—বিদুরকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। থানায় এসে এবার বিদুর আর শংকরকে দারোগা বলে—তোমরা হাজতে থাকবে। কনষ্টেবল ডেকে বলে—এদের হাতকড়া পরাও। হাজতে ঢোকাও। কোনো কিছু বলার সুযোগ না পেয়ে ওরা ঢুকলো হাজতে।

পরের দিন ওদের কোর্টে চালান করে দেওয়া হয়। মেমোতে লেখা হল—মতিডাঙ্গায় যে ডাকাতি হয়েছিল তার আসামী এরা। খোয়া যাওয়া পুলিশের একটা রিভলবার এদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। কেশের সময় সেটি এক্সিবিট করা হবে।

*　　　*　　　*

হারাধনের কাছে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে পুলিশ ছুটলো হরেনদের ক্লাবে। চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজে পেলো অনেক কিছু। পুরো চারঘন্টা সময় কেটে গেল। হরেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মণ্টু-মাণ্টি সমেত ওর কয়েকজন চেলাও ধরা পড়েছে। হরেনদের ক্লাব সার্চ হচ্ছে শুনে কিছু উৎসুক লোকের ভীড়ও হয়েছিল। ক্লাবের পাশের বাড়িতে এক মহিলা তার পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে দেখছিল সবকিছু। শিশুটি চেঁচিয়ে উঠে বলে—মা মা ঐ গ্যাখো পুলিশ হরেনকে নিয়ে যাচ্ছে। মা তাড়াতাড়ি শিশুটির মুখ সজোরে চেপে ধরে। চুপ চুপ, একদম বলিস্ না বাবা।

সবকিছু মিটে গেলে পাড়ার একটি তরুণী তার বান্ধবীকে বলে—হরেন সারা-জীবন যেন থাকে জেলে। মেয়েরা শান্তিতে থাকতে পারবে।

কয়েকদিন বাদে জামীনে ছাড়া পেয়ে মণ্টু আর মাণ্টি পাগলের মতো হয়ে উঠে কি করে হারাধনদের জব্দ করা যায়। হরেন জামীন পেলো আরও পরে।

বিলাশপুরে হরেনের গ্রুপের লোকজন আছে একটু বেশী। গ্রামে বাস করেন অঞ্চলপ্রধান। তিনি শুনেছেন বিলাশপুরের ক্ষেতমজুররা তার কাছে আট টাকা মজুরীর দাবী করবে। অঞ্চলপ্রধানের আড়াইশ' বিঘা জমি। এতেই মজুরদের হিংসা।

প্রধানমশাইয়ের জমি কেউ ভাগে চাষ করে না। সব জমিই উনি মুনিষ লাগিয়ে আবাদ করেন। গাঁয়ের মজুরদের থেকে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার মুনীষরা পরিশ্রম করতে পারে বেশী বলে প্রতি বছরই বাইরে থেকে মুনীষ আনান। তাছাড়া ওদের চাহিদাও কম। গাঁয়ের মজুররা তো আট টাকা চেয়ে বসবে। এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে আট টাকা মজুরী দিয়ে কেউ আবাদ তুলতে পারে! সে কথা গাঁয়ের কিষাণরা কিছুতেই শুনবে না। বলে—আপনার এতো জমি। সবই যখন ঘরে চাষ করেন তবে আট টাকা মজুরী দিতেই হবে।

প্রধানমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন হরেনকে। শলাপরামর্শ করার প্রয়োজন। বাড়ন্ত ছোটলোকগুলোকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। প্রধান বল্লেন—হরেন

তুমি লীডার লোক। তোমাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা যা চাও দেবো। হরেনও আশ্বাস দেয়।

গাঁয়ের এক জোতদার অঞ্চলপ্রধানের কাছে অভিযোগ করেছে শৈল বাউরা রাস্তা থেকে তার মুর্গী চুরি করেছে। শৈলকে ডেকে নিয়ে এলো চৌকিদার। এই শৈলই ইদানীং কৃষক সমিতি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেছে।

শৈলকে বাঁধা হয়েছে একটা খুঁটির সঙ্গে। তার কোন কথা শুনতে চায় না। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সে মুর্গী চুরি করেছে। কেন কার মুর্গী নিজেরই কিনা সেসব প্রশ্ন অবান্তর। শৈলর বাঁচার আকুল আবেদন কেউ কানে দেয় না। একজন যুবক এসে তার সঙ্গে তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই বর্ষিত হতে থাকলো কিল বড ঘুসির বৃষ্টি। সবাই চীৎকাব করছে 'চোর' 'চোর' বলে। রাস্তা দিয়ে ভ্রাম্যমান ব্যক্তিও চোর ধরা পড়েছে শুনে অতি উৎসাহিত হয়ে একজনের হাত থেকে একটা লাঠি নিয়ে হাতের সুখ করে নিয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে শুধু একটা আওয়াজ ভেসে আসে—শালা, ছোটলোক বাউরী বড় বাড বেড়েছো। এমন করা উচিত যেন আর কেউ এ-অঞ্চলে সাহস না পায় কৃষক সমিতির আর মিছিল মিটিংয়ের নাম উচ্চারণ করার। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসে শৈলর সামনে হরেন। হাতে একটা মোটা লাঠি। শৈলর সামনে এসে ভ্রূ কুঁচকে বলে—কিরে শালা, তোর এবার ভবলীলা সাঙ্গ করবো। চুরী করে ধরা পড়লে কি শাস্তি জানো তো?

পাশ থেকে একজন উত্তর যুগিয়ে দেয়—মৃত্যুদণ্ড।

হরেন তার হাতের মোটা লাঠি দিয়ে প্রবলভাবে আঘাত করলো শৈলর মাথায়। পরপর লাঠির আঘাত। শৈল বাঁধা আছে খুঁটির সঙ্গে। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। মুখে কাপড় গোঁজা। চীৎকার করতে পারছে না। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। মাথাটা ফেটে চৌচির। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের অংশবিশেষ কাত হয়ে ঝুলে পডে। মৃত্যু হয়েছে বুঝতে পেরে দড়ি খুলে নিচে দু'জন নামিয়ে রাখলো।

সারাদিন শৈলর দেহটা একইভাবে পড়েছিল। বিকালের দিকে পাড়ার জনা-কতক যুবক লাশটা একটা মাদুরে মুড়ে বেঁধে ডিভিজির বড় খালেব জলে ফেলে দিয়ে এলো।

শৈলর ঘরে ওর বউ থাকতো। কদিন হলো গেছে বাপের বাড়ি। সে থাকে উদাসপুরে। শৈলর মাটির ঘর ফাঁকা পডে রইলো।

ভোটের আগে উদাসপুরের সাঁওতালপাড়ায় মঙ্গল, খেবলাং বিজয় এদের ঘরে ঘরে আগুন দিয়েছিল বিন্টু আর কাশী। খেবলাংকে কোনোদিন পাওয়া যায়নি। বিজয় গেছলো থানায় সংবাদ দিতে। তাকে ঠেলে দেওয়া হয় হাজতে। দুমাস পরে জামীন পেয়ে আর উদাসপুরে যায়নি বিজয়। বিলাশডাঙ্গায় একজনের নাগাড়ে কিষাণের কাজ নিয়ে সস্ত্রীক উঠে আসে। একটা ভ্যানরিক্সা নিয়ে অবসর সময়ে ভাড়া খাটতে থাকে। মনিবকে দৈনিক দিনের শেষে গুণে দেয় ভাড়া।

বিজয় বিকালের দিকে একদিন গেছলো ভ্যানরিক্সা নিয়ে বিলাশপুরে। কোনো-দিন সে বিলাশপুর যায় না। বিলাশপুর ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল রিক্সাভ্যান নিয়ে। কদিন ধরে বিলাশডাঙ্গায় ভাড়া হচ্ছিল না।

বিলাশপুরে বিজয় মুখোমুখি হল হারাধন ওরফে হিরুর। সঙ্গে আছে বিন্টু আর কাশী। বিন্টু আর কাশী চিনতে পেরেছে বিজয়কে। ওরাই আবার চিনিয়ে দেয় হারাধনের কাছে বিজয়কে। এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে হারাধন বিজয়ের কাছাকাছি হয়। বিন্টু আর কাশীকে দেখে মুখ শুকিয়ে যায় বিজয়ের।

বিন্টু বিজয়ের থুতনীটা ধরে মুখটা বিকৃত করে বলে— অ্যাই শালা বিজয় তুই এখনও বেঁচে আছিস্। আমি তো জানতাম তোকেও নিকেশ করা হয়েছে। চল্ আমাদের সঙ্গে। চল্! ওরা জোর করে নামিয়ে নিল বিজয়কে। বিজয় গাড়ীটা ছাড়তে চায়নি। বারংবার আঁকড়ে ধরতে চায় ভ্যানটাকে আর চীৎকার করতে থাকে—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলবে।

চড়চাপট দিয়েও যখন বিজয়কে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তখন এক বুদ্ধি বার করল কাশী। কাশী বলে—"হিরুদা, বিন্টু তোমরা ভ্যানে বিজয়কে নিয়ে বোসো। আমি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" বিজয়ের মুখের সামনে একটা রিভলবার উঁচিয়ে ওকে হারাধন আর বিন্টু রিক্সাভ্যানে তুললো। আর কাশী বেশ ভালো-ভাবেই সেটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল। হারাধন ভ্যানে বসে বলে—এই শালা, চীৎকার করলেই দেখছিস্ গুলী করবো। চুপ করে সঙ্গে যাবি।

বিলাশডাঙ্গার একটা ফলের দোকানদার বিলাশপুরে এসেছিল ফল কিনতে। সে ষ্টেশনের বাইরে বিজয় অপহরণের সমস্ত ঘটনাই লক্ষ্য করেছে। তাড়াতাড়ি বিলাশডাঙ্গায় এসে এদের বাড়ি নাগাড়ে কিষাণের কাজ করতো বিজয়। যারা তাকে রিক্সাভ্যান দিয়েছিল কিনে তাদের কাছে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ পেশ করে। সে লোকটি ছিল হরেনের গ্রুপের। সে সোজা হাজির হলো ঐ গ্রুপের বিলাশ-ডাঙ্গায় নেতা কালীর কাছে।

কালীর নির্দেশে একদল যুবক সশস্ত্র হয়ে ছুটলো বিলাশপুরে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর বিজয়কে একটা ঘর থেকে উদ্ধার করে। সেখানে তাকে কয়েকজন পাহারা দিচ্ছিল। হারাধন ছিল না। কালীর দলবলকে ভয় পেয়ে তারা ছেড়ে দেয় বিজয়কে। বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। একজনের ভুঁড়ি ফেঁসে যেতেই বাকিরা সরে দাঁড়ায়। কালীরা বিজয়কে ঘাড়ে করে ষ্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে বিলাশডাঙ্গায় নিয়ে চলে আসে। বিলাশডাঙ্গায় ষ্টেশনের কাছেই ওর ঘর। সেবা শুশ্রূষা হলো। আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরে এলো।

হিরু ফিরে যখন শুনল কালীর দলবল বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তখন মাথায় রক্ত উঠে গেছে। বিন্টু বলে—হিরুদা, মাথা গরম করে লাভ নেই। ভেবে চিন্তে উপায় বার করো। শেষ পর্যন্ত শিকার যেন হাতছাড়া না হয়।

—তাহলে হরেনদের সঙ্গে আপোষ করে নিয়ে শিকার উদ্ধার করা ভালো কি বলিস্? হারাধন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ সেটাই তো উচিত। হরেনদাদের সঙ্গে সংঘর্ষে গেলে আসল শিকারই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বিন্টু, কাশী, আর হারাধন ট্রেনে উঠে বিলাশডাঙ্গা ষ্টেশনে নেমে মুখোমুখি হল কালীর ভাই মধুর সঙ্গে। মধুকে ধরেই হারাধন বলে—মধু আমাদের শিকার তোমরা কেন ছিনিয়ে আনলে ভাই। কোথায় শিকার আছে বল্? তুইও মোটা টাকা পাবি বলে দিলে।

—দেবে তো?

—নিশ্চয়ই।

বিজয় যে ঘরে থাকে সেটা মধু হারাধনদের চিনিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়ে।

ইতিমধ্যে কালী তার দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে বিজয়ের ঘরের সামনে। ওকে পেয়ে হারাধন নিজেই এগিয়ে এসে বলে—কালী, তোরা বিজয়কে ছেড়ে দে।

—তা কি হয় আমরা ওকে আশ্রয় দিয়েছি। একবার আশ্রয় দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

—তুই একটু বাইরে আয়। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। হারাধন আর কালী দু'জনে কিছুক্ষণ কাটালো, কিছুদূরে আলোচনা হল। তারপর কালী নিজেই এসে তার গ্রুপের ছেলেদের বলে—বিজয়কে ছেড়ে দাও হারাধনদাদের হাতে। কথা হয়ে গেছে, কালীর এই মতপরিবর্তনে সবাই অবাক হয়ে যায়। হারাধন তার দুই সাকরেদকে নিয়ে বিজয়কে তুলল ট্রেনে। কৌতুহলী যাত্রীরা কিছু

প্রশ্ন করতেই তার উত্তরের সুযোগ না দিয়ে পরের ষ্টেশনে ওকে তারা নামিয়ে নেয়। নিয়ে গিয়ে তুললো 'নিউ ফ্যাসান ক্লাব'-এর বিলাশপুর শাখার ঘরে। অভুক্ত আর হাতপা বাঁধা অবস্থায় সারাদিনরাত ক্লাবঘরে পড়ে রইলো।

পরদিন বিকালে ঘর খুলে ওরা বার করল বিজয়কে। রিক্সায় তুলে বিলাশপুর আর ডাক্তারপুরের মাঝামাঝি খালের ধারে নিয়ে যায়। একটা মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলে। দড়ি বাঁধার যন্ত্রণায় কাতর বিজয়কে পাহারা দিতে থাকে বিন্টু আর কাশী। মধ্যরাত্রির নিশুতিতে ওকে হারাধন আর তার দলবল টেনে নিয়ে গেল ডাক্তারপুরের 'নিউ ফ্যাসান ক্লাব' ঘরে।

মধ্যরাতে ক্লাবঘর থেকে মশাল জ্বালিয়ে কয়েকজন বেরিয়ে এল। হারাধন চীৎকার করে সাবধান করে দেয়—"যারা বাড়ি থেকে বার হয়েছেন তারা ঘরে ঢুকে পড়ুন।" দু-চারজন যারা উঁকি ঝুঁকি মারছিল ভয়ে জানলা বন্ধ করে দেয়। ঘরে ঘরে কথা হয় আবার ডাক্তারপুরে অনেকদিন পর নরমেধযজ্ঞ হবে আজ রাতে।

বিজয়কে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। ওর মুখে কাপড় গোঁজা। ক্লাবঘর থেকে বের করে রাস্তায় নামানো হয়েছে। পিছনে জ্বলন্ত মশাল। নদীর ধারের একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা হল বিজয়কে। সারা গায়ে ঢেলে দেওয়া হল পেট্রল। তারপর ছুঁইয়ে দেওয়া হল জ্বলন্ত মশালের শিখা।

চীৎকার উঠলো 'বাঁচাও, বাঁচাও, মরে গেলাম'। ওদিকে বেজে উঠলো শঙ্খ ধ্বনি, কাঁসর বাজনার কর্কশ আওয়াজ। হরিধ্বনি 'বল হরি, হরিবোল', 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। বিজয়ের আকুল আবেদন কেউ শুনলো না। ধীরে ধীরে থেমে গেল তার ছট-ফটানি। সকাল হল, কিন্তু গাঁয়ের প্রত্যেকের মুখে তালা আঁটা।

ডাক্তারপুরে পেশাদার যাত্রারদল এসেছে। কদিন ধরে বইটা নিয়ে জোর আলোচনা চলছে ক্লাবে ক্লাবে। পোষ্টার সাঁটা হচ্ছে, মাইক বাজছে, চাঁদা তোলা সবই চলছে। 'নিউ ফ্যাসান ক্লাবই' এর উদ্যোক্তা। হরেন এখন এ-ক্লাবের সদস্য নয়। ঐ ক্লাব কেড়ে নিয়েছে হরেনের প্রাথমিক সভ্যপদ। মাইকে প্রচার চলছে ক্যাবারে নৃত্য প্রদর্শন করবেন 'মিস্ সি'।

রাত এগারোটায় শুরু হল যাত্রা। একটি বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে সাঁতারের স্বল্পবাস পোষাক পরে নাচতে নাচতে আসরে ঢুকলো। তারপরই ঘনঘন করতালি শিস্, নানারকম অশ্লীল মন্তব্য তার সঙ্গে তাল রেখে কেউ কেউ শুরু করে দর্শক আসনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য ভঙ্গিমা। নর্তকী হঠাৎ নিরাবরণ হতে শুরু করলে কেউ কেউ নিজের পরনের প্যাণ্টটাই খুলে ফেলে মাথায় বেঁধে নাচতে থাকে।

অবিবাহিত তরুণী, বধূর উপস্থিতি নগন্য ছিল না। তাদের বসবার জায়গা ছিল সংরক্ষিত। মূল মঞ্চের কাছেই। মহিলারা নির্বাক দর্শক। কেউ কেউ বসে আছে মাথা নিচু করে, কেউবা মুখে রুমাল গুঁজে।

ঘেরা হয়েছিল বিভিন্ন দিক। মহিলা দর্শকদের কাকাকাছি হরেন আর কাশী পাশাপাশি বিশেষ সংরক্ষিত আসনে। উদাসপুর থেকে কদিন আগে কাশী চলে এসেছে ডাক্তারপুরে। উদাসপুরে দলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রবল গোলমাল। শংকরদের ওপর হামলার যৌক্তিকতা নিয়ে। কাশী একজনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

মঞ্চে 'মিস সি'র রোমাঞ্চকর নৃত্যপ্রদর্শন শুরু হওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ-চাপ থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কাশী। দু'পা অগ্রসর হতেই হরেন টেনে ধরে পিছন থেকে। হরেন চোখ মুখ পাকিয়ে বলে—এ্যাই কাশী, ওদিকে যাওয়া চলবে না।

কাশী কিছুটা মত্ত অবস্থায় থাকায় টেনে ধরতেই পড়ে গেল হরেনের গায়ে। ঠেলা দিতেই ছিটকে চলে গেল আরেকজনের গায়ে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। কেউ কেউ বা দাঁড়িয়ে পড়েছে ভয়ে। দর্শক আসন থেকে কেউ কেউ চীৎকার করছে—মশাই একটু থামবেন। মারামারি করতে হয় রাস্তায় চলে যান। 'টুপিস' পোষাক পরিহিতা নর্তকী একবার বক্রদৃষ্টি হানে—ভাবখানা কুশলী প্রদর্শনীটা বোধহয় মাটি হল। মহিলাদের মধ্যে থেকে উঠে পড়া শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

কাশী জোর ঠেলা খেয়ে উত্তেজিত জ্ঞানশূন্য হরেনকে ঘুসি মারতে মুষ্টিবদ্ধ হাতে এগিয়ে যায়। হরেন বাধা দিতেই কাশী আবার স্থানচ্যুত। হঠাৎ জামা খুলে ফেলল কাশী। ছোরা বার করছে হরেন। দুপা এগিয়ে আসতেই 'বাপস্' বলে আবার পিছিয়ে যায় দু-পা। হরেনের ছোরার অগ্রভাগ মোটামুটি টান মেরেছে কাশীর তলপেট বরাবর। মঞ্চ থেকে নর্তকী কখন উধাও। পালাতে শুরু করেছে লোকজন। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে মহিলাদের মধ্যে। কে আগে পালাতে পারে। যাদের কোলে শিশু আছে তারা অত্যাধিক আতঙ্কিত। এমন সময় হঠাৎ আলো উধাও।

অন্ধকারের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চললো। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল দুটি জ্ঞানশূন্য দেহ মাটিতে পড়ে আছে। হরেনের পেটেও একটা আমূল ছোরা। রক্তে গোটা এলাকাটা ভেসে যাচ্ছে, সকাল হতেই জ্ঞানশূন্য দুটি দেহ একটা জীপে

তোলা হল। জপে তোলার সময় দু'জন মহিলা এসে উঁকি মেরে দেখে, থুতু ফেলে চলে যায়।

জীপ ছুটলো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে মজা নদীর কালভার্টে দাঁড়ায় কয়েকমুহূর্ত। হরেন আর কাশীর নাকের কাছে একজন হাত রাখে। নিঃশ্বাস বের হচ্ছে। জীপে চারজন চেপে বসেছে। ওরা কি যুক্তি করলো নিজেদের মধ্যে। একজন একটা ধারালো ছুরি বার করে হরেনের কণ্ঠনালিটা কেটে দেয় অগ্রভাগ দিয়ে চোখদুটো খুলে নদীতে ছুঁড়ে দেয়। শেষে আস্তে আস্তে হরেনের অসাড় দেহটা চারজনে ধরাধরি করে একটা ঝোপে ফেলে দিয়ে গাড়িতে উঠে আসে। জীপ আবার ছুটলো কাশীকে নিয়েই।

গাঁয়ের এক চাষী নদীর ধারে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় সংবাদ দিতে গিয়ে বলে—দারোগাবাবু, ভীষণকাণ্ড। আমাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে শুকনো যে নদীটা গেছে তার চড়ায় পড়ে আছে একটা লাশ। চেনা মুখ। অনেকবার দেখেছি। নামটা মনে করতে পারছি না।

দারোগা ছাইদানীতে পোড়া সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—বয়স কত হবে ?

—আজ্ঞে চল্লিশ।

—হুঁঃ।

—বেঁচে নেই বলছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা চলুন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। মেজবাবু, আমি বের হচ্ছি।

—আচ্ছা স্যর।

পুলিশ তুলে আনল হরেনের লাশ। বস্তা চাপা হরেনের লাশ। কাগজপত্র ঠিক করে মর্গে পাঠানোর জন্য যাত্রীবাহী একটা বাসকে দাঁড় করায়। ড্রাইভারকে ডেকে হুকুম করে বলে—আপনার সীটের কাছে রেখে বস্তা চাপা দিয়েই ওটাকে হাসপাতাল পৌঁছে দিতে হবে। অয়েলপেপারও থাকবে। তোলা হল হরেনকে যাত্রীবাহী বাসে। থানার সামনে মেয়েদের ইস্কুল। উঁচু ক্লাশের মেয়েরা যখন শুনল তাদের ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের মধ্যে একটা লাশ বস্তা চাপা হয়ে যাচ্ছে তখন কৌতূহলী হয়ে ড্রাইভার কনষ্টেবলদের একবারটি বস্তা আর অয়েলপেপার তুলে ওদের দেখানোর জন্য পীড়া-পীড়ি করে বলে—আমরা এখুনি ক্লাশে চলে যাবো, ঘণ্টা পড়বে। একবারটি দেখবো। কে এক হরেন নাকি

যাচ্ছে। খুব নাম ডাক। একবার তুলুন-না চাপাটা। কনষ্টেবল রাজী হতে ড্রাইভার চাপা তুলে দেখায়। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ইস্কুলের মেয়েরা শেষ দর্শন করে। একজন থুতু ছিটিয়ে দিয়ে ক্লাশের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয়।

গতকাল থেকে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি ঝরছে। পথঘাট জনশূন্য। কয়েকটা কাক বৃষ্টির মধ্যে এ-গাছ সে-গাছ করে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে সামান্য কিছু যাত্রী নিয়ে গাঁয়ের মধ্যে বাস থামছে। সবাই বলাবলি করছে—এতো বৃষ্টি এবছরে আর হয়নি। এবার মজা নদীতেও বান আসবে, যদি এমন ধারায় বৃষ্টি হয়। মাঠে মাঠে জল জমে গেছে। এরই মধ্যে একটা সংবাদ গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে লোকের মুখে মুখে মেয়েদের মধ্যে, মাঠে বৃষ্টির মধ্যে লাঙ্গল চালাচ্ছে যারা তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে হারাধন ওরফে হিরুকে মৃত অবস্থায় পশ্চিম পাড়ার রাস্তায় পাওয়া গেছে। মৃতদেহের এমন রূপ, দেখলে আতঙ্ক হবে। ডাক্তারপুরের পশ্চিমপাড়াটা ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি। রাস্তাটা চলে গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়েই। পাড়ার বাসিন্দারা ঘুম থেকে উঠেই এদৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে অনেকেই যে যার ঘরে ঢুকে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে পড়ে থেকে লাশটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। লাশটার কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে লালায়িত কয়েকটা কুকুর।

যারা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাশটা দেখছে তাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক। নিজেদের মধ্যে দু-তিনজন বলাবলি করছে খুব খাটো গলায়—হিরুদাকে এভাবে কে খুন করলো ?

— এ গাঁ থেকে কমুনিষ্টরা আগেই পালিয়েছে। চারবছর ধরে ঢুকতেই সাহস করে না। হিরুদাকে কমুনিষ্টরা মেরেছে একথা তো বলা যাবে না।

—ভবিষ্যতে এই ঘটনার জের কতদূর গড়াবে কে জানে ? ভাববার কথা। তবে এই গাঁয়ের কেউ নিশ্চয়ই হিরুদাকে খুন করেনি। অন্য কোথাও খুন করে বৃষ্টির মধ্যে এ-গাঁয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

মধ্যবিত্ত ঘরের এক বেকার। কিভাবে নিজের জীবনটা শেষ করল। ভাবতে অবাক লাগে।

খবর পেয়ে পুলিশ কুকুর নিয়ে ঢুকলো এক পুলিশবাহিনী। উল্টে-পাল্টে দেখল লাশটা। গায়ে বিশ জায়গায় ছোরার আঘাতের চিহ্ন। গুলী করাও হয়েছে। পেটে রয়েছে একটা একটা।

একখণ্ড রক্তাক্ত কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে পুলিশ কুকুর দৌড় দিল। চষে বেড়াল সারা গ্রাম। হঠাৎ ঢকে পড়লো 'নিউ ফ্যাসান ক্লাব'-এ। সেখানে দাবা খেলছিল

মণ্টু আর মান্টি। লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ধরল ওদের দু'জনকেই কুকুরটা। ভয়ঙ্কর সে কুকুরের চেহারা। গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো পুলিশ হাত কড়া পরাচ্ছে মণ্টু আর মান্টির হাতে। সকলেই দর্শক, নীরব দর্শক। হারাধনের বিকৃত লাশ আর মণ্টু-মান্টিকে নিয়ে পুলিশভ্যান ছুটলো সদরের উদ্দেশ্যে।

* * *

অনেককাল পর উদাসপুরে দেখা গেল ভালো হাতের লেখা পোষ্টার পড়েছে। 'স্বাগত জাঠায়' যোগদান কারী স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ, 'কৃষক সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হক।'

উদাসপুরের দু-মাইল দূরে কামারহাটি একটার পর একটা বাস থেকে নামছে শহরের কারখানার শ্রমিক, ছাত্র, যুবরা। প্রত্যেকের বুকে ব্যাজ আঁটা তাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা—সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হ'ক। পরপর চারটে বাস থেকে নামল অন্ততঃ পঞ্চাশজন যুবক। হাতে লাল পতাকা ষ্ট্যাণ্ডে স্বাগত জানাতে এসেছে শ্যামল আরও পঁচিশ জন।

কামরাটায় শিবির স্থাপন হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ঠাসা। হাতে হাতে জল আর মাটির ভাঁড়ে চা। সব শেষ হলেই শুরু হবে পদযাত্রা। শহরের কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চিত্ত পাত্র। ছাত্র আর যুবকদের কাজল আর বিকাশ, অধ্যাপক কুণ্ডু। চিত্ত জড়িয়ে ধরে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করে—শ্যামল, জাঠা কটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে? হাঁটা পথে মোট কত মাইল?

—অন্ততঃ বিশটা গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যাবেন। অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইল পথ আর প্রভাব পড়বে অন্ততঃ পঁচিশহাজার মানুষের ওপর।

—তাহলে এবার পদযাত্রা শুরু করা যাক, কি বলো? সম্মতি জানায় শ্যামল। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজল স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে বলে—আপনারা আমার সামনের জায়গাটাই সমবেত হন। যাত্রা এখনই শুরু হবে। দু'লাইন দিন। কাঁচা রাস্তায় নামলে এক লাইন। বিকাশ আর কুণ্ডুদা ফেষ্টুনটা সামনে নিয়ে দাঁড়ান। বড়লালঝাণ্ডাটা মিছিলের সামনে আসুন। আর শ্যামলদা, তুমি সামনে এসো।

লাইন সাজানো শেষ হলে গণ সঙ্গীতের স্কোয়াড উচ্চকণ্ঠে গান ধরে—

"আমরা গান গাই, প্রাণে প্রাণ মিলাই
এসো আজ বাঁধি প্রাণ এক সাথে।"

কথাবার্তা আর গান দুইই চলতে থাকে।

যাত্রা তখনও শুরু হয়নি, কামারহাটির চাষী মজুর মেয়ে পুরুষ, ইস্কুল

কলেজের ছাত্রছাত্রী, অফিসের কর্মচারী, দোকানদার, গাঁয়ের বেসিক আর হাই-ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা অনেকেই বাড়ি থেকে বের হয়ে জড়ো হয়েছেন কামারহাটির তেমাথায়। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অনেকেই ঢুকে পড়ছে জাঠার সঙ্গে।

মিছিল চলেছে কখনও চওড়া রাস্তা, কখনও কাঁচারাস্তা, কখনও বা চওড়া আলপথ ধরে পায়ে পায়ে। শহরের পঞ্চাশজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্ততঃ এ-গ্রামেরই আরও পঞ্চাশজন। যে গ্রামে ঢুকছে সে গ্রাম থেকেই অন্ততঃ বিশত্রিশজন যোগ দিচ্ছে। ঢুকে পড়ছে লাইনের মধ্যে। কাজল আর চিত্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বে তুলে ডাক দিচ্ছে—স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হ'ক। গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হ'ক। লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়া শীর্ণকায় এক যুবক চীৎকার করে বলছে—"গোলায় মাঠে থাকতে ধান, না খেয়ে আর মরবো না।" "সামনে যখ মজুত পাহাড় না খেয়ে আর মরবো না।" এ যেন তার প্রাণের কথা আবেগে ভরপুর। ঠিক তার পরমুহূর্তেই চিত্ত পাত্রের গুরু গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ—'ক্ষেতে কিষাণ কলে মজুর'। মুষ্টিবদ্ধ হাতে মিছিল গর্জে ওঠে—'জোট বাঁধো তৈরী হও'।

চিতলডাঙ্গা থেকে উদাসপুরের মধ্যে দূরত্ব তিনমাইল। চিতলডাঙ্গায় প্রবেশ পথে একটা তোরণ দেখা যায়। তোরণের মাথায় উজ্জ্বল রংয়ের শোভিত ব্যানার—শহীদ সন্দীপ তোরণ। দুধারে সারিবদ্ধ হয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল গ্রামের কৃষকরা। তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কয়েকজন মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক। লালঝাণ্ডা আর মুষ্টিবদ্ধ হাতে সম্মুখে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ওরা, তোরণ অতিক্রম করছে। দুধারে দাঁড়ানো একদল যুবক গান গাইছে সমস্বরে। গান শেষ হতে দেখা গেল মিছিল চলে গেছে, মিছিল থেকে গানের সুর ভেসে আসছে—

> "মুক্তির মন্দির সোপান তলে
> কত প্রাণ হ'ল বলিদান
> লেখা আছে অশ্রুজলে।"

সমাপ্ত

গ্রন্থাগারের উপযোগী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ

প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য—

১. বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ—
ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত— ৪০.০০

২. বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের প্রয়োগ—
ডঃ শীতল ঘোষ ৪০.০০

৩. নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক—ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২২.০০

৪. বাংলা নাটক সমীক্ষা—কমলকুমার সান্যাল ১০.০০

৫. বঙ্কিমসাহিত্যে ডাকাতের ভূমিকা—
অধ্যাপক পঞ্চানন মালাকর ১২.০০

৬. কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কয়েকজন—
শক্তিব্রত ঘোষ ১৪.০০

৭. দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে—
ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ১ম, ১৫.০০ / ২য় ১৫.০০

৮. পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র—অধ্যাপক বীরেন্দ্র দত্ত ১০.০০

৯. বুদ্ধদেব বসু : নানা-প্রসঙ্গ—আনন্দ রায় সম্পাদিত ১৫.০০

১০. গণশিক্ষার স্বপক্ষে সম্পাদনায়—মধুসূদন চক্রবর্তী ১২.০০

১১. পথ-পুস্তিকা : পথ-সাহিত্য—ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী ১৪০০

ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক

১২. বাবুগৌরবের কলকাতা—ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬.০০

১৩. ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে— „ ১৩.০০

১৪. নদীর তীরে নগরী— „ ১৮.০০

১৫. পালকি চলে ডুলকি চালে „ ১০.০০
১৬. গোরাদের কলকাতা—কান্তিরঞ্জন ঘোষ ১২.০০
১৭. মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি—
কমলকুমার সান্যাল ১ম, ১০.০০ / ২য় ১২.০০
১৮. চিতোর গড়—(সম্পূর্ণ ইতিহাস)
অরুণকান্তি সাহা—১৬.০০
১৯. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা—
কমলকুমার সান্যাল ১২.০০
২০. রিকলিং দি-লং-মার্চ—অনুবাদ অরুণকান্তি সাহা
২৪.০০

উপন্যাস

২১. সপ্ত দুর্গার উদয়াস্ত ১ম—সম্রাট সেন ২০.০০
২২. ঐ ২য়— „ ২০.০০
২৩. টুকুনের অসুখ—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.০০
২৪. রূপকথার আংটি— „ ১ম ২৫.০০ / ২য় ২৫.০০
২৫. নদী যখন সাগরে—নিখিলচন্দ্র সরকার ২৫.০০

বিজ্ঞান-বিষয়ক

২৬. সমুদ্রের চোখ—সমরজিৎ কর ১২.০০
২৭. বিজ্ঞানের ছড়া—ডঃ কমল চক্রবর্তী ৫.০০
২৮. বিজ্ঞান-ভাবনা— ৮.০০
২৯. বরণীয় বিজ্ঞানী স্মরণীয় আবিষ্কার—
বিরু চট্টোপাধ্যায় ২০.০০
৩০, চলো [illegible] ১৫.০০